# NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

**PG : POLITICAL SCIENCE**

**PAPER - I**

**(Bengali Version)**

**MODULES : 1 - 4**

**POST GRADUATE**
**POLITICAL SCIENCE**

**(PGPS)**

# প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে কোনো শিক্ষার্থী, যতটা মনোনিবেশ করবেন বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ : নভেম্বর, 2017

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

# পরিচিতি

## রাষ্ট্রবিজ্ঞান : স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পাঠক্রম : পর্যায়

**[Post-Graduate Political Science (PGPS)]**

নতুন সিলেবাস (জুলাই, ২০১৫ থেকে প্রবর্তিত)

প্রথম পত্র : ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক ভাবনা ও আন্দোলন

**[Paper-1 : Political Thought and Movements in Colonial India]**


উপদেষ্টামণ্ডলী

অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য     অধ্যাপক রাধারমন চক্রবর্তী

অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ

বিষয় সমিতি :

অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত     অধ্যাপক সুমিত মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক অপূর্ব মুখোপাধ্যায়     অধ্যাপক তপন চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য     অধ্যাপক দেবনারায়ণ মোদক



**Course-Writing**

পর্যায়-এক (Module-I) : একক : ১-৪ (Units 1-4) : মূল রচনা : অধ্যাপক অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়

অনুসৃজন : ড. কুন্তল মুখোপাধ্যায়

পর্যায়-দুই (Module-II) : একক : ১-৪ (Units 1-4) : মূল রচনা : অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ

পর্যায়-তিন (Module-III) : একক : ১-৪ (Units 1-4) : মূল রচনা : অধ্যাপক সুমিত মুখোপাধ্যায়

পর্যায়-চার (Module-IV) : একক : ১-৪ (Units 1-4) : মূল রচনা : ড. কুন্তল মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা : অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী

**সম্পাদকীয় সহায়তা এবং সমন্বয়সাধন** : অধ্যাপক দেবনারায়ন মোদক



প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধক

# নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

## রাষ্ট্রবিজ্ঞান (স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

### প্রথম পত্র


**পর্যায় : এক (Module - I) : আধুনিকতা**

| | | | |
|---|---|---|---|
| একক - ১ (Unit-1) | : | রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) | 11-19 |
| একক - ২ (Unit-2) | : | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) | 20-29 |
| একক - ৩ (Unit-3) | : | সৈয়দ আহমেদ খান (১৮৭১-১৮৯৮) | 30-39 |
| একক - ৪ (Unit-4) | : | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) | 40-52 |

**পর্যায় : দুই (Module - II) : জাতীয়তাবাদ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| একক - ১ (Unit-1) | : | বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় জাতীয়তাবাদ | 55-64 |
| একক - ২ (Unit-2) | : | রবীন্দ্রনাথ : জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা | 65-72 |
| একক - ৩ (Unit-3) | : | মহাত্মা গান্ধী : জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা | 73-84 |
| একক - ৪ (Unit-4) | : | সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা | 85-92 |

**পর্যায় : তিন (Module - III) : সমাজতন্ত্র**

| | | | |
|---|---|---|---|
| একক - ১ (Unit-1) | : | স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা | 95-102 |
| একক - ২ (Unit-2) | : | মানবেন্দ্রনাথ রায়— জাতীয়তাবাদ, মার্কসবাদ, নবমানবতাবাদ | 103-111 |
| একক - ৩ (Unit-3) | : | জহরলাল নেহরুর সমাজতান্ত্রিক চিন্তা | 112-119 |
| একক - ৪ (Unit-4) | : | জয়প্রকাশ নারায়ণ - মার্কসবাদ, গান্ধিবাদ, সমাজবাদ | 120-128 |

পর্যায় : চার (Module - IV) : আন্দোলন সমূহ


| | | |
|---|---|---|
| একক - ১ (Unit-1) : | স্বদেশী আন্দোলন | 131-139 |
| একক - ২ (ক) (Unit-2(A) : | কৃষক আন্দোলন | 140-146 |
| একক - ২ (খ) (Unit-2(B) : | উপজাতি আন্দোলন | 147-149 |
| একক - ৩ (Unit-3) : | শ্রমিক আন্দোলন | 150-155 |
| একক - ৪ (Unit-4) : | দলিত আন্দোলন | 156-160 |

# স্নাতকোত্তর রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রথম পত্র
# (PGPS - I ☐ Paper - 1)

## প্রারম্ভিক

এই অধ্যায়ে যে চারটি পাঠখণ্ড (module) রয়েছে তার মাধ্যমে দেখা যাবে প্রাচীন ঐতিহ্যপন্থী এদেশের সমাজ কিভাবে আধুনিক যুগে প্রবেশ করল অষ্টাদশ ঊনবিংশ খ্রীস্টীয় শতক ধরে। ঔপনিবেশিক শক্তির আঘাতে রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতা যেমন ক্রমান্বয়ে হস্তান্তর হতে থাকল, তেমনই আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার মুখোমুখি দেশীয় সমাজে প্রথমে আশ্চর্যবোধ এবং ক্রমে আলোড়ন উঠল। অব্যবহার্য পুরাতন রীতিনীতি, প্রথা ও বিশ্বাস পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিপরীতে টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ল। নূতন নূতন ধ্যান-ধারণা, চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধের আলোয় প্রাচীনের নব মূল্যায়ন শুরু হল। শুধুই বর্জন নয়, দেশীয় ঐতিহ্যের লুপ্তপ্রায় সম্পদসমূহের পুনরুদ্ধার ও বর্তমানের উপযোগী হয়ে ওঠা দিয়ে এক বিপুল সমাজ পরিবর্তন সূচিত হল। পুরাতনের সংস্কার, নির্বিমাণ, নবীকরণ সবই চলতে থাকলো নবজীবনের অভিলাষে। ধর্ম, অর্থনীতি, দর্শন কিছুই এর বাইরে রইল না।

এই পর্বে যে কয়জন ভারতীয় মনীষী দেশ ও দেশবাসীকে যথার্থ পথ প্রদর্শন করেছেন। পরিবর্তনের জলতরঙ্গ নির্বিঘ্নে সামাল দিতে তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মুসলমান গোষ্ঠীর থেকে সৈয়দ আহমেদের ভূমিকা ও অবদান। আলাদাভাবে এই সব মনীষী ও সামাজিক আন্দোলনের পুরোধাগণের কীর্তি ও চিন্তার নির্বাচিত অংশগুলি পাঠখণ্ডগুলির মধ্যে পরম্পরাক্রমে আলোচিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রবেশের আগে জেনে নেওয়া দরকার—ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে আধুনিকতার স্বরূপটি কী এবং কিভাবে তা মূর্ত হয়।

মনে করা হয়, ইয়োরোপে আধুনিকতার উন্মেষ নবজাগরণের পথ ধরে। এই নবজাগরণ (renaissance) দুটি ব্যাপক বিপ্লবকে অবলম্বন করে এগিয়েছে—তার একটি হল অর্থনৈতিক—প্রযুক্তিগত, যার নাম 'শিল্প বিপ্লব' এবং অন্যটি রাজনৈতিক জনজাগরণ ও জাতীয়তার উন্মেষ, যার উৎস ফরাসী বিপ্লব। এই দুই বিপ্লবের ফলশ্রুতি যে নূতন আর্থসামাজিক ব্যবস্থা অর্থাৎ পুঁজিবাদী বন্দোবস্ত সেটি ভারতে প্রতিষ্ঠা হওয়ার কাজে মধ্যস্থতার ভূমিকা নিয়েছিল উপনিবেশ শক্তির প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত দেশীয় সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব এসে পড়ল একদিকে প্রাচীনের পুনরাবিষ্কার ও অন্যদিকে নবীনের স্বরূপ উদঘাটন করা। সেইভাবে বিদেশী শাসনের পরিমণ্ডলেও দেশে যে ধীরগতি কিন্তু নিশ্চিতভাবে অনিবার্য বিপ্লব ঘটে চলেছিল, তাতে প্রয়োজন ছিল সুযোগ্য পদপ্রদর্শকের। যে চারজন মনীষীর জীবন ও কর্মের আমরা পরিচয় নিতে চলেছি এই অধ্যায়ের পাঠখণ্ডগুলি থেকে, তাঁরা জাতীয়তার উন্মেষ এবং নবজাগৃতির পরিপোষক।

যে লক্ষণটি এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক প্রণিধানযোগ্য সেটি হল গোষ্ঠীবদ্ধ যৌথ অস্তিত্বে অভ্যস্ত দেশবাসীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে ব্যক্তি চেতনার উদ্ভাস। সমষ্টির প্রতি আনুগত্যের পাশাপাশি ব্যক্তিমানুষ হিসেবে সমাজবাস্তবকে স্বাধীনভাবে বিচার করার যে অধিকার রয়েছে, এমনকি বিশেষ প্রয়োজনে, সেইটি এই প্রথম এদেশের মনোভূমিতে অঙ্কুরিত হল। এজন্য বহুবিধ বাধা-বিঘ্ন, সন্দেহ, জড়তা সবই দেখা দিয়েছে এবং যথাকালে কাটিয়ে ওঠা গেছে।

জাতীয় জাগরণের পূর্বশত হল দেশবাসীর মধ্যে একটি ভাবগত যোগসূত্র রচনা। একইসঙ্গে রাষ্ট্রের চরিত্র, তার প্রাধান্য, কার্যাবলীর মধ্যে কোন্ অংশের কি উপযোগ বা অনুপযোগ, তার ক্ষমতার ভিত্তি কোথায়, বহুব্যাপ্ত হলেও তার ক্ষমতা যে অপব্যবহারের বস্তু নয়, ফলত ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কী সম্পর্ক এগুলি নিয়ে যতোই আগ্রহ সঞ্চার হতে থাকল, ভারতবাসী ততোই রাজনীতিমুখী হয়ে উঠতে থাকল, আরও অধিক পরিমাণে সচেতন হয়ে উঠল আত্মগৌরব এবং আত্মপরিচয় (Self-esteem and self-identity) আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে।

এই সমস্ত ভাববার মত দিক নিয়ে গ্রথিত হয়েছে চারটি করে পাঠ্য একক (Unit)। তার কাঠামো ও প্রত্যেক একক পাঠের বিশেষ উদ্দেশ্য প্রথমেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

# পর্যায় : এক (Module - I)

## আধুনিকতা

# একক - ১ □ রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)

## গঠন

১.০১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং তাৎপর্য

১.০২ রামমোহন রায় : জীবন ও সময়

১.০৩ ভারতীয় নবজাগরণের প্রবর্তক

১.০৪ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র

১.০৫ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

১.০৬ উপসংহার

১.০৭ সহায়ক পাঠ

১.০৮ অনুশীলনী

## উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ ও অনুশীলনের উদ্দেশ্য হল

- রাজা রামমোহন রায়ের সমকালীন পরিস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া
- তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও কর্মকাণ্ডের ফলে এদেশে নবজাগরণের সূত্রপাত কিভাবে সম্ভব হয়েছে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ
- এদেশে প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে থেকেও গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা বিষয়ে পশ্চিমী দুই ধারণার প্রবর্তনকল্পে রামমোহনের অগ্রণী ভূমিকার পরিচয় লাভ
- সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষীয় এবং সমাজের আধুনিকতায় উত্তরণ সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণন্দগড়ে তোলা

## ১.০১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং তাৎপর্য

রামমোহন রায় এমন সময় জন্মেছিলেন যখন ভারতবর্ষ একটি রাজনৈতিক অবক্ষয় অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং সামাজিক অবমূল্যায়নের মধ্যে দিয়ে সময় অতিক্রম করে চলেছে। প্রতাপশালী মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গ জেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭) ভারত এক দীর্ঘ সময়ব্যাপী রাজনৈতিক অবক্ষয়ে পতিত হয়েছিল, শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই অবণতির চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। সামাজিক এবং সংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ধর্মীয় কুসংস্কার এবং বিচ্ছিন্নতার শক্তি সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। এটা এমন এক সময় যখন ভারতবর্ষে

সামাজিক অভ্যাস, রাজনীতি, ধর্ম, শিল্পকলা সবকিছুই এক ন্যূনতম সামাজিক মূল্যবোধের এবং বদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কৃতিতে আটকে পড়েছিল। রামমোহন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকার পর (যেহেতু কোলকাতায় তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজধানী ছিল এবং রাজনীতি ও সরকারী ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র ছিল) রামমোহন সেখান থেকেই তার শিক্ষা ও দর্শন দিয়ে ভারতীয় জনগণের সংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনাকে সমালোচনা করতে শুরু করলেন এবং এই সমালোচনার সূত্র ধরে আধুনিকতার একটি বাতাবরণ ভারতীয় রাজনীতি ও সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবর্তন করলেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে ভারতীয় আধুনিক সমাজের প্রবর্তক রূপে আখ্যা দিয়েছেন।

রামমোহন এক নতুন যুগের প্রবর্তক, যেখানে তিনি ধর্মীয় সংস্কার এবং দীর্ঘকাল জুড়ে যে নিষ্ঠুর সামাজিক অভ্যাস ও কুসংস্কারগুলি চালু ছিল সেগুলির সমাজজীবন থেকে উৎখাৎ করার প্রয়াস নেন। বেদ এবং উপনিষদের সহচর্যে তিনি হিন্দুত্বের পুনরুত্থান চেয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত আইনের শাসনের প্রবর্তন ব্রিটিশ ভারতে ঘটুক এমনটিই তার অভীপ্সা ছিল। একটা সময়ে যখন পাশ্চাত্যের মানুষ ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতেন না সেই সময় রামমোহন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে একটি যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেছিলেন। জেরেমি বেন্থাম অবধি এই কারণে রামমোহনকে মানবজাতির সেবকরূপে ঘোষণা করতেও দ্বিধা বোধ করেননি।

রামমোহনকে একই সঙ্গে গোঁড়া হিন্দুত্ববাদীদের এবং যুযুধান খ্রীষ্টান মিশনারীদের আক্রমণ প্রতি আক্রমণ সইতে হয়েছে। ভারতে ইংরেজ শাসনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে অভিহিত করে রামমোহন ভারতের সর্বাত্মক উন্নতির প্রয়োজনে উন্নত চরিত্র ইউরোপীয়দের এদেশে এসে বসবাস করার প্রস্তাব রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি ভারতে সামাজিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণমুক্তির সপক্ষে মন্তব্য করেছেন। ম্যাক্সমুলার থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই তাই তাকে মানবাত্মার প্রতীক বলে চিহ্নিত করেছেন।

স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি ছিলেন অপ্রতিরোধ্য এবং সামাজিক ব্যধি সমূহ যা সামাজিক কুপ্রথা প্রকৃতি থেকে জন্ম নেয়, তার অবসান চেয়েছিলেন।

## ১.০২ রামমোহন রায় : জীবন ও সময়

১৭৭২ সালে অর্থাৎ বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার সাত বছর পরে, রামমোহন রায়ের জন্ম হয় হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে, এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর পিতা রমাকান্ত রায় ছিলেন এক বৃহৎ ভূস্বামী। রামমোহনের শিক্ষারম্ভ হয়েছিল ফারসী ও আরবী ভাষায় : কোরাণ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ইউক্লিড-অ্যারিস্টট্লের চিন্তার সঙ্গো পরিচিত হয়েছিলেন। এর পরবর্তী সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দু সাহিত্য, ধর্ম ও আইনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর ইংরাজী শিক্ষার সূচনা হয় বাইশ বছর বয়সে।

কৈশোরকালে লিখিত এক প্রবন্ধে হিন্দুদের পৌত্তলিকতার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রামমোহন তাঁর পরিজনদের বিরাগভাজন হন এবং পরিবারে সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। এর পরবর্তী সময়ে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে এবং ১৮০০ সাল থেকে চাকরিসূত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ—এই সময়ে রংপুর কালেক্টরেটে দেওয়ান থাকাকালীন জন ডিগবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। যিনি রামমোহনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেন।

১৮১৫ সালের পর থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সূত্রে এবং একদিকে লগ্নী কারবার এবং অন্যদিকে

বিলেতী এজেন্সী হাউস ম্যাকিন্টশ কোম্পানীতে অর্থ বিনিয়োগের সূত্রে তিনি বহু ইংরেজদের সংস্পর্শে আসেন। কলকাতাবাসের পর্বই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে কর্মমুখর অধ্যায় : কখনো তিনি একেশ্বরবাদের প্রচারকরূপে রক্ষণশীল হিন্দু ও গোঁড়া খ্রীষ্টান পাত্রীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত, কখনো সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বীকৃতির দাবীতে সোচ্চার, কখনো আবার নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কৃতসংকল্প। আবার কখনো বাংলা গদ্যের সেবক রূপে বা কখনো ভারতে পশ্চিমী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রবক্তার ভূমিকার। রামমোহন দুটি সামাজিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা এর প্রথমটি হল আত্মীয় সভা এবং দ্বিতীয়টি ব্রাহ্মণসমাজ। এবং এই দুটি সভার মধ্য থেকেই রামমোহন তাঁর ঋণ ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে বিতর্ক চালু রেখেছিলেন। তিনি কখনই অস্বীকার করেননি যে তিনি হিন্দু ছিলেন না। তবে এই হিন্দুত্বের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে তিনি হিন্দুধর্মের সংস্কার ঘটিয়ে তাকে এক নতুন মাত্রা প্রদান করতে চেয়েছিলেন। এইসব কর্মকাণ্ডের হোতা হিসাবে রামমোহনকে অশেষ প্রতিকূলতা ও সামাজিক নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৮২১ এবং ১৮২২ সালে তিনি সম্বাদ কৌমুদী ও মিরাৎ-উল-আখবার নামে দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন যেখানে তিনি তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারে কথা বলেন।

১৮২৯ সালে মুঘল সম্রাটের বিশেষ দূত হিসাবে রামমোহন ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ সম্পর্কে ব্রিটিশ জনমতকে অবহিত করা। এই বিষয়ে ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্সের সিলেক্ট কমিটির সামনে তিনি যে সাক্ষ্য দেন সেটি ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে এক মূল্যবান দলিল হয়ে আছে। ১৮৩৩ সালে ব্রিস্টল নগরে স্বল্প রোগভোগের পর রামমোহনের দেহান্ত হয়।

## ১.০৩ ভারতীয় নবজাগরণের প্রবর্তক

**রামমোহন :** উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে যে নবজাগরণের সূচনা তার প্রধান ঋত্বিকছিলেন রামমোহন রায়। এটা সত্যই যে কোনো একজন ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় কোনো মেধাভিত্তিক আন্দোলন শুরু হতে পারে না। এই ধরনের আন্দোলন সবসময় একটি সহযোগীতামূলক ও সমন্বয়ী আন্দোলন হিসাবেই পরিচিত হয় সেখানে কতিপয় ব্যক্তির যুগ্ম প্রয়াসে এক ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সমাজ প্রগতির পথে এগিয়ে চলে। তবে একথাও সত্য যে এই সমস্ত সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের আন্দোলনে অনেকসময়ই একজন্য ব্যক্তি বা কতিপয় গোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ অবদান থাকে। রামমোহন ছিলেন এমনই একজন ব্যক্তিত্ব যিনি ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাধিগুলিকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন এবং সেই অনড় ভারতীয় সমাজকে প্রগতির পথে চালিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রামমোহনের নানামুখী গুণগত চরিত্র ও কার্যকারীতার কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাকে ভারতপথিক আখ্যা দিয়েছিলেন তবে অনেকের মতেই সমগ্র মানবজাতির ঐক্যসাধনের নির্যাস তাঁর তত্ত্বে প্রতিফলিত হয় বলেই তাঁকে 'বিশ্বপথিক' রূপে চিহ্নিত করা হয়।

রামমোহন তাঁর চিন্তাভাবনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিশিয়েছিলেন এই কারণেই যে তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃৎকৌশল এবং দর্শনকে ভারতীয় বৈদান্তিক কাঠামোয় বিচার বিশ্লেষণ করে তার ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজ সংস্কারের প্রস্তাব রেখেছিলেন। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে বেন্থাম ও মন্তেস্কুর চিন্তাভাবনাই তাকে প্রভাবিত করেছিল বেশি। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরন এবং আইনের শাসন এই দুইয়ের ভিত্তিতে এবং একধরনের

আরোহী বা inductive পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি বলেছিলেন স্থান, কাল, অবস্থা প্রয়োজন ও কার্যকারীতার দিক থেকে আইনকে প্রযুক্ত হতে হবে এবং এই পথেই তিনি ভারতীয় সমাজের অন্ধ জড়বৎ সামাজিক অবস্থানকে স্থানচ্যুত করে এক যুক্তিভিত্তিক সমাজ গঠনে আগ্রহী ছিলেন। প্রখর মেধা সম্পন্ন রামমোহন এইভাবে তাঁর ধর্মীয় সংস্কৃতিক ভাবনায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যর মিলন ঘটিয়েছিলেন ও বিশ্ব নাগরিকত্বের সার্বভৌমিকতায় আস্থাবান হয়ে উঠেছিলেন।

ভারতীয় সমাজের পক্ষে ব্রিটিশ শাসনকে তিনি আর্শীবাদ স্বরূপ মনে করতেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশেষকরে পাশ্চাত্য শিক্ষার ও পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী জীবনর্শনের তিনি ছিলেন একান্তই গুণগ্রাহী, তাঁর চিন্তায় এই দুয়ের সম্মিলনেই ভারতীয় সমাজের অন্ধ, স্থানুবত সংস্কারগ্রস্ত জীবনচর্চার অবসান ঘটবে এবং ভারতীয় মননের উপযুক্ত বিকাশ ঘটবে, এবং এর মধ্যেই তিনি নবজাগরণের বীজকে সুপ্ত থাকতে জেনেছিলেন। নবজাগরণে মূলমন্ত্রকে যুক্তিবাদ, এবং সেই যুক্তিবাদের মূল উৎস যে পশ্চিমী শিক্ষা, তার প্রতি গুরুত্ব দিয়েই রামমোহন ভারতে যুক্তিবাদী শিক্ষা ও শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিলেন। ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আধুনিক দর্শন ও ইতিহাস পাশ্চাত্য বস্তুমুখী বিজ্ঞানচর্চা প্রভৃতির প্রণয়ন করে ভারতীয় যুব মানসে তিনি এক বিশাল পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন; প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা লগ্নে তাঁর অবদান ও কিছু কম ছিল না। ভারতীয় যুব মানসে নতুন উদ্দীপনা আনয়নের প্রশ্নেই, রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছিলেন।

ভারতে এক আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রামমোহনের এই দৃষ্টিভঙ্গী খুবই সহায়ক ছিল। ভারতীয় সমাজকে বাস্তবমুখী করে তোলার জন্য পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী শিক্ষার প্রবর্তন দরকার, এই ছিল তাঁর মত। সনাতন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে পাশ্চাত্য সামাজিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটিয়ে আধুনিক এক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন রামমোহন। ভারতীয় রাষ্টিক জীবনে মধ্যবিত্তের উত্থানকে তিনি প্রতিভাত করেছিলেন এবং এই উদারচেতা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুক্তিবাদী মধ্যবিত্তের হাত ধরেই ভারতে আধুনিক রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবনের আবির্ভাব ঘটবে, এই ছিল তাঁর প্রত্যয়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উদ্ভূত এই ভারতীয় নবজাগরণকে কতটা সত্যিকারের "নবজাগরণ" বলা যায়, এই নিয়ে ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। অনেকেই নবজাগরণ অপেক্ষা সাংস্কৃতিক উদ্ভাবন এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। একথা ঠিক ইউরোপীয় নবজাগরণের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ভারতে তেমনভাবে দেখা যায়নি। তবে একথা মানতেই হবে ১৮২০'র সময় থেকেই ভারতীয় সমাজে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে যা বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধেও পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রভৃত ব্যক্তিমনীষা ভারতীয় সমাজ জীবনের এই পরিবর্তনের অংশ নিয়েছেন, এঁদের মধ্যে রামমোহন ছিলেন পথপ্রদর্শক একথা স্বীকার না করলে, ইতিহাসকে অস্বীকার করা হবে।

## ১.০৪ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র

মানবসভ্যতার ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এসময় ইউরোপে দুটি বিপ্লব ঘটে। একটি ফরাসি বিপ্লব (সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শের বাহক) এবং দ্বিতীয়টি শিল্পবিপ্লব (যার থেকে

শুরু হয় অর্থনৈতিক রূপান্তর) যার প্রভাব সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এই বিপ্লোবত্তর যুগে ইউরোপে......ও ভারতে রামমোহন রায় আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সূচনা করেন, রামমোহনের আগে রাজনীতি ছিল শাসনকর্তাদেরই একচেটিয়া বিষয়, জনজীবনে রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজেরই প্রধান্য ছিল। কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতা বা পরিশীলিত শাসনের কোনো প্রশ্ন দেখা দেয়নি, ইউরোপীয় চিন্তাধারার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে রামমোহনই প্রথম ভারতের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের গতিহীন ধারার সাথে স্রোতস্বিনী আধুনিকতার সংযোগ সাধন করেন।

লিবারিয়ালিজমের গোড়ার কথা হল লিবার্টি বা স্বাধীনতা। আর সহজাত স্বাধীনতাবোধই ছিল রামমোহনের চরিত্রের এক মৌলিক প্রেরণা। স্বাধীনতার জন্য তাঁর জ্বলন্ত আবেগের স্বীকৃতি মেলে তাঁর ঘনিষ্ট রেফারেন্ড অ্যাডমের জবানীতে "তিনি হয় স্বাধীন হয়ে বাঁচবেন না'হলে জীবনধারণনই করতে চান না।" এই স্বাধীনপ্রীতির কারণেই তাঁর সমসাময়িক ইংল্যান্ডে রিফর্ম বিল আন্দোলনে সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ। বিষয়টিকে তিনি কোনো ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সংস্কারপন্থী ও সংস্কাররোধীর মধ্যে সংঘাত হিসাবেই দেখেননি। এ ছিল তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বজোড়া স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার শক্তির আন্দোলন।

লিবারাল রাজনৈতিক দর্শনে স্বাধীনতা সংরক্ষণের সঙ্গে সংবিধান নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের ধারণা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আর রাষ্ট্রক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবার উপায় হল জনগণের অধিকারের স্বীকৃতি। রামমোহনের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতাপ্রীতি থেকে অনিবার্যভাবেই জন্ম নিয়েছিল অধিকার সচেতনতা। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর মুগ্ধতার প্রধান কারণ ছিল ব্রিটিশ রাজতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী নয়—নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সংবিধানিক রাজতন্ত্র। তিনি মনে করতেন ভারতে ব্রিটিশ শাসন পূর্বতন শাসকবর্গের স্বৈরাচার থেকে ভারতবাসী রক্ষা করেছে। ১৮২৩ সালে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ বিধির প্রতিবাদে ব্রিটিশরাজের কাছে পেশ করা এক আবেদনে রামমোহন লেখেন, মুসলিম শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমানরা একইধরনের রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করত ঠিকই, কিন্তু ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ সম্পত্তি লুণ্ঠন, নির্বিচার হত্যা ইত্যাদি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ব্রিটিশ আমলে রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা হারিয়েও ভারতবাসী দুঃখিত নয় কারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ধন, সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তারা অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেছে। লক্ষ্যে করবার বিষয় রাজনীতিক স্বাধীনতার প্রশ্নটি অনেক বারই তোলেন, কারণ তিনি মনে করতেন ভারতবর্ষে 'সিভিল সোসাইটি' বা পুর সমাজকে বরং রাজনৈতিক শক্তিশালী করাই প্রাথমিক কারণ কর্তব্য সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই পরবর্তীকালে ব্রিটিশ অধীনতা থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখা যেতে পারে। রাজনৈতিক অধিকারের তুলনায় পৌর অধিকারকে অধিক গুরুত্ব দয়েছেন। বাকস্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার—যে রামমোহনের চিন্তায় যথাযথ গুরুত্ব লাভ করেছিল তার প্রমাণ রয়েছে ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার সরকারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তার দৃপ্ত প্রতিবাদে। ১৮১৯ সালে লর্ড হেস্টিংস লর্ড ওয়েলেসলির আমলে ভারতে আরোপিত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ শিথিল করলে রামমোহন দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন: বাংলায় সংবাদ কৌমুদি (১৮২১) ও ফারসী ভাষায় মিরত-উল-আকবর। দুটি পত্রিকাই সমকালীন সামাজিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা তুলে ধরে তাদের সমাধানের পথ নির্দেশ করার চেষ্টা চালায়।

১৮২৩ সালে নতুন গভর্ণর জেনারেল অ্যাডাম প্রেস অডিন্যান্স জারী করে সাময়িকপত্র প্রকাশের জন্য সরকারের অনুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছেন। এর পেছনে ছিল কোম্পানি কর্তৃপক্ষের পরামর্শ তারা

সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে প্রশাসনিক তথা ঔপনিবেশিক স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করত। তাদের যুক্তি ছিল একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাতেই স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রয়োজন; ভারতে গণতন্ত্র না থাকার দরুণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নই ওঠে না। ভারতে জনগণের কোনো অস্তিত্বই নেই—সুতরাং ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের ভারতে জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি করারও কোনো দায় নেই। তাদের কার্যকলাপ সংক্রান্ত কোনো আলোচনা ইংল্যান্ডে হতে পারে। ভারতে নয়। তাছাড়া শাসকগণের যথেষ্ট সমালোচনা তাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করবে। জনগণের আস্থা বিনিষ্ট হবে। পরিণামে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেওয়াও অসম্ভব নয়। বাহুবলের ভিত্তিতে পরিচালিত কোনো সরকার এই ঝুঁকি নিতে পারে না।

রামমোহন এই আদেশের প্রতিবাদে 'মিরত' প্রকাশ বন্ধ করে দেন এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর ইত্যাদি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এর বিরুদ্ধে কলকাতার সুপ্রিমকোর্টে স্মারকলিপি পেশ করেন। এই আবেদন ব্যর্থ হলেও হতোদ্যম না হয়ে তিনি ব্রিটিশ রাজের কাছে স্মারকলিপি পাঠান। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে তিনি সওয়াল করেন তার মধ্যে উপরক্ত সমস্ত যুক্তিরই উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ভারতে— গণতন্ত্র না থাকার কারণেই আলোচনার স্বাধীনতা থাকা বেশি প্রয়োজন। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষ তাদের অসুবিধাগুলি কর্তৃপক্ষের সামনে তুলে ধরে প্রতিবিধান চইতে পারে। সংবাদপত্রের ভেতর দিয়েই ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ জাতির শুভবুদ্ধির কাছে শাসন কর্তৃপক্ষের অন্যায় সিদ্ধান্ত বা আচরণের প্রতিবাদ জানাতে পারে ও কোম্পানির ডিরেক্টররা জানতে পারেন যে আইনগুলি ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য রচিত হচ্ছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সেগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করছেন কিনা জনসাধারণের প্রকৃত মঙ্গল সঠিক হচ্ছে কিনা। ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত না থাকলে ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে শাসন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। রাজকর্মচারীদের কার্যকলাপ, সাধারণের প্রতি তাদের আচরন অলক্ষিত থাকা উচিত নয়। তার সঙ্গে সুশাসনের সম্পর্ক রয়েছে। ভারতে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত লোক আছেন—আলোচনার স্বাধীনতা থাকলে তাঁরা শাসনব্যবস্থার ইতিবাচক দিকগুলিকেও সাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারবেন। প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধু হলে কোনো সরকারেরই সংবাদপত্রের সমালোচনাকে ভয় পাওয়ার কারণ থাকতে পারে না; বরং স্বাধীন আলোচনা সরকারের সম্মান ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে। আর জনগণের মনে যদি ক্ষোভ জমা হতে থাকে, দুঃখদুর্দশার প্রতিকার না হয়, তবেই সেই পুঞ্জিভূত অসন্তোষ বিপ্লবের আকারে ফেটে পড়তে পারে।

সংবিধানিক সরকারে কাঠামো বজায় রাখতে গেলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। জনগণের অধিকারকে বাস্তবায়িক করার জন্য তাদের এক সাধারণ ও নিরপেক্ষ আইনী ব্যবস্থার দ্বারা সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। এই কারণে রামমোহন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ভারতে প্রচলিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনকে 'কোড' বা সংহিতার আকারে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তাঁর যুক্তি ছিল ব্রিটিশ অধিকারের প্রাক্কালে বেন্থামের রচনা ও যুক্তি ভারতের ঐতিহ্যগত ধারণাকে পুষ্ট, মার্জিত ও যুগোপযোগী করে তুলতে সাহায্য করেছিল। মুসলিম শাসনকালে প্রবর্তিত ও ইসলামের ভিত্তিতে প্রনীত আইনটি ভারলতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৭৯৩ সালের পর থেকে ব্রিটিশ সরকার যে নিয়ন্ত্রণবিধি তৈরি করেন সেগুলি মুসলিম আত্মাকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করেছে। তার ফলে ভারতে ব্রিটিশ ও ইসলামী উপাদানের ভিত্তিতে এক নতুন জটিল আইনী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। রামমোহন মনে

# পর্যায় : এক (Module - I)

## আধুনিকতা

# একক - ১ □ রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)

## গঠন

১.০১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং তাৎপর্য

১.০২ রামমোহন রায় : জীবন ও সময়

১.০৩ ভারতীয় নবজাগরণের প্রবর্তক

১.০৪ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র

১.০৫ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

১.০৬ উপসংহার

১.০৭ সহায়ক পাঠ

১.০৮ অনুশীলনী

## উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ ও অনুশীলনের উদ্দেশ্য হল

- রাজা রামমোহন রায়ের সমকালীন পরিস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া
- তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও কর্মকাণ্ডের ফলে এদেশে নবজাগরণের সূত্রপাত কিভাবে সম্ভব হয়েছে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ
- এদেশে প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে থেকেও গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা বিষয়ে পশ্চিমী দুই ধারণার প্রবর্তনকল্পে রামমোহনের অগ্রণী ভূমিকার পরিচয় লাভ
- সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষীয় এবং সমাজের আধুনিকতায় উত্তরণ সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণদ্ধগড়ে তোলা

## ১.০১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং তাৎপর্য

রামমোহন রায় এমন সময় জন্মেছিলেন যখন ভারতবর্ষ একটি রাজনৈতিক অবক্ষয় অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং সামাজিক অবমূল্যায়নের মধ্যে দিয়ে সময় অতিক্রম করে চলেছে। প্রতাপশালী মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭) ভারত এক দীর্ঘ সময়ব্যাপী রাজনৈতিক অবক্ষয়ে পতিত হয়েছিল, শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই অবণতির চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। সামাজিক এবং সংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ধর্মীয় কুসংস্কার এবং বিচ্ছিন্নতার শক্তি সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। এটা এমন এক সময় যখন ভারতবর্ষে

সামাজিক অভ্যাস, রাজনীতি, ধর্ম, শিল্পকলা সবকিছুই এক ন্যূনতম সামাজিক মূল্যবোধের এবং বদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কৃতিতে আটকে পড়েছিল। রামমোহন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকার পর (যেহেতু কোলকাতায় তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজধানী ছিল এবং রাজনীতি ও সরকারী ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র ছিল) রামমোহন সেখান থেকেই তার শিক্ষা ও দর্শন দিয়ে ভারতীয় জনগণের সংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনাকে সমালোচনা করতে শুরু করলেন এবং এই সমালোচনার সূত্র ধরে আধুনিকতার একটি বাতাবরণ ভারতীয় রাজনীতি ও সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবর্তন করলেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে ভারতীয় আধুনিক সমাজের প্রবর্তক রূপে আখ্যা দিয়েছেন।

রামমোহন এক নতুন যুগের প্রবর্তক, যেখানে তিনি ধর্মীয় সংস্কার এবং দীর্ঘকাল জুড়ে যে নিষ্ঠুর সামাজিক অভ্যাস ও কুসংস্কারগুলি চালু ছিল সেগুলির সমাজজীবন থেকে উৎখাৎ করার প্রয়াস নেন। বেদ এবং উপনিষদের সহচর্যে তিনি হিন্দুত্বের পুনরুত্থান চেয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত আইনের শাসনের প্রবর্তন ব্রিটিশ ভারতে ঘটুক এমনটিই তার অভীপ্সা ছিল। একটা সময়ে যখন পাশ্চাত্যের মানুষ ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতেন না সেই সময় রামমোহন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে একটি যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেছিলেন। জেরেমি বেন্থাম অবধি এই কারণে রামমোহনকে মানবজাতির সেবকরূপে ঘোষণা করতেও দ্বিধা বোধ করেননি।

রামমোহনকে একই সঙ্গে গোঁড়া হিন্দুত্ববাদীদের এবং যুযুধান খ্রীষ্টান মিশনারীদের আক্রমণ প্রতি আক্রমণ সইতে হয়েছে। ভারতে ইংরেজ শাসনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে অভিহিত করে রামমোহন ভারতের সর্বাত্মক উন্নতির প্রয়োজনে উন্নত চরিত্র ইউরোপীয়দের এদেশে এসে বসবাস করার প্রস্তাব রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি ভারতে সামাজিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণমুক্তির সপক্ষে মন্তব্য করেছেন। ম্যাক্সমুলার থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই তাই তাকে মানবাত্মার প্রতীক বলে চিহ্নিত করেছেন।

স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি ছিলেন অপ্রতিরোধ্য এবং সামাজিক ব্যধি সমূহ যা সামাজিক কুপ্রথা প্রকৃতি থেকে জন্ম নেয়, তার অবসান চেয়েছিলেন।

## ১.০২ রামমোহন রায় : জীবন ও সময়

১৭৭২ সালে অর্থাৎ বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার সাত বছর পরে, রামমোহন রায়ের জন্ম হয় হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে, এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর পিতা রমাকান্ত রায় ছিলেন এক বৃহৎ ভূস্বামী। রামমোহনের শিক্ষারম্ভ হয়েছিল ফারসী ও আরবী ভাষায় : কোরাণ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ইউক্লিড-অ্যারিস্টট্‌লের চিন্তার সঙ্গে্য পরিচিত হয়েছিলেন। এর পরবর্তী সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দু সাহিত্য, ধর্ম ও আইনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর ইংরাজী শিক্ষার সূচনা হয় বাইশ বছর বয়সে।

কৈশোরকালে লিখিত এক প্রবন্ধে হিন্দুদের পৌত্তলিকতার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রামমোহন তাঁর পরিজনদের বিরাগভাজন হন এবং পরিবারে সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। এর পরবর্তী সময়ে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে এবং ১৮০০ সাল থেকে চাকরিসূত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ—এই সময়ে রংপুর কালেক্টরেটে দেওয়ান থাকাকালীন জন ডিগবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। যিনি রামমোহনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেন।

১৮১৫ সালের পর থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সূত্রে এবং একদিকে লগ্নী কারবার এবং অন্যদিকে

বিলেতী এজেন্সী হাউস ম্যাকিন্টশ কোম্পানীতে অর্থ বিনিয়োগের সূত্রে তিনি বহু ইংরেজদের সংস্পর্শে আসেন। কলকাতাবাসের পর্বই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে কর্মমুখর অধ্যায় : কখনো তিনি একেশ্বরবাদের প্রচারকরূপে রক্ষণশীল হিন্দু ও গোঁড়া খ্রীষ্টান পাত্রীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত, কখনো সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বীকৃতির দাবীতে সোচ্চার, কখনো আবার নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কৃতসংকল্প। আবার কখনো বাংলা গদ্যের সেবক রূপে বা কখনো ভারতে পশ্চিমী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রবক্তার ভূমিকার। রামমোহন দুটি সামাজিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা এর প্রথমটি হল আত্মীয় সভা এবং দ্বিতীয়টি ব্রাহ্মণসমাজ। এবং এই দুটি সভার মধ্য থেকেই রামমোহন তাঁর ঋণ ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে বিতর্ক চালু রেখেছিলেন। তিনি কখনই অস্বীকার করেননি যে তিনি হিন্দু ছিলেন না। তবে এই হিন্দুত্বের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে তিনি হিন্দুধর্মের সংস্কার ঘটিয়ে তাকে এক নতুন মাত্রা প্রদান করতে চেয়েছিলেন। এইসব কর্মকাণ্ডের হোতা হিসাবে রামমোহনকে অশেষ প্রতিকূলতা ও সামাজিক নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৮২১ এবং ১৮২২ সালে তিনি সম্বাদ কৌমুদী ও মিরাৎ-উল-আখবার নামে দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন যেখানে তিনি তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারে কথা বলেন।

১৮২৯ সালে মুঘল সম্রাটের বিশেষ দূত হিসাবে রামমোহন ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ সম্পর্কে ব্রিটিশ জনমতকে অবহিত করা। এই বিষয়ে ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্সের সিলেক্ট কমিটির সামনে তিনি যে সাক্ষ্য দেন সেটি ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে এক মূল্যবান দলিল হয়ে আছে। ১৮৩৩ সালে ব্রিস্টল নগরে স্বল্প রোগভোগের পর রামমোহনের দেহান্ত হয়।

## ১.০৩ ভারতীয় নবজাগরণের প্রবর্তক

**রামমোহন :** উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে যে নবজাগরণের সূচনা তার প্রধান ঋত্বিক ছিলেন রামমোহন রায়। এটা সত্যই যে কোনো একজন ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় কোনো মেধাভিত্তিক আন্দোলন শুরু হতে পারে না। এই ধরনের আন্দোলন সবসময় একটি সহযোগীতামূলক ও সমন্বয়ী আন্দোলন হিসাবেই পরিচিত হয় সেখানে কতিপয় ব্যক্তির যুগ্ম প্রয়াসে এক ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সমাজ প্রগতির পথে এগিয়ে চলে। তবে একথাও সত্য যে এই সমস্ত সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের আন্দোলনে অনেকসময়ই একজন্য ব্যক্তি বা কতিপয় গোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ অবদান থাকে। রামমোহন ছিলেন এমনই একজন ব্যক্তিত্ব যিনি ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাধিগুলিকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন এবং সেই অনড় ভারতীয় সমাজকে প্রগতির পথে চালিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রামমোহনের নানামুখী গুণগত চরিত্র ও কার্যকারীতার কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাকে ভারতপথিক আখ্যা দিয়েছিলেন তবে অনেকের মতেই সমগ্র মানবজাতির ঐক্যসাধনের নির্যাস তাঁর তত্ত্বে প্রতিফলিত হয় বলেই তাঁকে 'বিশ্বপথিক' রূপে চিহ্নিত করা হয়।

রামমোহন তাঁর চিন্তাভাবনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিশিয়েছিলেন এই কারণেই যে তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃৎকৌশল এবং দর্শনকে ভারতীয় বৈদান্তিক কাঠামোয় বিচার বিশ্লেষণ করে তার ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজ সংস্কারের প্রস্তাব রেখেছিলেন। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে বেন্থাম ও মন্তেস্কুর চিন্তাভাবনাই তাকে প্রভাবিত করেছিল বেশি। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরন এবং আইনের শাসন এই দুইয়ের ভিত্তিতে এবং একধরনের

আরোহী বা inductive পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি বলেছিলেন স্থান, কাল, অবস্থা প্রয়োজন ও কার্যকারীতার দিক থেকে আইনকে প্রযুক্ত হতে হবে এবং এই পথেই তিনি ভারতীয় সমাজের অন্ধ জড়বৎ সামাজিক অবস্থানকে স্থানচ্যুত করে এক যুক্তিভিত্তিক সমাজ গঠনে আগ্রহী ছিলেন। প্রখর মেধা সম্পন্ন রামমোহন এইভাবে তাঁর ধর্মীয় সংস্কৃতিক ভাবনায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যর মিলন ঘটিয়েছিলেন ও বিশ্ব নাগরিকত্বের সার্বভৌমিকতায় আস্থাবান হয়ে উঠেছিলেন।

ভারতীয় সমাজের পক্ষে ব্রিটিশ শাসনকে তিনি আর্শীবাদ স্বরূপ মনে করতেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশেষকরে পাশ্চাত্য শিক্ষার ও পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী জীবনর্শনের তিনি ছিলেন একান্তই গুণগ্রাহী, তাঁর চিন্তায় এই দুয়ের সম্মিলনেই ভারতীয় সমাজের অন্ধ, স্থানুবত সংস্কারগ্রস্ত জীবনচর্চার অবসান ঘটবে এবং ভারতীয় মননের উপযুক্ত বিকাশ ঘটবে, এবং এর মধ্যেই তিনি নবজাগরণের বীজকে সুপ্ত থাকতে জেনেছিলেন। নবজাগরণে মূলমন্ত্রকে যুক্তিবাদ, এবং সেই যুক্তিবাদের মূল উৎস যে পশ্চিমী শিক্ষা, তার প্রতি গুরুত্ব দিয়েই রামমোহন ভারতে যুক্তিবাদী শিক্ষা ও শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিলেন। ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আধুনিক দর্শন ও ইতিহাস পাশ্চাত্য বস্তুমুখী বিজ্ঞানচর্চা প্রভৃতির প্রণয়ন করে ভারতীয় যুব মানসে তিনি এক বিশাল পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন; প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা লগ্নে তাঁর অবদান ও কিছু কম ছিল না। ভারতীয় যুব মানসে নতুন উদ্দীপনা আনয়নের প্রশ্নেই, রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছিলেন।

ভারতে এক আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রামমোহনের এই দৃষ্টিভঙ্গী খুবই সহায়ক ছিল। ভারতীয় সমাজকে বাস্তবমুখী করে তোলার জন্য পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী শিক্ষার প্রবর্তন দরকার, এই ছিল তাঁর মত। সনাতন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে পাশ্চাত্য সামাজিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটিয়ে আধুনিক এক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন রামমোহন। ভারতীয় রাষ্টিক জীবনে মধ্যবিত্তের উত্থানকে তিনি প্রতিভাত করেছিলেন এবং এই উদারচেতা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুক্তিবাদী মধ্যবিত্তের হাত ধরেই ভারতে আধুনিক রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবনের আবির্ভাব ঘটবে, এই ছিল তাঁর প্রত্যয়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উদ্ভূত এই ভারতীয় নবজাগরণকে কতটা সত্যিকারের "নবজাগরণ" বলা যায়, এই নিয়ে ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। অনেকেই নবজাগরণ অপেক্ষা সাংস্কৃতিক উদ্ভাবন এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। একথা ঠিক ইউরোপীয় নবজাগরণের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ভারতে তেমনভাবে দেখা যায়নি। তবে একথা মানতেই হবে ১৮২০'র সময় থেকেই ভারতীয় সমাজে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে যা বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধেও পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রভূত ব্যক্তিমনীষা ভারতীয় সমাজ জীবনের এই পরিবর্তনের অংশ নিয়েছেন, এঁদের মধ্যে রামমোহন ছিলেন পথপ্রদর্শক একথা স্বীকার না করলে, ইতিহাসকে অস্বীকার করা হবে।

## ১.০৪ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র

মানবসভ্যতার ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এসময় ইউরোপে দুটি বিপ্লব ঘটে। একটি ফরাসি বিপ্লব (সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শের বাহক) এবং দ্বিতীয়টি শিল্পবিপ্লব (যার থেকে

শুরু হয় অর্থনৈতিক রূপান্তর) যার প্রভাব সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এই বিপ্লোবত্তর যুগে ইউরোপে.......ও ভারতে রামমোহন রায় আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সূচনা করেন, রামমোহনের আগে রাজনীতি ছিল শাসনকর্তাদেরই একচেটিয়া বিষয়, জনজীবনে রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজেরই প্রধান্য ছিল। কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতা বা পরিশীলিত শাসনের কোনো প্রশ্ন দেখা দেয়নি, ইউরোপীয় চিন্তাধারার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে রামমোহনই প্রথম ভারতের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের গতিহীন ধারার সাথে স্রোতস্বিনী আধুনিকতার সংযোগ সাধন করেন।

লিবারিয়ালিজমের গোড়ার কথা হল লিবার্টি বা স্বাধীনতা। আর সহজাত স্বাধীনতাবোধই ছিল রামমোহনের চরিত্রের এক মৌলিক প্রেরণা। স্বাধীনতার জন্য তাঁর জ্বলন্ত আবেগের স্বীকৃতি মেলে তাঁর ঘনিষ্ট রেফারেন্ড অ্যাডমের জবানীতে "তিনি হয় স্বাধীন হয়ে বাঁচবেন না'হলে জীবনধারণই করতে চান না।" এই স্বাধীনপ্রীতির কারণেই তাঁর সমসাময়িক ইংল্যান্ডে রিফর্ম বিল আন্দোলনে সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ। বিষয়টিকে তিনি কোনো ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সংস্কারপন্থী ও সংস্কাররোধীর মধ্যে সংঘাত হিসাবেই দেখেননি। এ ছিল তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বজোড়া স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার শক্তির আন্দোলন।

লিবার‍্যাল রাজনৈতিক দর্শনে স্বাধীনতা সংরক্ষণের সঙ্গে সংবিধান নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের ধারণা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আর রাষ্ট্রক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবার উপায় হল জনগণের অধিকারের স্বীকৃতি। রামমোহনের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতাপ্রীতি থেকে অনিবার্যভাবেই জন্ম নিয়েছিল অধিকার সচেতনতা। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর মুগ্ধতার প্রধান কারণ ছিল ব্রিটিশ রাজতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী নয়—নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সংবিধানিক রাজতন্ত্র। তিনি মনে করতেন ভারতে ব্রিটিশ শাসন পূর্বতন শাসকবর্গের স্বৈরাচার থেকে ভারতবাসী রক্ষা করেছে। ১৮২৩ সালে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ বিধির প্রতিবাদে ব্রিটিশরাজের কাছে পেশ করা এক আবেদনে রামমোহন লেখেন, মুসলিম শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমানরা একইধরনের রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করত ঠিকই, কিন্তু ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ সম্পত্তি লুণ্ঠন, নির্বিচার হত্যা ইত্যাদি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ব্রিটিশ আমলে রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা হারিয়েও ভারতবাসী দুঃখিত নয় কারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ধন, সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তারা অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেছে। লক্ষ্যে করবার বিষয় রাজনীতিক স্বাধীনতার প্রশ্নটি অনেক বারই তোলেন, কারণ তিনি মনে করতেন ভারতবর্ষে 'সিভিল সোসাইটি' বা পুর সমাজকে বরং রাজনৈতিক শক্তিশালী করাই প্রাথমিক কারণ কর্তব্য সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই পরবর্তীকালে ব্রিটিশ অধীনতা থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখা যেতে পারে। রাজনৈতিক অধিকারের তুলনায় পৌর অধিকারকে অধিক গুরুত্ব দয়েছেন। বাকস্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার—যে রামমোহনের চিন্তায় যথাযথ গুরুত্ব লাভ করেছিল তার প্রমাণ রয়েছে ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার সরকারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তার দৃপ্ত প্রতিবাদে। ১৮১৯ সালে লর্ড হেস্টিংস লর্ড ওয়েলেসলির আমলে ভারতে আরোপিত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ শিথিল করলে রামমোহন দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন: বাংলায় সংবাদ কৌমুদি (১৮২১) ও ফারসী ভাষায় মিরত-উল-আকবর। দুটি পত্রিকাই সমকালীন সামাজিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা তুলে ধরে তাদের সমাধানের পথ নির্দেশ করার চেষ্টা চালায়।

১৮২৩ সালে নতুন গভর্ণর জেনারেল অ্যাডাম প্রেস অর্ডিন্যান্স জারী করে সাময়িকপত্র প্রকাশের জন্য সরকারের অনুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছেন। এর পেছনে ছিল কোম্পানি কর্তৃপক্ষের পরামর্শ তারা

সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে প্রশাসনিক তথা ঔপনিবেশিক স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করত। তাদের যুক্তি ছিল একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাতেই স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রয়োজন; ভারতে গণতন্ত্র না থাকার দরুণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নই ওঠে না। ভারতে জনগণের কোনো অস্তিত্বই নেই—সুতরাং ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের ভারতে জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি করারও কোনো দায় নেই। তাদের কার্যকলাপ সংক্রান্ত কোনো আলোচনা ইংল্যান্ডে হতে পারে। ভারতে নয়। তাছাড়া শাসকগণের যথেষ্ট সমালোচনা তাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করবে। জনগণের আস্থা বিনিষ্ট হবে। পরিণামে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেওয়াও অসম্ভব নয়। বাহুবলের ভিত্তিতে পরিচালিত কোনো সরকার এই ঝুঁকি নিতে পারে না।

রামমোহন এই আদেশের প্রতিবাদে 'মিরত' প্রকাশ বন্ধ করে দেন এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর ইত্যাদি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এর বিরুদ্ধে কলকাতার সুপ্রিমকোর্টে স্মারকলিপি পেশ করেন। এই আবেদন ব্যর্থ হলেও হতোদ্যম না হয়ে তিনি ব্রিটিশ রাজের কাছে স্মারকলিপি পাঠান। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে তিনি সওয়াল করেন তার মধ্যে উপরুক্ত সমস্ত যুক্তিরই উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ভারতে— গণতন্ত্র না থাকার কারণেই আলোচনার স্বাধীনতা থাকা বেশি প্রয়োজন। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষ তাদের অসুবিধাগুলি কর্তৃপক্ষের সামনে তুলে ধরে প্রতিবিধান চাইতে পারে। সংবাদপত্রের ভেতর দিয়েই ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ জাতির শুভবুদ্ধির কাছে শাসন কর্তৃপক্ষের অন্যায় সিদ্ধান্ত বা আচরণের প্রতিবাদ জানাতে পারে ও কোম্পানির ডিরেক্টররা জানতে পারেন যে আইনগুলি ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য রচিত হচ্ছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সেগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করছেন কিনা জনসাধারণের প্রকৃত মঙ্গল সঠিক হচ্ছে কিনা। ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত না থাকলে ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে শাসন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। রাজকর্মচারীদের কার্যকলাপ, সাধারণের প্রতি তাদের আচরন অলক্ষিত থাকা উচিত নয়। তার সঙ্গে সুশাসনের সম্পর্ক রয়েছে। ভারতে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত লোক আছেন— আলোচনার স্বাধীনতা থাকলে তাঁরা শাসনব্যবস্থার ইতিবাচক দিকগুলিকেও সাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারবেন। প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধু হলে কোনো সরকারেরই সংবাদপত্রের সমালোচনাকে ভয় পাওয়ার কারণ থাকতে পারে না; বরং স্বাধীন আলোচনা সরকারের সম্মান ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে। আর জনগণের মনে যদি ক্ষোভ জমা হতে থাকে, দুঃখদুর্দশার প্রতিকার না হয়, তবেই সেই পুঞ্জিভূত অসন্তোষ বিপ্লবের আকারে ফেটে পড়তে পারে।

সংবিধানিক সরকারে কাঠামো বজায় রাখতে গেলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। জনগণের অধিকারকে বাস্তবায়িক করার জন্য তাদের এক সাধারণ ও নিরপেক্ষ আইনী ব্যবস্থার দ্বারা সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। এই কারণে রামমোহন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ভারতে প্রচলিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনকে 'কোড' বা সংহিতার আকারে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তাঁর যুক্তি ছিল ব্রিটিশ অধিকারের প্রাক্কালে বেন্থামের রচনা ও যুক্তি ভারতের ঐতিহ্যগত ধারণাকে পুষ্ট, মার্জিত ও যুগোপযোগী করে তুলতে সাহায্য করেছিল। মুসলিম শাসনকালে প্রবর্তিত ও ইসলামের ভিত্তিতে প্রনীত আইনটি ভারলতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৭৯৩ সালের পর থেকে ব্রিটিশ সরকার যে নিয়ন্ত্রণবিধি তৈরি করেন সেগুলি মুসলিম আত্মাকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করেছে। তার ফলে ভারতে ব্রিটিশ ও ইসলামী উপাদানের ভিত্তিতে এক নতুন জটিল আইনী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। রামমোহন মনে

করতেন এই আইনের ধারাগুলি এমনভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত যে তার প্রয়োগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার যোগ্য অন্য কোনো সূত্রের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন যেন না হয়। তাঁর এই প্রস্তাবের পেছনে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদার্শনিক বেন্থামের প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হয়। বেন্থামের সঙ্গে রামমোহনের চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়। বেন্থাম আইনের যে সর্বকালীন সংহিতা প্রণয়নের কল্পনা করেছেন তা ছিল কতকগুলি বিমূর্ত নীতি বা তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তার মতে, ব্রিটিশ ভারত বা অন্যত্রও অসমভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু রামমোহন মনে করতেন কোনো দেশের আইনব্যবস্থার সঙ্গে সেই দেশের ঐতিহ্য ও জীবনচর্চার অন্তরঙ্গ যোগ থাকা প্রয়োজন। প্রচলিত রীতিনীতি ও আচার ব্যবস্থার যদি আইনসংহিতায় স্বীকৃতি না পায়, তবে তা দেশবাসীর উপযোগী হবে না। এই ছিল তাঁর সচিন্তিত অভিমত।

## ১.০৫ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

আইনের অনুশাসন সুনিশ্চিত করবার জন্য রামমোহন ক্ষমতা স্বতন্ত্রকরণের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষমতা একই ব্যক্তি বা সংস্থার হাতে থাকা অনুচিত। সেই কারণেই তিনি ভারত শাসনের জন্য এদেশে পৃথক আইনসভা স্থাপনের বিরোধিতা করেন এবং দাবী করেন যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রণীত আইনই ভারতে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। কারণ তিনি বুঝেছিলেন ভারতে আইনসভা স্থাপিত হলে ব্রিটিশ গভর্ণর জেনারেল ও তার কাউন্সিলই তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ফলে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি লঙ্ঘিত হবে এবং স্বৈরাচারী শাসন গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাছাড়া ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের জ্ঞানহিতৈষণা সম্পর্কেও তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল, এবং তার সুফল থেকে তিনি ভারতবাসীকে বঞ্চিত করতে চাননি। আবার সুদূর ইংল্যান্ডে বসে ভারতের জন্য আইন প্রয়োগের সমস্যা সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন; সেগুলি লাঘব করার জন্য তিনি তিনটি প্রস্তাব দেন—

এক। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রয়োজন—তবেই আইনে ভারতীয় জনগণের প্রতিফলন ঘটা সম্ভব।

দুই। শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশদভাবে অনুসন্ধান করবার জন্য মাঝে মাঝে কমিশন নিযুক্ত করতে হবে।

তিন। কোনো আইন পাশ করার আগে বিদ্যায় বিত্তে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মতামত নেওয়া হোক। তৃতীয় প্রস্তাবটি দৃশ্যত অভিজাতদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট।

সাধারণ ভারতবাসীর শিক্ষার জ্ঞান সম্বন্ধে রামমোহন পূর্ণমাত্রায় অবগত ছিলেন—ফলে আইন প্রণয়নে পূর্ণ গণতন্ত্রের দাবি তিনি করেননি।

রামমোহন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে আরো বুঝেছিলেন যে বিচার ব্যবস্থার আমূল সংস্কার না হলে আইনের শাসন বলবৎ করা অসম্ভব। বিচারব্যবস্থার ভাষার বিশেষ গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে তিনি প্রস্তাব দেন ফারসী পরিবর্তে ভারতে আদালতের ভাষা হোক ইংরেজি। কিন্তু পরবর্তীকালে সম্ভবত তাঁর এই মতের পরিবর্তন হয়েছিল, না হলে ইংল্যান্ডে থাকাকালীন তিনি লিখতে পারতেন না ভারত বসবাসকারী ইংরেজদের বাংলাকেই মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। বিচারবাদের যোগ্যতার প্রসঙ্গে তিনি দাবী করেন গুণগত ও আইনগত যোগ্যতারই হবে বিচারক নিয়োগের একমাত্র মানদণ্ড এবং ব্রিটিশ আইনে খানিকটা দখল না

থাকলে কোম্পানির কোনো সিভিলিয়ানকে ভারতে বিচারকের দায়িত্ব দেওয়া চলবে না, সর্বোপরি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সমার্থক হওয়া সত্ত্বেও বিচারব্যবস্থাকে দুর্নীতি মন্থরতা ও ব্যয়বাহুল্যের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি জনগণের দ্বারা বিচারের তত্ত্বাবধানের প্রস্তাব করেন এবং ভারতবর্ষে জুরী প্রথা প্রবণতা স্বাগত জানান। বিরারবাদের স্বৈরাচার দমন করবার তন্ত্র হিসাবে জুরী প্রথাকে বেন্থানও সর্বাগ্রে সমর্থন জানিয়েছিলেন বলে সম্ভবত এক্ষেত্রেও রামমোহনের ওপর তাঁর প্রভাব কল্পিত হয়েছে। ১৮২৭ সালে ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক যে জুরী আইন প্রণীত হয় তার বিরুদ্ধে রামমোহন তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। এবং ইউরোপীয় সহযোগী ক্রোফোর্ডের মারফত ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও দরখাস্ত পেশ করেন। এই আন্দোলনকেই ভারতের প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন বলা যেতে পারে। অবশেষে ১৮৩২ সালের আগস্ট মাসে রামমোহনের মৃত্যুর অল্পদিন আগে এই আইনের বৈষম্যমূলক শর্তগুলিকে সংশোধন করে নতুন জুরি বিল আইনে পরিণত লিবার্যাল তত্ত্বে আইনের শাসনের সঙ্গে 'জাস্টিস বা সুবিচারের প্রশ্নটিও ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত। লিবার্যালিজমের ধ্রুপদী তত্ত্বে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল আইনের একটি সাধারণ ও নিরপেক্ষ কাঠামো বজায় রাখা, যাতে সমাজের প্রত্যেক সদস্য নিজের শপথ অনুযায়ী স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি অবেগের চেষ্টা জানাতে পারে, এর মধ্যে দিয়েই সমাজে সবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু পরবর্তীকালে সুবিচারের এই সীমিত অর্থের সম্প্রসারণের মধ্যে। সামাজিক সুবিচারের ধারণা গড়ে ওঠে এবং সামাজিক বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের দাবী ওঠে। রামমোহনের চিন্তায় এই সামাজিক সুবিচারের ধারণার ছায়াপাত লক্ষ করা যায় বাংলার কৃষক সমাজের উন্নতিকল্পে সরকারের সামনে পেশ করা তাঁর প্রস্তাবগুচ্ছের মধ্য দিয়ে রামমোহনের প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। কিন্তু নিপীড়িত কৃষকশ্রেণীর দুর্দশা মোচনে সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ তাঁর চিন্তাকে ধ্রুপদী লিবার্যালিজমের বাইরে এনে সোশ্যাল লিবার্যালিজম বা সামাজিক উদারণীতিবাদের কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করেছে। কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলির আধুনিকতাও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রামমোহন রায় প্রগতিমূলক ভূমিকা পালন করেন। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ যে আধুনিকতা ও উদারনীতিবাদের সূচনা করে তারই হাত ধরে রামমোহন ভারতীয় রাজনীতি সমাজ অর্থনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এক আধুনিক দিক পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন, যার মূল সূত্র ছিল তাঁর ওপর ব্রিটিশ Enlignlightenment এর প্রভাব।

## ১.০৬ উপসংহার

রামমোহন রায় রাজনৈতিক সংস্কারের তুলনায় সামাজিক সংস্কারের উপর অধিক গুরুত্ব দিতেন। তিনি মনে করতেন সামাজিক সংস্কারের উপর ভিত্তি করেই স্বাধীনতা ও উদারনীতির প্রবর্তন ঘটবে, সামাজিক চিন্তাবিদ হিসাবে এতটা নেই তাঁর অনন্যথা। তাঁর সময়ে, ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমির বিচারে তিনি এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। সতীদাহ প্রথা রদ, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা, এক ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে বিশ্বাস, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত ব্যবস্থার স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সংস্কার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণের প্রথম পথিকৃৎ ছিলেন রামমোহন রায়।

## ১.০৭ সহায়ক পাঠ

১. বি. এল. দাসগুপ্ত—দি লাইফ এন্ড টাইমস্ অফ্ রাজা রামমোহন রায় (১৯৮৯)।
২. ভি. সি. যোশী—রামমোহন রায় এন্ড দি প্রসেস অফ্ মর্ডানাইজেশন ইন ইন্ডিয়া।
৩. সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রাজা রামমোহন রায় (১৯৮৯)।
৪. রাজা রামমোহন রায়—হিজ রোল ইন ইন্ডিয়ান রেঁনেসা—এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৭৫।
৫. কমলকুমার মুখোপাধ্যায়—ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তা পরিচয় (২০১৩)।

## ১.০৮ সংক্ষিপ্ত অনুশীলনী

১. রামমোহনের আধুনিক মনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
২. রামমোহনকে কেন ভারতের আধুনিক যুগের পথিকৃৎ বলা হত?
৩. রামমোহনের সামাজিক সংস্কার বিষয়ে টীকা লেখো।
৪. গণতন্ত্র প্রসঙ্গে রামমোহনের ধারণা বর্ণনা করো।
৫. ভারতে রাজনৈতিক সংস্কার বিষয়ে রামমোহনের মনোভাব কি ছিল?

বড়ো প্রশ্ন:

১. ভারতে আধুনিকতার উদ্‌গাতা হিসাবে রামমোহনের ভূমিকা আলোচনা করো।
২. রামমোহনকে কেন "আধুনিক ভারতের স্রষ্টা" বলা হতো। ব্যাখ্যা করো।
৩. রামমোহনের ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কার বিষয়ে মতামত ব্যাখ্যা করো।
৪. ভারতে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার বিষয়ে রামমোহনের কৌশল কি ছিল? তা ব্যাখ্যা করো।
৫. উদাহরণ সহযোগে রামমোহনের ঐতিহ্য ও আধুনিকতা বিষয়ে ধারণা বর্ণনা করো।

# একক - ২ ❑ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ - ১৮৯৪)

## গঠন

২.০১ ভূমিকা
২.০২ জীবন ও সময়
২.০৩ ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি
২.০৪ সাম্যের ধারণা
২.০৫ জাতীয়তাবাদ
২.০৬ উপসংহার
২.০৭ প্রশ্নাবলী
২.০৮ সহায়ক পাঠ

## উদ্দেশ্য

এই একটি পাঠের মূল উদ্দেশ্য হল :

- আধুনিক ভারতবর্ষের সূচনা লগ্নে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমকাল ও তদীয় জীবনের বিশেষ পর্বগুলি অবহিত হওয়া।
- সনাতনকে বর্তমানের আলোয় এবং বর্তমানকে অতীতের প্রেক্ষিতে যুক্তিনিষ্ঠ বিচার আধুনিক ভারতের মননকর্মে এক অনবদ্য উপাদান। যার জন্য বঙ্কিমের কাছে আমরা কি পরিমাণ ঋণী সেটি বুঝিতে পারা।
- ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ধর্ম ও রাজনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ দুইয়ের বিচ্ছেদ নয়, সম্যক সমাহার কিভাবে হতে পারে সে বিষয়ে বঙ্কিমের চিন্তাধারার পরিচয় লাভ।
- সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় আদর্শহিসেবে সাম্য অবশ্যই এক কাম্য নীতি অথচ এর যথার্থ প্রয়োগ নিজ্জে বিতর্ক কম নয়। এ নিয়ে বঙ্কিমের বক্তব্যে যে স্বকীয়তা আছে তার পরিচয় গ্রহণ।
- সর্বোপরি ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনকালে জাতীয়তাবাদের যেভাবে উদ্ভব হয় তার অন্যতম উদগাতা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানকে স্মরণ করা।

## ২.০১ - ভূমিকা :

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার একজন অগ্রগণ্য বিদ্বজ্জন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (চ্যাটার্জী) (১৮৩৮-১৮৯৪) বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসিক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুই স্নাতকের অন্যতম ছিলেন।

ভারতে জাতীয়তাবাদের বিকাশের পথে সর্বাগ্রে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়, কারণ তিনিই প্রথম 'বন্দে মাতরম' শব্দবন্ধটির প্রচলন ঘটান, যা যুগ যুগ ধরে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণার মূল মন্ত্র হিসাবে বিবেচিত। 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি বাঙ্গালি শিক্ষিত মানস তৈরির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং স্বদেশপ্রেমী যুবমানসের আত্মিক ও বৌদ্ধিক চিন্তাভাবনাকেও প্রভাবিত করেছিলেন। ঊনবিংশ শতকের একজন প্রধান শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী হিসাবে তিনি বেশ কিছু উপন্যাস, কতগুলি মননশীল প্রবন্ধ, বেশ কিছু কৌতুক রচনা, এবং সমাজতন্ত্র ও আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ বিষয়ে অভিজ্ঞতাবাদী নিরীক্ষামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতে আধুনিক সমাজ গঠনের প্রশ্নে রামমোহনের পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান।

বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী ছিলেন এক বহুমুখী প্রতিভা যিনি তাঁর সাহিত্য এবং চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে বিপুল পরিশ্রম করে ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা এবং মেধাভিত্তিক কার্যক্রমের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। সামাজিক আধুনিকীকরণ এবং বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যে মধ্যবিত্ত প্রাগ্রসর সমাজের বাংলায় উদ্ভব ঘটেছিল তাঁরা প্রায় সকলেই বঙ্কিমী চিন্তাভাবনার ফসল। বিবেকানন্দের মতো বঙ্কিমও ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে আধুনিকতা, যুক্তিবাদ ও জাতীয়তাবোধের বাতাবরণ তৈরি করেছিলেন। বিবেকানন্দ এবং বঙ্কিমচন্দ্র দু'জনেই সামাজিক সাম্য এবং আর্থনীতিক সমতার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের মতো করে সাম্য ও সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আধুনিক ভারতের মানসিক পটভূমি তৈরির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এক উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

## ২.০২ জীবন ও সময়

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুন চব্বিশ-পরগণা জেলার নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় এক সম্ভ্রান্তশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্কিমের পিতা যাদবচন্দ্র মাসিক ৮ টাকা বেতনের সাধারণ সরকারি মুহুরির চাকুরিতে যোগ দিয়ে চাকুরির শেষ পর্বে মেদিনীপুরের ডেপুটি কালেক্টরের পদে উন্নীত হন। এখানে উল্লেখ করা যায়, যাদবচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে তাঁর চারপুত্রও ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। এটি একটি বিরল ঘটনা। নিঃসংশয়ে বলা যায়, সেই সময়ে এই পরিবারটি ছিল ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত, আর্থিক দিক থেকে যথেষ্ট সচ্ছল, ব্যতিক্রমী এক 'এলিট' পরিবার।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরের ইংরাজি স্কুলে। এরপরে তিনি ভর্তি হন হুগলি কলেজিয়েট স্কুলে ১৮৫৬ সালে তিনি হুগলি কলেজ ছেড়ে আইন পড়তে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। পরের বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন বিভাগ থেকে পরীক্ষা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ন হন। পরের বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পরীক্ষা চালু হলে পরীক্ষায় বসে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম হন, তবে এই পরীক্ষায় তাঁকে সাত নম্বর গ্রেস দেওয়া হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র মেধাবী ছাত্র হিসাবে দেশ-বিদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যে থেকে নিজের পছন্দমত মানসিক রসদ খুঁজে নিয়েছেন। ইংরাজি ও বাংলা ভাষাচর্চার সঙ্গে একই সাথে তিনি লাতিন, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী ভাষার চর্চা করতেন।

প্রত্যহ পড়াশোনার নিয়মিত অভ্যাস ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। ইংরাজি ও সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি থাকায় জ্ঞানের জগতের দুই বৃহৎ দরজা তাঁর জন্য খোলা ছিল। একই সঙ্গে তিনি গ্রহণ করেছেন পাশ্চাত্য আধুনিক জ্ঞানের ফসল ও স্বাদেশিক প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজি। বঙ্কিমের মনোভূমি ঔপনিবেশিক দখলদারী দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। ইংরাজি ভাষার যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও নিজের সাহিত্য কর্মে ইংরাজিকে বর্জন করে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ ও সমৃদ্ধ করার মধ্য দিয়ে বঙ্কিম তাঁর অন্তরের বাঙালি সত্ত্বাকে পরিপুষ্ট করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দার্শনিক যুক্তিবাদী অগুষ্ট কোঁৎ, বেন্থাম, জেমস মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখের আধুনিকতামনস্ক চিন্তাভাবনার দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন। আবার রুশো, ভলতেয়ার, সাঁ সিমো, রবার্ট আওয়েন এবং হয়তো বা কার্ল মার্কসের চিন্তার সঙ্গেও তাঁর পরিচিতি ছিল। তবে সাংস্কৃতিক দিক থেকে তাঁর আগ্রহ ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি, সমসাময়িক 'ইয়ং বেঙ্গল'দের অন্ধ পশ্চিমী অনুকরণকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। বঙ্কিমের কর্মজীবনের শুরুতে পঞ্চম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি থেকে শুরু করে দীর্ঘ তেত্রিশ বছরের চাকুরি জীবনের অবসানের সময়ে তিনি প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। শ্বেতাঙ্গ আমলাদের অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতায় শ্রেষ্ঠ হয়েও তিনি চাকুরি জীবনে উপযুক্ত স্বীকৃতি পাননি। বরং অনেক সময়েই ইংরেজ সাহেবদের ঔদ্ধত্যের কারণে তাঁকে অপমানিত হতে হয়েছে এবং কখনও কখনও বা ইংরেজদের সঙ্গে তার সম্পর্কের তিক্ততা আইন-আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। অনেক সময়েই তাই বঙ্কিমের লেখায় চাপা অপমানবোধ ও পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রকাশ দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ইংরেজিতে 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ' (১৮৬৪)। পরের বছরই তাঁর বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রাকশিত হয় (১৮৬৫)। এরপর 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রাধারাণী' (১৮৭৭), 'রজনী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'রাজসিংহ' (১৮৮১), আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), 'মুচিরাম গুড়' (১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৬-১৮৮৭) প্রভৃতি উপন্যাস, এবং 'সাম্য' (১৮৭৯), বিবিধ প্রবন্ধ (১৮৮৭), ধর্মতত্ত্ব (১৮৮৮), কৃষ্ণচরিত্র (১৮৯২) এবং বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় খণ্ড) (১৮৯২) প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেন।

লক্ষ করা যায় যে, বঙ্কিমের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তাবোধ এবং সেজন্য বাংলা ভাষাকে গড়ে তোলার পেছনে তার জাতি গঠনের প্রকাশ ও জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার সাধনা প্রকাশিত হয়েছে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এক ভাষাবন্ধন তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন যার মাধ্যমে আমৃত্যু তিনি এক নতুন, আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, ভারতীয় জাতিসত্তার খোঁজে প্রবৃত্ত থেকেছেন।

## ২.০৩ ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পারিবারিক প্রেক্ষাপট এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বেড়ে-ওঠা বাঙ্গালি মানসিকতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই তাঁর সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভাবনা গড়ে তুলেছিলেন এবং নিশ্চিতভাবেই

যাতে কিছুটা ধর্মের প্রভাব ছিল। সেই সময় কলকাতা শুধু যে দেশের রাজধানী ছিল তাই নয়, তখন থেকেই কলকাতা ছিল ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি মহসীন কলেজ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েও 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন, এমনকি দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মীয় বাতাবরণ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে যুক্তিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতির ভিত্তিতে ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজকে বিচার করতে চেয়েছেন এবং জাতীয়তাবাদের একটি ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন। প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে নিজেকে শুধু যুক্তই করেননি, তাকে সমর্থনও করেছেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ভারতীয় বুদ্ধিজীবি শ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করেন যাতে তাঁরা ব্রিটিশ বা ইউরোপীয় ধ্যানধারণার থেকে বিযুক্ত হয়ে ভারতের সনাতন ঐতিহ্য ও ধর্মীয় সংস্কৃতির চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থটিকে অংশত প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক বলে গণ্য করা হয়। গ্রন্থটিতে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বও আছে। তাতে তিনি মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে মহাভারত নিছক কল্পনাপ্রসূত মহাকাব্য নয়, ইতিহাসও। কারণ শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ মহাভারত ছাড়া বিভিন্ন সময়ে লিখিত পুরাণগুলিতেও পাওয়া যায়। কৃষ্ণচরিত্রটি তাই কবিমনা ভাবুকের কল্পনাজাত রূপকমাত্র নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র অবতারবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতাররূপে জ্ঞান করতেন। কিন্তু ভগবানের মনুষ্যদেহ ধারণ সম্ভব কিনা এবং তার প্রয়োজনই বা কি সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন:

'সম্পূর্ণ' ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ, ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারে না।—অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। ....এমতস্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন। ইহার অসম্ভাবনা কি?'

(বঙ্কিমরচনাবলী—সংসদ—২য় খণ্ড)

তবে কৃষ্ণচরিত্রে ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা অপেক্ষা কৃষ্ণের মানবচরিত্র উদ্ঘাটন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বধর্ম ও বর্ণাশ্রম বিষয়ক প্রত্যয় দুটিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন যে, স্বধর্ম ব্যাপকার্থে গীতায় প্রযুক্ত হয়েছে। কারণ গীতার উপদেশ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ নয়, তা সার্বভৌম। তাঁর কথায়: 'ইহজীবনে যে যে কর্ম্মকে আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাহার স্বধর্ম।' গীতার ব্যাখ্যানে—তিনি বলেছেন, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যে সমষ্টি তাহা পৃথিবীর লোকসংখ্যার অতি ক্ষুদ্রাংশ—অধিকাংশ মনুষ্য চতুর্বর্ণের বাহির। তাহাদের স্বধর্ম নাই? জগদীশ্বর কি তাহাদের কোনো ধর্ম্ম বিহিত করেন নাই? ...ম্লেচ্ছরা কি তাঁহার সন্তান নহে? ভাগবত ধর্ম এমন অনুদার নহে।'

সমকালীন যুগের দাবীতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন সংস্কৃতি ও অতীতের দিকে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু অতীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তিনি বর্তমানকে অস্বীকার না করে উভয়কে প্রয়োজনানুযায়ী সমন্বিত করার প্রয়াসী হন। স্বর্ণময় অতীতকে তিনি দেশ ও কালের অতীত, পরম তত্ত্ব বলে উপলব্ধি করতেন; এবং সে চেতনায় দেশ-কাল নির্বিশেষে পরমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্ম্মীয় আচার-আচরণে বঙ্কিমের বিশ্বাস ছিল না। বঙ্কিমের মতে ধর্ম্মের মূল কাজ হলো সমাজ জীবনে সুস্থিতি আনা ও সমাজজীবনকে পথ দেখানো। তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে বঙ্কিম হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির কথা বলে একধরনের ধর্মনিরপেক্ষ ধারণা

প্রকাশ করেছেন। এমনকি, তাঁর অর্থনৈতিক রচনা 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ তিনি হিন্দু-মুসলিম উভয় রায়তের অর্থনৈতিক সমস্যা ও বিকাশের কথা বলেছেন। সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র এবং তা হবে ধর্মনিরপেক্ষভাবে। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে বা অতিসাম্প্রতিক কালে সাম্প্রদায়িকতার যে ছবি আমরা দেখি, বঙ্কিমের রচনা বা চিন্তা ভাবনায় তার বিন্দুমাত্র রেশ ছিল না। বঙ্কিমের আকর্ষণ ছিল উপনিষদ-বর্ণিত হিন্দুধর্মে। আচার-নিষ্ঠা, পুরোহিত তন্ত্রের ঘেরাটোপে থাকা হিন্দুত্বের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। তবে, হিন্দুধর্মের জীর্ণ হয়ে যাবার সামাজিক চিত্র তাঁর কাছে পরিষ্কার ছিল। তাই তিনি চাইতেন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান এবং হিন্দুধর্মের সদ্ভাব ও মূল্যবোধের প্রসারণ। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি রামকৃষ্ণবাদীদের ও ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা প্রভাবিত হননি, এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একদিনের বেশি তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি।

বঙ্কিম ধর্ম ও সমাজকে অভিন্ন ভাবতেন। তাঁর মতে স্বাধীনতা অর্জনের পথে ধর্ম ও সমাজ পাশাপাশিই চলে। হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের মাধ্যমে তিনি মৃতপ্রায় ভারতীয় সমাজের পুনর্জীবন চেয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে এসে তিনি অনুভব করেছিলেন যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ও ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণকে নিজেদের সংগঠিত করতে হবে। বঙ্কিম রাজনীতিবিদ বা সমাজকর্মী ছিলেন না, কিন্তু তিনি এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, তদানীন্তন ভারতের অর্থনীতি-রাজনীতি এবং সামাজিক অবস্থার পুনর্গঠন প্রয়োজন। এই কারণেই তিনি হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের অনড়, স্থানুবৎ অবস্থানকে ঝাঁকুনি দিতে চেয়েছিলেন।

তাঁর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণ এবং জাতিকে পৃথকভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'বর্ণ' হলো সামাজিক বৈচিত্র্যের পরিচায়ক এবং 'জাতি' হলো সমাজের স্তরবিন্যাসের দ্যোতক। কিন্তু যেহেতু 'জাতি' সামাজিক সাম্যের নীতির বিরুদ্ধাচারণ করে, সেইজন্য প্রয়োজন হলে আইনের দ্বারাও জাতিপ্রথার অবসান ঘটানো উচিত। তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর' রচনায় তিনি এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থার কথা বলেছেন যেখানে জাতিভেদ ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রূপ মন্তব্যই করা হয়েছে। বংশানুক্রমিক এবং ঐতিহ্য অনুসারী যে সামাজিক অসমতা লক্ষ্য করা যায়, বঙ্কিম সে সম্পর্কে বিদ্রূপ সমালোচনাই করেছেন।

তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধে' বঙ্কিম মন্তব্য করেছিলেন, তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর আরাধনাই সনাতন হিন্দুধর্ম নয়। বরং ঈশ্বর, ভক্তি, মানবজাতির প্রতি ভালবাসা এবং মানসিক শান্তিই হল হিন্দুধর্মের মূল কথা, যা সর্বজনীন মানবধর্মের কথাও। সাম্প্রদায়গত বিভেদের কোনো তত্ত্বই তিনি সমর্থন করেননি। বরং হিন্দু মুসলমানের সমতার দৃষ্টিভঙ্গীকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমের ধর্মচেতনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, বঙ্কিমের ভাবনায় সর্বজনীন মানবধর্মের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভারতীয় রাজনীতির সঠিক স্বরূপ উপলব্ধিতে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম ও সমাজের পরস্পরনির্ভরতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

## ২.০৪ সাম্যের ধারণা

সাম্যের পূজারীরূপে বঙ্কিমচন্দ্র সুপরিচিত। এ সম্পর্কে লেখাগুলি তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১৮৭৩-৭৫ সাল নাগাদ প্রকাশিত হয়েছিল। পরে গ্রন্থাকারে সেগুলি প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, যে ওই বিষয়ে তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটে। ভূমিকায় তিনি আগেই বলেছিলেন, তাঁর সেইসব আলোচনা পাশ্চ্যাত্ত্য চিন্তার ধারাবহ নয়। কারণ পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদার্শনিকরা সাম্যকে নাগরিক (civic) ও রাজনৈতিক দৃষ্টিতেই শুধু বিচার করেছেন; আর একদল করেছেন অর্থনৈতিক দিক থেকে। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ সামাজিক দৃষ্টিকোণেই সাম্যের আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করতেন, নাগরিক ও রাজনৈতিক সাম্য ইংরেজদের আনুকূল্যে এদেশে অল্পবিস্তর প্রবর্তিত হয়ে থাকলেও সাধারণ মানুষ সেগুলির উপকার থেকে বঞ্চিত, কারণ এদেশের সমাজেই সাম্য প্রতিষ্ঠা পায়নি। মানুষে মানুষে কৃত্রিম বৈষম্য থাকলে আইনানুগ সাম্য নিষ্ফল হয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক সাম্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর অর্থনৈতিক সাম্যকে তিনি গ্রহণ করেছেন সামাজিক সাম্যের তাগিদেই। বৈষয়িক উন্নতি অবশ্যই চাই; গ্রাসাচ্ছাদনের নিরাপত্তা না থাকলে সমস্ত নীতিবাক্যই নিঃসার বলে প্রতিপন্ন হয়।

বহুদিক থেকে তিনি অসাম্য প্রত্যক্ষ করেছেন—রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক ও বর্ণবৈষম্যমূলক। প্রাকৃতিক সাম্যে তিনি বিশ্বাস করতেন না। দেশের যত কিছু দূর্গতির মুলে তিনি কৃত্রিম অসাম্যকেই দায়ী করেন। সাম্যপ্রতিষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসে তিনজনকে পথপ্রদর্শক মনে করতেন, যথা: বুদ্ধ, যিশু ও রুসো। বুদ্ধদেব শূদ্রদের ব্রাহ্মণদের স্তরে উন্নীত করার প্রয়াসী হয়েছিলেন; ফলে সেই সময়ে ভারতীয় সভ্যতার গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। যিশুখ্রীষ্ট কৃতদাসদের শৃঙ্খল মোচনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ভলতেয়ারের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্র রুসোর অর্থনৈতিক সাম্যকে অপছন্দ করতেন। তবে ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে রুসোর চিন্তাই গতিবেগ সঞ্চার করে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। ফরাসী বিপ্লব পশ্চিমী সভ্যতার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, রুসোর সমাজ-সাম্যের চিন্তাই তার প্রধান প্রেরণা ছিল। রুসোকেই তিনি সাম্য ও সমাজবাদের জনক বলে অভিহিত করেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি সম্পর্কে জন স্টুয়ার্ট মিল-এর চিন্তা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, লালনপালনে যেটুকু প্রয়োজন তার বেশি পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার সন্তান-সন্ততিদের না থাকাই কাম্য, বাকিটা সমাজের কর্তৃত্বাধীনে যাওয়াই সংগত। সাম্য ও সমাজবাদের জয় যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে তাঁর দৃঢ়প্রত্যয় ছিল। তবে সাম্যবাদ সম্পর্কে চিন্তার অসচ্ছতা থাকার ফলে তাঁর মনোভাবে কিছুটা নৈরাজ্যবাদী চিন্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

সাম্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে সাম্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার নিরসনকল্পে পূর্বেই তিনি তাঁর 'সাম্য' নিবন্ধের উপসংহারে লিখেছিলেন:

'আমরা সাম্যনীতির এরূপ ব্যাখ্যা করি না যে, সকল মনুষ্য সমান অবস্থাসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা কখনো হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, শারীরিক বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশই অবস্থার তারতম্য ঘটিবে—কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যক—কাহারও শক্তি থাকিলেও অধিকার নাই বলিয়া যেন বিমুখ না হয়। সকলের মুক্তির পথ মুক্ত থাকা চাই।

## ২.০৫ জাতীয়তাবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ থেকে যে দুটি আধুনিক মতবাদ ভারতে জ্ঞানদীপ্তি (enlightenment) এবং নবজাগরণের (renaissance) বিকাশ ঘটিয়েছিল তার একটি হল উদারনীতিবাদ এবং অন্যটি জাতীয়তাবাদ। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে এই উদারতন্ত্র মানুষের মন থেকে কুসংস্কার ও মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা দুর করেছিল। এই বাতাবরণে যুক্তির সার্বভৌমত্ব এবং মুক্তমনা কুসংস্কারহীন মানসিকতার ভিত্তিতেই অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব এবং রাজনীতিতে নতুন নতুন চিন্তাভাবনার উদ্রেক হয়েছিল। রামমোহন রায়ের চিন্তাভাবনার মধ্যে যে নতুন ভারতের ধারণাসূত্র ছিল, তাই পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি ও জাতীয়তাবাদের ধারণায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক সময়ে 'ন্যাশনাল পত্রিকা', 'ন্যাশনাল পার্টি', 'ন্যাশনাল মেলা' প্রভৃতির মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার কোনো স্পষ্ট রূপ ছিল না। শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত ভারতীয়দের মনে এই জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম জাতীয়তাবাদের নবঅঙ্কুরিত আবেগকে সুস্পষ্ট দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণাঙ্গ ও সুসংবদ্ধ রূপে উপস্থাপিত করেন।

পাশ্চাত্য দর্শনে জাতীয়তা বা জাতিসত্তার ধারণা বিভিন্ন জাতির স্বার্থ, সংস্কৃতির পৃথক সত্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই আপাতভিন্নতা দূর করে, আঞ্চলিক বা পেশাগত ও শ্রেণীগত পরিচিতি দূরে সরিয়ে যখন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ ভাষাগতভাবে, সংস্কৃতিগতভাবে, সামাজিক অভ্যাসগতভাবে এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে নিজেদেরকে একসাথে গড়ে তোলে এবং অন্য সামাজিক, রাজনৈতিক গোষ্ঠী থেকে নিজেদেরকে পৃথক ভাবে তখনই একটি জাতিসত্তার উদ্ভব ঘটে। এরই সঙ্গে যদি অতীতে একটি দুর্ভোগ বা দুঃখের কারণে তারা সমব্যথী হয় এবং নতুন একটি স্বপ্ন দেখার ভিত্তিতেও ঐকমত্যে পৌঁছায় তবে একটি জাতির আবির্ভাব ঘটে এবং তার মধ্যে এই জাতিসত্তার বোধ জেগে ওঠে এবং নবগঠিত জাতিগুলি সামন্ততান্ত্রিক অভিজাততন্ত্রের অবসান চায়। মার্কসবাদ যদিও পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষার প্রেক্ষাপটেই জাতীয়তাবাদের উন্মেষের কথা প্রচার করে বলে, স্বদেশপ্রেম ও পুঁজিবাদই জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটায়। তবে ইদানীংকালে অনেক গবেষক মার্কসীয় তত্ত্বটির অসারত্ব দাবী করেন, কিন্তু এটা মানতেই হবে যে, জাতীয়তাবাদের আদর্শ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিতে একধরনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মতাদর্শ ও শক্তির জন্ম দিয়েছিল।

ভারতে এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম থেকেই জাতীয়তাবাদের উদ্ভব যা অনেকটাই পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার এবং ঔপনিবেশিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটনের মধ্যে দিয়ে উন্মেষিত হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যগরিমা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী অহংবোধে উৎসাহ যুগিয়েছে। এই সমস্ত ঐতিহাসিক কারণেই ভারতেও জাতিগঠনের প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের এই জাতিগঠন ও জাতীয়তাবাদী চিন্তার অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন।

জাতীয়তাবাদী চেতনা শুধু যুক্তিনির্ভর নয়, তা আবেগ-নির্ভরও বটে। জাতীয় ঐক্যবোধ তথা সংহতির এই আবেগগত উপাদানটির ওপরও বঙ্কিমচন্দ্র সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এজন্য দু'ধরনের মনোভাব আবশ্যক বলে তাঁর মনে হয়েছে। প্রথমত, প্রত্যেক ভারতীয় বা হিন্দুকে অন্য সব ভারতীয় বা হিন্দুর স্বার্থের সঙ্গে, তাদের চিন্তা, বিশ্বাস ও কর্মের সঙ্গে, একাত্মবোধ করতে হবে। 'মতৈক্য এবং একোদ্যম'-

এর মাধ্যমেই গড়ে ওঠে একটি জাতি। দ্বিতীয়ত, জাতীয় স্বার্থের প্রতি প্রত্যেকের থাকতে হবে একনিষ্ঠ ভক্তি, জাতীয় কল্যাণের জন্য উদবেলিত এক ব্যাকুলতা বা প্রাণ বিসর্জনেও প্রস্তুতি, অন্য জাতির স্বার্থের বিনিময়েও যা আপন জাতির স্বার্থরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের স্পস্টোক্তি, "হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে, তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গল আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহই করিব। ইহাতে পরজাতিপীড়া করিতে হয় করিব।" এই মনোভাবের "গুরুতর দোষাবহ বিকার" সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন ছিলেন। পাশ্চাত্যের অনেক উদাহরণও আছে। কিন্তু জাতীয় মনোভাব ও স্বাধীনতা স্পৃহার এই বাস্তব চরিত্রকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। তাই হিন্দুধর্মের ব্যঞ্জনায়, দেশমাতৃকার প্রতীকে, ভক্তি ও অনুশীলনের পথে এবং 'বন্দে মাতরম' শ্লোগানের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের ব্যাপকতম মানুষের হৃদয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার আবেগ ও কর্মোদ্দীপনা সঞ্চার করতে চাইলেন। তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাস এই প্রচেষ্টায় সার্থক ভূমিকা গ্রহণ করল। দেশজননী ভিন্ন আপনমাতৃক সন্তানদলের মাতৃমন্দিরে 'মা যা ছিলেন', 'মা যা হইয়াছেন' ও 'মা যা হইবেন'—দেবী ভবানীর এই ত্রিবিধ রূপায়ণ। ভক্তিধর্মে দীক্ষিত সন্তানদলের সংগঠিত অভ্যুত্থান এবং 'বন্দে মাতরম' যুদ্ধনিনাদ বঙ্কিমচন্দ্রের উগ্র হিন্দুবাদী জাতীয়তাবাদকেই মূর্ত করে তুলেছে।

দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের মৌল উপাদানটি ভারতের নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতি থেকে সংগৃহীত হলেও একটি তত্ত্ব হিসেবে তার গ্রন্থনা অনেকাংশেই ইংরেজ -প্রভাবিত এবং দোলাচলে-আক্রান্ত মধ্যবিত্ত মানসকেই প্রতিফলিত করে। একদিকে আবেগহীন যুক্তিবাদ দিয়ে পাশ্চাত্যের সংযোগে ভারতীয় আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রয়াস, অপরদিকে এক যুক্তিহীন আবেগে ভারতের গৌরবময় হিন্দু অতীতের মধ্যে জাতিসত্তার অন্বেষণ—বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তায় প্রকটিত এই মূল দ্বন্দ্বই নানা অসংগতির কারণ হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়টির আকর্ষণই ছিল তাঁর কাছে বেশি, তাই এই জাতীয়তাবাদের চরিত্র হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী। তাঁর দৃষ্টিতে ইংরেজরা ভারতের উদ্ধারকর্তা, বিধাতার আশীর্বাদ, তারাই দুর্বিসহ মুসলমান শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করেছে। তাই তারা 'মিত্র রাজা'। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারকামী সন্তান দল বিদ্রোহী হয়েছিল ইংরেজকে শাসন ক্ষমতায় অভিষিক্ত করার লক্ষ্যেই।

অনেকের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বানুযায়ী ভারতের জাতিসত্তা হিন্দুধর্মের সমার্থক। হিন্দুস্বার্থের ওপরে কোনো জাতীয় স্বার্থের অস্তিত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় জাতীয় স্বার্থও এখানে হিন্দুস্বার্থের সমার্থক। সমষ্টি হিসেবে হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে বড়ো হলেও মোট ভারতীয় জনসমষ্টির চেয়ে ছোটো। কিন্তু হিন্দু স্বার্থই যেহেতু জাতীয় স্বার্থ, তাই বৃহত্তর স্বার্থের আনুকুল্যে আপন স্বার্থত্যাগের কোনো প্রয়োজন তাদের নেই।

কিন্তু হিন্দুধর্মকে যতই পরিশুদ্ধ করা হোক না কেন ও তার সংস্কৃতিগত অনুপমত্বকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা এবং জাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুশীলন-এর মধ্য দিয়ে জাতীয় চরিত্র নির্মাণ পরিচালনার মাধ্যমে যে 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের' প্রকাশ বঙ্কিমচন্দ্র তুলে ধরলেন, তার সঙ্গে অ-হিন্দু জনগণের একাত্ম বোধ করার কোনো ক্ষেত্র রইল না।

জাতীয় ঐক্যের মূল গ্রন্থি যে ভাষার একতা, এই প্রত্যয় থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের

অনুরাগ জন্মেছিল। তাঁর চেতনায় বাঙালি শ্রেয়বোধের পরিব্যাপ্তি ভারতীয়ত্বকে তেমনভাবে প্রতিষ্ঠা দিতে পারেনি। ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রত্যয়কে তা দুর্বল করে। 'জাতি' শব্দটিকে তিনি আদৌ পাশ্চাত্য অর্থে ব্যবহার করেননি। অথচ তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষনা করেছেন যে, ইংরেজের সংস্পর্শে আসার আগেই ভারতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছে। কেননা, তাদের চিন্তার ভাণ্ডার থেকেই 'স্বাতন্ত্রপ্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠা এই দুইটি অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চাতে কল্পনা ও আখ্যানের ভূমিকা নিয়ে সুদীপ্ত কবিরাজ এক চিত্তাকর্ষক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছেন। সুদীপ্তবাবু দেখিয়েছেন যে, বঙ্কিমের এই ইতিহাসবোধ ইতিহাস রচনার সেই উপনিবেশিক বিধানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, যে বিধান অনুযায়ী রচিত ইতিহাসে ভারতীয়দের ইতিহাসের বার্তা হিসেবে স্বীকৃতিতো দেওয়া হয়ইনি, বরং সেই ভারত ইতিহাসে ভারতীয়দের যে আদৌ কোনো ইতিহাস আছে সেই সত্যটাকেও অস্বীকার করা হয়েছে। বঙ্কিম একটি নতুন বার্তা বা বিষয় উত্থাপন করেন ভারতীয় জাতির নাম দেবার জন্য ভারতের একটি কাল্পনিক ইতিহাস ও অতিকথন (myth) নির্মাণ করার স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবাদী উপন্যাসগুলির মধ্যে তাঁর আখ্যানগুলি নতুন ঐতিহাসিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে জাতির মধ্যে এক নতুন আশাবাদের জন্ম দিয়েছিলেন। এই আখ্যানগুলি রাজনৈতিক কল্পকথাগুলিকে বাস্তব করে তুলেছিল। এই কারণে সুদীপ্তবাবু যুক্তি দিয়েছেন, যে বঙ্কিমের হাতে ইতিহাস হয়ে উঠেছে এক ক্ষমতাপ্রদানকারী অংশ, যা নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রায়োগিক উদ্যোগকে যুক্তি ও বৈধতা প্রদান করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি প্রকৃত ব্রাহ্মণসুলভ গুণের অধিকারী যোদ্ধা-সন্ন্যাসী-দার্শনিকদের নেতৃত্বে আসন্ন গণসমাবেশের বিষয়ে আমাদের অবহিত করেছে। আর সব চাইতে বড়ো কথা হল প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভারতে 'আনন্দমঠ', গীতা ও বন্দে মাতরম্ হয়ে রয়েছে জাতীয়তাবাদের প্রতিমূর্ত্তি।

## ২.০৬ উপসংহার

বাংলায় আধুনিকতার প্রবর্তক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান তাঁর চিন্তা ও বোধকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মননে ও চিন্তনে ভারতীয় ঐতিহ্যের গরিমা ও ধর্মীয় বিশ্বাস এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের এক প্রকার বৈপরীত্যের সহাবস্থান ছিল। তবে এটা মানতেই হবে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মনে স্বাজাত্যবোধ, দেশপ্রেম প্রভৃতি মূল্যবোধ সঞ্চারে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা ও ভাবনা সুগভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনায় ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

## ২.০৭ সহায়ক পাঠ


১. এস. কে. হালদার—ফাউন্ডেশন অফ্ ন্যাশালিজম্ ইন্ ইন্ডিয়া: এ স্টার্ডি অফ বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী।
২. পার্থ চট্টোপাধ্যায়—ন্যাশানালিস্ট থট্ এণ্ড দ্য কলোনিয়াল ওয়ার্ল্ড: এ ডেরিভেটিভ ডিসকোর্স।

৩. সুদীপ্ত কবিরাজ—দি আনহ্যাপী কনশাস্‌নেস: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এন্ড দি ফর্মেশন অফ ন্যাশানালিস্ট ডিসকোর্স ইন ইন্ডিয়া।
৪. সৌরীন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা।
৫. অরবিন্দ পোদ্দার— বঙ্কিম মানস।
৬. অশোককুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পা) - ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয় (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ)।

## ২.০৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

**সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্নাবলী :**

১. বঙ্কিমকে কেন একজন নানাগুণসমন্বিত প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি বলা হয়?
২. বঙ্কিমের জীবন এবং তাঁর সমসাময়িক সময় ও সমাজ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৩. বঙ্কিমের জীবনের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।
৪. ভারতে আধুনিকতার বিপ্লবের পথিকৃৎ হিসাবে বঙ্কিমের মূল্যায়ন করুন।
৫. 'সাম্য' বিষয়ে বঙ্কিমের ধারণাটি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করুন।

**দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্নাবলী :**

১. ভারতে আধুনিকতার প্রবর্তকরূপে বঙ্কিমের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।
২. জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।
৩. বঙ্কিমের সাম্য-সম্পর্কিত ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।
৪. একজন আধুনিক চিন্তাবিদ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় আপাতবৈপরীত্য বিশ্লেষণ করুন।
৫. যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদী চিন্তা গড়ে উঠেছে সে বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য করুন।

# একক - ৩ ❑ সৈয়দ আহ্‌মেদ খান (১৮১৭-১৮৯৮)

গঠন :

৩.০১ ভূমিকা
৩.০২ জীবন ও সময়
৩.০৩ রাষ্ট্রতত্ত্ব
৩.০৪ কংগ্রেস রাজনীতি থেকে দূরত্ব
৩.০৫ জাতিচেতনার প্রাবল্য
৩.০৬ আধুনিক যুক্তিবাদী সৈলাম ধর্ম
৩.০৭ ধর্ম ও রাজনীতি
৩.০৮ উপসংহার
৩.০৯ সহায়ক পাঠ
৩.১০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ্যাংশটি পড়ার উদ্দেশ্য হল

- আধুনিক যুগে প্রবেশোন্মুখ ভারতীয়দের মধ্যে মুসলমান সমাজে প্রথম আলোড়ন পর্বটি স্মরণে রাখা।
- পশ্চিমী অভিজ্ঞতা প্রসূত রাষ্ট্রবিষয়ক ধারণার গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে সৈয়দ আহ্‌মেদ খানের মতামত জেনে নেওয়া
- সমকালীন জাতীয় রাজনীতির মূল মঞ্চ জাতীয় কংগ্রেসের থেকে মুসলমান সমাজকে দূরে টেনে আনায় সৈয়দ আহমেদের ভূমিকা এবং
- ধর্ম ও রাজনীতির বিতর্কিত সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বিশ্লেষণ।

## ৩.০১ ভূমিকা

সৈয়দ আহ্‌মেদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) : ভারতবর্ষে "মুসলিম আধুনিকীকরণ"-এর জনক বলেই সবিশেষ পরিচিত। একজন শিক্ষিত এবং মুসলিম সমাজের আধুনিকীকরণের প্রবর্তক রূপে সৈয়দ্ আহমেদ খানকে বুঝতে হলে, তাঁর সমসাময়িক মুসলিম সমাজের সামাজিক-আর্থিক প্রেক্ষাপটটি বোঝা দরকার। মধ্যযুগে

মুসলিমদের যে প্রাধান্য ছিল, তার মূলে ছিল তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রাধিকার। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সময় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি যত দৃঢ় হতে লাগলো, মুসলিম রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ততই অবনতি হতে থাকলো। এই সময়ই ভারতীয় উপমহাদেশে ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্যকরণ, বিজ্ঞান-নির্ভর আধুনিকীকরণ এবং শিল্প-কৃৎকৌশলগত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের একেবারে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। হিন্দু সমাজ ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানালো, বিপ্রতীপে মুসলিম সমাজের কাছে তা হয়ে উঠলো অভিসম্পাত ও দুর্দশার সূচনা। মুসলিম নেতারা রাজনৈতিক পরিবর্তন বুঝতে চাইলেন না, এবং এই কারণেই তাঁরা এক ধরনের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার শিকার হলেন। হিন্দুরা চিরকালই বাইরের সমাজ থেকে আগত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে, তাই ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান ও ব্রিটিশ সংস্পর্শকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিল। কিন্তু সম্ভ্রান্ত মুসলিমরা পাশ্চাত্য-সংস্কৃতি ও ইংরাজী শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে রেখে, কোরান এবং হাদিশ-এর নির্দেশকেই আপ্তবাক্য মনে করে সামাজিক জীবনচর্যা অতিবাহিত করতে লাগলেন। মুসলিম সমাজের মধ্যে এই পুরাতনকে আঁকড়ে থাকার প্রবণতার কতকগুলি দিক্‌চিহ্ন সমাজের আচার-আচরণে প্রতিভাত হলো। এগুলি হ'লো — (ক) প্রাচীন মৌলবাদ, (খ) আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ, (গ) রক্ষণশীল সংস্কারধর্মীতা, (ঘ) আধুনিক সংস্কারবাদ, (ঙ) ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ। সৈয়দ আহ্‌মেদ খান ছিলেন চতুর্থপন্থী, অর্থাৎ আধুনিক সংস্কারবাদী। উনবিংশ শতাব্দীর উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তিনি ইসলামকে নতুন করে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। আল্লার বাণী (কোরান) এবং আল্লার কাজকে ভিন্নভাবে না দেখতে বলে তিনি ইসলামের এক যুক্তিসিদ্ধ নবতর ব্যাখ্যা হাজির করলেন। অনেকটা রামমোহন রায়ের মতোই তিনিও বিশ্বাস করতেন ধর্মীয় ধারণাকে যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করা উচিত, এবং সমসাময়িক জ্ঞান ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ধর্মীয় ভাবনা ও চিন্তাকে পরিবেশন করা উচিত।

## ৩.০২ জীবন ও সময়

১৮১৭ সালের ১৭ই অক্টোবর দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে সৈয়দ আহ্‌মেদ খান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবকাল অতিবাহিত করেন তাঁর মাতামহ ফরিউদ্দিনের তত্ত্বাবধানে, যিনি ১৭৯৯ সালে কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর প্রথাগত শিক্ষা ছিল গুণীন পন্থী এবং তা সম্পূর্ণও হয়নি। কিন্তু আপন অধ্যবসায় আর প্রয়াস দিয়ে তিনি শিক্ষার পথে অগ্রসর হন, এবং ধর্ম, দ্বন্দ্ববাদ, ইতিহাস, শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ে সৃষ্টিশীল প্রবন্ধ রচনা করতে থাকেন। তাঁর উপর রামমোহন রায়ের প্রভাব ছিল প্রবল। ১৮৩৮ সালে বাবা মারা যাবার পর জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিচার বিভাগীয় দপ্তরে যোগ দেন। ১৮৫৫ সালে 'সদর আমিন' পদে তাঁর পদোন্নতি ঘটে। ১৮৫৭ সালে বিজনোরে তাঁর বদলি হয়।

১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহে তিনি সরকারী কৃত্যক হিসাবে অংশ নেন এবং এরপর থেকেই রাজকীয় সেবকের আনুগত্য বিসর্জন দিয়ে ক্রমেই একজন দৃঢ়চেতা মুসলিম জাতীয়তাবাদী রূপে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৮৫৭

বৎসরটি সৈয়দ আহমেদ খানের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য বাঁক, সেখান থেকে তাঁর জীবন ও দর্শন এক নতুন খাতে বইতে থাকে। ১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহের সময় তিনি ২০ জন ইউরোপীয়দের প্রাণ বাঁচান। মহাবিদ্রোহের সময়ও তিনি রাজশক্তির সমর্থক ছিলেন। কিন্তু এর অব্যবহিত পরে ভারতীয় মুসলিম জনতার সঙ্গে ব্রিটিশ রাজশক্তির মন্দ আচরণ, অন্যায় ও অসম বিচার দেখে তিনি ব্রিটিশ রাজশক্তির উপর এতটা বিরক্ত হয়ে ওঠেন যে তিনি ভারতত্যাগের সিদ্ধান্তও প্রায় নিয়ে ফেলেছিলেন। এই সময়ের পর থেকেই মুসলিম জাতীয়তাবাদী হিসাবে তাঁর উত্থান শুরু হয়।

১৮৫৭'র বিদ্রোহ দমন করার পর ব্রিটিশরা হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল। দিল্লীর সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা শাস্তি ও দমনপীড়নের ভয়ে ক্রমেই নির্জীব হয়ে পড়ছিলো। ১৮৭৬ সালে চাকুরি থেকে অবসর নেবার পরবর্তী বিশ বছর তিনি ভারতে মুসলিম সমাজের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। ইউরোপীয়ান এবং মুসলিম শিক্ষা-শিক্ষণের মধ্যে তিনি এক ধরনের ভারসাম্য বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজেকে প্রথমে একজন মুসলিম ও পরে একজন ভারতীয় ভাবতেন। প্রশাসনে, শিক্ষায়, স্থানীয় স্তরের প্রশাসনে তিনি হিন্দু-মুসলিম অসমতা লক্ষ করেন। ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমেই তিনি এই অসমতা দূর করে ভারতে মুসলিম সমাজের জন্য এক নতুন আলোকবর্তিকা বহন করার প্রধান দাবীদার হয়ে ওঠেন। ১৮৬৬ সালে আলিগড় ইনস্টিটিউট গেজেট স্থাপন, ১৮৬৯-৭৯ ইংল্যান্ড ভ্রমন, ১৮৭৮ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হওয়া, ১৮৮২ সালে ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য হওয়া তাঁর ব্রিটিশ শাসকের সাথে ঘনিষ্ঠ ও ব্যতিক্রমী মুসলিম ভারতীয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কতকগুলি দিক্‌চিহ্ন। ইসলামের এক উদারনৈতিক ব্যাক্ষ্যার মধ্যে দিয়ে তিনি কৃষক থেকে সম্ভ্রান্ত মুসলিম মানুষজনের জন্য এক নবজাগরণের বাতাবরণ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৯৮ সালের ২৮শে মার্চ তিনি দেহত্যাগ করেন।

## ৩.০৩ রাষ্ট্রতত্ত্ব

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সৈয়দ আহমদ খান বাস্তব যুক্তিনির্ভর রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রচার করেছেন। তার মতে এই বিদ্রোহের কারণ ছিল ব্রিটিশ ভারতের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ আবশ্যক না হওয়ায় শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয় এবং ফলে উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়ার বিপুল ঘাটতি সৃষ্টি হয়। প্রায় শত বৎসর ধরে ভারতে ব্রিটিশরা শাসন করেছে। কিন্তু তারা কখনো জনসাধারণের সুখ-দুঃখ, আবেগ-অভিযোগ শাসককে জানাবার কোন রাস্তাই খোলা পায়নি। তাঁর মতে এই প্রাচীন কারণটি ছাড়াও সিপাহী বিদ্রোহের আরও কারণ আছে। সেগুলি হল —

১। ব্রিটিশদের দ্বারা রচিত আইন ভারতের চিরাচরিত ঐতিহ্য, রীতি ও প্রথার বিরুদ্ধে গেছে।

২। সরকার জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খাকে অবজ্ঞা করেছেন।

৩। সুশাসনের উপযোগী সরকার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ন্যূনতম উপায়গুলিকে অবজ্ঞা করা হয়েছে।

৪। সামরিক বাহিনীকে দুর্বল হাতে পরিচালনা করা হয়েছে।

**শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক ঃ—** সৈয়দ আহমেদ খান শাসক ও শাসিতের সুসম্পর্কের উদারনীতিবাদী ধারণাকে দৃঢ়ভাবে লালন করতে চান সংখ্যাগরিষ্ঠর গণতন্ত্রে তাঁর আস্থা ছিল না। কারণ তাঁর মতে এর দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠর স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এর ফলে ভারতবর্ষে মুসলমানদের সর্বনাশ ঘটবে বলে তাঁর আশঙ্কা ছিল। অন্যদিকে মুসলমানরা যে কোনোভাবেই সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ছিল না, তা প্রমাণ করার জন্য তিনি নানা যুক্তির জাল বিস্তার করেছেন।

**ব্রিটিশ ও মুসলিমদের দূরত্বের ব্যবধান হ্রাস ঃ—** ব্রিটিশ ও মুসলমান সমাজের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান কমানোর জন্য সৈয়দ আহমেদের যুক্তি লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন ইসলাম খ্রীস্টধর্মের প্রতি বীতরাগ নয়। ইতিহাসে খ্রীস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে যে ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল তা ধর্মভিত্তিক ছিল না তা ছিল রাজনৈতিক। ব্রিটিশ তথা খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রকৃত কোনো বিরোধ নেই।

**হিন্দুদের সম্পর্কে মনোভাব ঃ—** সৈয়দ আহমেদ প্রথম থেকে হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি বলেছেন, হিন্দু আর মুসলমান উভয়েই বহু শতাব্দী পূর্বে অন্য দেশ থেকে এসেছে এবং ভারতকেই তাদের বসবাসের স্থান হিসাবে পছন্দ করেছে ও গড়ে তুলেছে। এখানে তারা একই হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেয়, একইসঙ্গে বাঁচে ও মরে। এদের মধ্যে প্রকৃত ভালোবাসা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও হৃদয়ের ঐক্য না থাকলে ভারতের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

সৈয়দ আহমেদের চিন্তা বৈপরীত্যমুক্ত ছিল না। ১৮৮৪ সালের পর সৈয়দ আহমেদের দৃষ্টিভঙ্গী বিভেদনীতির দিকে পরিচালিত হয়। এইসময় সরকারি চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা মুসলমানদের প্রত্যাশিত সমৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। ফলে এই বাধা অতিক্রম করার জন্য সৈয়দ আহমেদ ব্রিটিশদেরই পক্ষপাতিত্বের সমর্থক ছিলেন। তিনি বলেছেন অদূর ভবিষ্যতে ব্রিটিশ শাসন দূরীভূত হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং তাঁর আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নয়। তিনি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করতে চান। হিন্দু ও মুসলমান হল দুটি আলাদা জাতি। গণতন্ত্রের পথে প্রতিটি পদক্ষেপ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে মুসলমানদের নিপীড়নের কারণ হবে। এই কারণে সৈয়দ আহমেদ ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সরকারী প্রশাসনে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে, প্রাচ্য বাসীদের তুলনায় ইংরাজদের অপরিসীম শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। সৈয়দ আহমেদের এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রচারের ফলে নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ সরকার দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদনীতি প্রয়োগে উৎসাহিত হয়েছিল।

## ৩.০৪ কংগ্রেস রাজনীতি থেকে দূরত্ব

১৮৮৫ সালে অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম ব্রিটিশবিরোধী ক্ষোভের 'সেফটি ভাল্ব' হিসাবে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করলেন। সৈয়দ আহমেদ খাঁ সক্রিয়ভাবে কংগ্রেস বিরোধিতা করেননি। কিন্তু নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলি প্রমুখের সঙ্গে ২৫শে ডিসেম্বর প্রথম অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলেন। ক্রমশ এই নিষ্ক্রিয়তা বিরোধিতার পর্যায়ে পৌছালো। তিনি বললেন, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার অর্থই হল ব্রিটিশ সরকারের

বিরোধিতা করা। ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও বর্তমান দিনের বাস্তবতা সম্পর্কে ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে জাতীয় কংগ্রেস রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়।

**সৈয়দ আহমেদে-এর বক্তব্য ঃ—** যে সৈয়দ আহমেদ ১৮৮৪ সালে বলেছিলেন, "বাঙালিরা হল একমাত্র জাতি যাদের জন্য আমরা গর্ববোধ করি, এবং তাদের জন্যই আমাদের দেশে জ্ঞান, স্বাধীনতা, দেশপ্রেম বিকশিত হয়েছে," তিনিই ১৮৮৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের সময় লক্ষ্ণৌ শহরে একটি সভায় ঘোষণা করলেন "যদি চান বাঙালিরা বাঙালি শাসনের অধীনে এই দেশ শাসন করুক তাহলে বরং ঈশ্বরের নাম নিয়ে ট্রেনে উঠুন ও মাদ্রাজ চলুন।" ইসলামীয় নিয়তিবাদকে যিনি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন এবং সিপাহী বিদ্রোহকে উদারনীতির আলোয় বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন তিনিই কংগ্রেসের মতো তৎকালীন নরমপন্থী ও আপোসমুখী সংগঠনকে "রাষ্ট্রদ্রোহী সংগঠন" হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই কারণে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরের বছর ১৮৮৬ সালে সৈয়দ আহমেদ 'অ্যানুয়াল মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স' স্থাপন করেছেন।

বদরুদ্দীন উমরের মতে, সৈয়দ আহমেদের এই পরিবর্তনের কারণ দুটি — প্রথমত,
১। সংখ্যালঘু মুসলমান সম্পর্কে কংগ্রেসের ইতিবাচক ভূমিকার অনুপস্থিতি এবং দ্বিতীয়ত, আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ থিয়োডোর বেক-এর ভেদনীতি। তাঁর মতে স্যার সৈয়দ আহমেদকে দ্রুতগতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদীতে পরিণত করার ব্যাপারে বেক-এর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ খুব সুবিদিত এবং বেক-এর মাধ্যমে ইংরেজ সরকারই যে স্যার সৈয়দ আহমেদকে এইভাবে চালনা করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

স্যার সৈয়দ আহমেদের শ্রেণীবিভাজন প্রথিত ছিল ব্রিটিশ ভারতে উদীয়মান মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের মানসিকতায়। এই শ্রেণীর স্বাধীন বিকাশ না হওয়ার ফলে এরা একদিকে সামন্তবাদী ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদ আর অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে আন্দোলিত হয়েছে। শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতার জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য মত শক্তিশালী মেরুদন্ড এদের ছিল না। স্যার সৈয়দ আহমেদ এই প্রবাহের ব্যতিক্রম ছিলেন না। এই কারণেই তিনি ওয়াহাবীদের সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করাকেই শ্রেয় মনে করেছেন। তিনি সিপাহী বিদ্রোহ থেকে নিজের দূরত্ব প্রমাণে সচেষ্ট ছিলেন। একই কারণে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের পক্ষে ইংরেজদের দ্বারা চালিত হয়ে দ্রুত অবস্থান পাল্টানোর ঘটনাও অস্বাভাবিক ছিলনা।

## ৩.০৫ জাতি চেতনার প্রাবল্য

সৈয়দ আহমেদ প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই একমাত্র কাম্য ব্যবস্থা হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে অধঃগমন হয়েছিল তা জাতি চেতনার প্রাবল্যে স্যার সৈয়দ আহমেদ ভুলে গিয়েছিলেন। সমালোচকগণ আরও বলেছেন, সৈয়দ আহমেদের আলিগড় আন্দোলনের দ্বারা ভারতে দ্বিজাতি তত্ত্বের বীজ প্রথিত হয়েছিল এবং পরে তার অঙ্কুরোদগম হয়ে ভারত

বিভাজনের বিশাক্ত মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে হিন্দু-মুসলমানের সুসম্পর্কের অভাবে ভারতের স্বাধীনতালাভ অনেকটা বিলম্বিত হয়েছিল।

অবশ্য সৈয়দ আহমেদ ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের জ্ঞানচর্চা জগতে যে আধুনিক প্রচলন ঘটিয়েছিলেন, তার ফলে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল আলিগড় আন্দোলনে যা পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অনেক সুসন্তানকে উপহার দিয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে আহমেদ খানের দৃষ্টিভঙ্গির প্রাথমিক প্রতিফলন ঘটে ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে লেখা তাঁর "The Cause of Indian Revolt" গ্রন্থে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ছিলেন সরকারী কর্মী এবং সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধী। তিনি অন্যান্য মুসলমানদেরও ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অবিচল আস্থা রাখার অনুরোধ করেন। বিদ্রোহের কারণ হিসাবে তিনি চিহ্নিত করেন আইনী প্রক্রিয়ায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ না পাওয়াকে। আহমেদের মতে, ভারতের বিভিন্ন আইন পরিষদে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তিকরণ একান্ত জরুরী এবং সরকারী শাসনযন্ত্র ও প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পথ রুদ্ধ থাকার দরুণ জনগণ বাধ্য হয়েছে বিদ্রোহের পথে যেতে। জনগণ তাদের অভাব অভিযোগ সরকারের কাছে জানাতে পারে বিভিন্ন আইন পরিষদের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই সুযোগ না থাকায় শাসক ও শাসিতের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল এক বিরাট ফাঁক। এই ত্রুটি দূর করতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে যথাযথ যোগাযোগ গড়ে ওঠার নানা মাধ্যম গড়ে তুলতে হবে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতীয়দের সৌহার্দ্য বজায় রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে শাসন প্রক্রিয়ায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণের বেশী করে সুযোগ দেওয়া। একমাত্র এই পন্থার ওপরই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে। ব্রিটিশ শাসকবর্গের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের নিবিড় যোগাযোগের ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তার এই মনোভাব থেকেই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়ে। অন্ধকারে নিমজ্জিত ভারতীয়দের মুক্তি দিতে পারে একমাত্র গণতান্ত্রিক প্রগতিবাদী ব্রিটিশ শাসন। একমাত্র তাদের সংস্পর্শেই ভারতের উজ্জীবন ঘটবে বলে তিনি মনে করেন। রাজা রামমোহন রায়ের মতোই তিনি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের দাবি জানান। গোঁড়া মুসলমানদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি পুরোনো ইসলামি শিক্ষার পরিবর্তে আধুনিক শিক্ষার উপর জোর দেন। কারণ তার যুক্তি ছিল পুরোনো শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে অচল। এই শিক্ষা ভারতীয় মুসলমানদের পশ্চাদগামী করে রেখেছে। তাদের সরকারী পেশায় অংশগ্রহণ করতে গেলে ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক আইন সম্পর্কেও শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। তা না হলে তারা পিছিয়ে পড়বে, এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্যের স্বীকার হবে।

## ৩.০৬ আধুনিক যুক্তিবাদী ইসলামধর্ম

বস্তুত সৈয়দ আহমেদ খান ইসলাম ধর্মকে আধুনিক যুক্তিবাদ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং এই মর্মে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে সমালোচনা করে গোঁড়া মুসলমানরা মন্তব্য করেন যে আহমেদ খান বাস্তবে খ্রীস্টান ধর্মীয় আচার-আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং এর ফলে মুসলমান ধর্ম বিশ্বাসের মূলে আঘাত আসবে। কিন্তু মুসলিম জনগণের মধ্যে আধুনিক মানসিকতা গড়ে তুলতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস

ছিল যে পুরোনো ইসলামী ধর্মশাস্ত্রের আওতায় পড়ে থাকলে ভারতীয় মুসলিমদের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটবে না। বাস্তব জীবনের সত্য উদঘাটনে তারা ব্যর্থ হবে। অযৌক্তিকতার স্বীকার হয়ে তারা চরম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হবে। এইভাবে তিনি ব্রিটিশবিরোধী গোঁড়া উলেমাদের সমালোচনা করেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর্যায় পর্যন্ত উলেমাপন্থী মুসলিম নেতৃত্ব ব্রিটিশ আধিপত্যাধীন ভারতকে চিহ্নিত করে শত্রু অঞ্চল হিসাবে এবং দাবি করে যে ভারতীয় মুসলিমরা কোন অবস্থাতেই ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না। বরং প্রত্যেক মুসলিমের পবিত্র কর্তব্য হবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা। আহমেদ খান কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁর অবস্থানে অবিচল ছিলেন। ইসলামী শাস্ত্রকে পাশ্চাত্য যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা করা বা জনগণের মধ্যে যুক্তিবাদী উদারনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি একটি পত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশ করতে থাকেন। অবশ্য গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশের চরম বিরোধিতার মুখোমুখি হয়ে তিনি ১৮৭৮ সালে তাঁর পত্রিকা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

**আলিগড় আন্দোলন ঃ—** সিপাহী বিদ্রোহের পরাভবের ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে সৈয়দ আহমেদ সিদ্ধান্ত করেন ব্রিটিশ শাসনের মধ্যেই মুসলমান শ্রেণীকে উন্নত করার পথ খুঁজতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ইসলাম ধর্মের বিধিগুলিকে উন্নত করে তোলার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। উর্দু ভাষায় জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৬৩ সালে Translation Society প্রতিষ্ঠা করলেন, ১৮৭৪ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন আলিগড় মহামেডান অ্যাংলো—ওরিয়েন্টাল স্কুল। স্কুলটি ১৮৭৮ সালে কলেজে এবং ১৮৯০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত আলিগড় আন্দোলনকে সুসংগঠিত ও অগ্রসরমান করে তুলল। মুসলমান সমাজে এই আন্দোলন ছিল নবজাগরণের অগ্রদূত। ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিকশিক্ষা প্রবর্তিত হল। মুসলিম সমাজে প্রথম সংস্কার আন্দোলন দেখা দিল। বহুবিবাহ, পর্দাপ্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে আলিগড় আন্দোলন সোচ্চার হতে পেরেছিল।

আলিগড় আন্দোলনের ভিত্তি ছিল কোরানের উদারনৈতিক ব্যাখ্যা। ইসলাম ধর্মকে আধুনিক উদারনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বিত করার চেষ্টা ছিল আন্দোলনের লক্ষ্য। ভারতীয় মুসলমানদের আধুনিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়। গতিশীল সমাজের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন মুসলমান সম্প্রদায়কে সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রতি সংবেদনশীল করে তোলার ব্যাপারে আলিগড় আন্দোলন সফল হয়েছিল। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতার অধীশ্বর মুসলমান সম্প্রদায় ক্ষমতা হারিয়ে তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে যেমন আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন, আলিগড় আন্দোলন সেই আশঙ্কা দূর করতে চেষ্টা করেছিল।

দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত আলিগড় আন্দোলনের মূলনীতি ছিল চারটি —

১) স্বাতন্ত্র্যতা ঃ— ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরস্পরবিরোধী স্বার্থ রয়েছে।

২) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ঃ— প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে উচ্চ সরকারী পদে কর্মচারী নিয়োগের নীতি মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী। কারণ, তারা পশ্চাৎপদ এবং এই নীতির ফলে তারা হিন্দুদের প্রাধান্যের স্বীকার হবে, যা ব্রিটিশ শাসন থেকেও খারাপ।

৩) ব্রিটিশ প্রাধান্য মুসলিমরা মানবে ঃ— মুসলমানরা ব্রিটিশ প্রাধান্য স্বীকার করে নেবে। কারণ এতেই তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। এই কারণে তারা রাজনীতি থকে দূরে থাকবে।

৪) হিন্দু প্রাধান্যের বিরোধিতা ঃ— হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপনের কু-মতলব দূর করার জন্য যতটুকু রাজনীতি করা দরকার তার বেশী রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে মুসলমানরা অংশ নেবে না।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কলেজের অধ্যক্ষ থিয়োডোর বেক-এর সহযোগিতায় সৈয়দ আহমেদ ১৮৮৮ সালে 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন করেন। ১৮৯৩ সালে স্থাপিত হয় 'মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ আপার ইন্ডিয়া'। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল —

১। ভারতীয় মুসলমানদের মতামত ব্রিটিশ সরকারের কাছে তুলে ধরা ও তাদের রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ করা।

২। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক বিক্ষোভ আন্দোলন প্রতিহত করা।

৩। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য শক্তিশালী করা।

৪। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশদের সম্পর্কে যে বিরূপ ধারণা জন্মেছিল তার ভিত্তি ছিল এই যে ব্রিটিশরা মুসলমানদের সভ্যতাকে ধ্বংস করতে পারে। আলিগড় আন্দোলন এই অনিশ্চিত ও অবিশ্বাসের মনোভাবকে পরিবর্তন করতে সফল হয়েছিল।

৫। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল নীতি ছিল সমাজে বিভেদ করা এবং শাসন করা (Divide and Rule)। এই নীতির অনুসরণে ভারতের জনগোষ্ঠীর মূল দুটি অংশ হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের প্রতি ব্রিটিশ এবং ব্রিটিশ শাসন কখনো অনুগ্রহ ও তোষণ, এবং কখনো দূরত্ব ও বঞ্চনার নীতি অনুসরণ করেছিল। ভারতীয় মুসলমানদের ক্ষেত্রে বঞ্চনা ও দূরত্বের নীতি ব্রিটিশ শাসকের প্রাথমিক পর্বে গৃহীত হয়েছিল। ভারতীয় মুসলিম জনগোষ্ঠী ব্রিটিশদের প্রতি প্রশাসনিক ও বঞ্চনার বিরাগ হেতু নিজেদেরকে আধুনিক যুগের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়েছিল। সৈয়দ আহমেদ খান মুসলিম সমাজের মধ্যে অগ্রগণ্য পুরুষ হিসাবে প্রথম অনুধাবন করেন যে, মুসলিম সমাজের উন্নতি তথা শাসনব্যবস্থায় মুসলিমদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের জন্য তিনি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভিত্তিতে আধুনিক করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় মুসলিম জনমানসে সৈয়দ আহমেদ খান ছিলেন, রামমোহনের মতোই, রেনেসাঁসের প্রবর্তক।

## ৩.০৭ ধর্ম ও রাজনীতি

আধুনিকতার রূপায়নে সৈয়দ আহমেদ খানের প্রধান অবদান হলো পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে মুসলিম সমাজের গোঁড়ামির অন্ধকার দূর করা। ১৮৬৪ সালে গাজীপুরে তিনি যে "অনুবাদ সমিতি" তৈরী করেছিলেন, তার মূল কাজ ছিল "বিজ্ঞান সমিতি" রূপে কাজ করা। বিজ্ঞান-নির্ভর ইংরাজী বইগুলির উর্দু অনুবাদের মাধ্যমে তিনি মুসলিম জনসমাজে বিজ্ঞান চেতনা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন এইভাবে যুক্তিবাদী চিন্তন-চেতনার প্রসারণের মাধ্যমে মুসলিম জনসমাজের মনের অন্ধকার যেমন কাটবে, তেমনি ব্রিটিশ প্রশাসনেও তারা বেশী সংখ্যায় যোগদান করতে পারবে ও সরকারী প্রশাসনে হিন্দু প্রাধান্য রুখতে পারবে।

সামাজিক সংস্কারের প্রয়াসে "তহ্জিবুল "(দি সোস্যাল রিফর্মার) নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ নেন, মুসলিম শিক্ষা কনফারেন্স শুরু করেন। সরাসরি হিন্দুধর্মের বা হিন্দু সমাজের বিরোধিতা না করে, তিনি মুসলিম সমাজে আলোকদীপ্তি ঘটিয়ে তাদের হিন্দুদের প্রতিস্পর্ধী করে তুললেন। মুসলিম সমাজের আর্থিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাদপরতার কারণ হিসাবে ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামিকে তিনি দায়ী করেছেন। কোরান কে তিনি যুক্তিবাদী দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে চেয়েছেন। আর এই প্রয়াসই তাঁকে তাঁর স্বধর্মীদের কাছে সমালোচনার পাত্র করে তুলেছিল। কিন্তু তিনি এতে বিন্দুমাত্র দমে না গিয়ে মুসলিমদের জন্য সামাজিক সংস্কার, এবং উদারনৈতিক ও বিজ্ঞাননির্ভর শিক্ষা সংস্কারের উপর গুরুত্ব দিতে থাকলেন, তিনি বাইবেলের উর্দু অনুবাদ করলেন, কোরানের নির্দেশাবলীর উদারনৈতিক ব্যাখ্যা দিতে থাকলেন এবং মুসলিম গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। "সোস্যাল রিফর্মার" পত্রিকায় তিনি যে ধরণের সংস্কারের কথা বলেছেন সেগুলি হ'লো — (ক) দাসত্ব অ-ইসলামিক এবং কোরান-বিরুদ্ধ; (খ) মুসলিম সমাজে বহুবিবাহ তখনই স্বীকৃত হবে, যখন স্বামী তারা সব স্ত্রীর প্রতি সমান ন্যায় করতে সক্ষম হবেন; (গ) কোরানে সুদের ব্যবসা নিষিদ্ধ বলা আছে; (ঘ) মুসলিম জনগণ অ-মুসলিম সমাজের পোশাক-আশাক ও খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে; (ঙ) কোরানে যা নির্দিষ্ট নেই, সেই ব্যাপারে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারবে; (চ) কোরানে উল্লেখ থাকলেও কোনো অযৌক্তিক রীতি-নির্দেশ পালন করার প্রয়োজন নেই। এই সব মতামতের জন্য তাঁর স্বধর্মাবলম্বী লোকেরা তাঁকে নাস্তিক বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

সৈয়দ আহ্মেদ খান ভারতে একধরনের গণতান্ত্রিক-রাজনৈতিক সংস্কৃতির বাতাবরণ তৈরী করতে চেয়েছিলেন এবং এই কারণেই তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সংস্পর্শে আসতে চাননি। তাঁর মতে জাতীয় কংগ্রেস ছিল ব্রিটিশ-মদতপুষ্ট হিন্দু সম্ভ্রান্ত-এলিটদের সম্মিলন। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ঘোষ, প্রমুখেরাও জাতীয় কংগ্রেসের এই চরিত্রকে গ্রহণ করেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে এসে সৈয়দ আহমেদ খান প্রকৃত উদারবাদী ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে ধর্ম থেকে রাজনীতিকে পৃথক করতে চেয়েছিলেন। রাজনীতি চর্চায় ও অভ্যাসে তিনি ধর্মের প্রভাব ও অনুপ্রবেশকে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। একইভাবে তিনি চেয়েছিলেন কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আবেগ ও আচরণকে সরকারও নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করতে পারবে না। কারণ এতে সমাজের শান্তি ও শৃংখলা বিঘ্নিত হবে।

১৯৭০ সালে অধ্যাপক মইন সাকির তাঁর বিখ্যাত "খিলাফৎ থেকে পাকিস্তান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে অধ্যাপক উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই ভারতে রাজনীতির ইসলামীকরণ ঘটতে শুরু করেছে। যদিও এই বিষয়টি বিতর্কের যে, সৈয়দ আহমেদ খান, না, পরবর্তী মুসলিম রাজনীতি-কে বা কারা ভারতীয় রাজনীতির তমসালিপ্ত সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগির জন্য দায়ী। তবুও এটা স্বীকার করতেই হবে, হয়তো বা সৈয়দ আহ্মেদ খানের ধর্ম-রাজনীতির সংশ্লেষের এক নেতিবাচক প্রভাবই পূর্বে উল্লিখিত ভারতীয় রাজনীতির এই ক্ষতের ক্ষত এর অন্যতম এক কারণ।

## ৩.০৮ উপসংহার

সৈয়দ আহ্মেদ খানের সবথেকে বড় অবদান হলো ইসলাম ধর্ম এবং কোরানের তিনি এক যুক্তিনির্ভর উদারবাদী

ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি মনে করতেন ধর্মীয় নির্দেশ কে যুক্তি এবং সমাজের উপযোগী হিসাবে বিচার করা উচিৎ। সৈয়দ আহমেদ খান বলতেন যে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই এক জল-মাটি-বাতাসে বেড়ে উঠেছে, তাই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অসমতা দূর করে এক অভিন্ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার, আর এই জন্যই তিনি ব্রিটিশ শাসকদের অনুগ্রহ চেয়েছেন। মহম্মদ আলি তাকে "অনুগতদের মধ্যে অনুগত" (লয়ালিস্ট এমং দি লয়ালিস্টস্) বলেছেন; তার কাজের সমালোচনাও করা হয়। তবে এটা মানতেই হবে — (ক) পশ্চিমী ধাঁচের উদারনৈতিক শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে; (খ) ব্রিটিশ প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং (গ) রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন থেকে তিনি তাঁর সমসাময়িক মুসলিম জনসমাজে এমন এক বাতাবরণ তৈরী করেছিলেন, যার প্রভাবেই পরবর্তী সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম নবজাগরণ ঘটেছিল।

## ৩.০৯ সহায়ক পাঠ


১। ভি. পি. ভার্মা — মডার্ন ইন্ডিয়ান পোলিটিকাল থট্।

২। আর. এম. গান্ধী — আন্ডারস্টাডিং মুসলিম মাইন্ড।

৩। সত্যব্রত চক্রবর্ত্তী— ভারতবর্ষ : রাষ্ট্রভাবনা

৪। অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পা— ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয় (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ)


## ৩.১০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

**দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্ন**

১। সামাজিক সংস্কার বিষয়ে সৈয়দ আহমেদ খানের আধুনিক ভাবনার পরিচয় দিন।

২। সৈয়দ আহমেদ খানকে "মুসলিম আধুনিকীকরণের জনক" বলা হয় কেন ব্যাখ্যা করুন।

৩। ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে সৈয়দ আহমেদ খানের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করুন।

৪। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে সৈয়দ আহ্মেদ খানের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।

৫। "আলিগড় আন্দোলন" বিষয়ে একটি রচনা লিখুন।

**সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্ন —**

১। সৈয়দ আহমেদ খানের সমসাময়িক মুসলিম সমাজ সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র রচনা লিখুন।

২। ঔপনিবেশকতা বিষয়ে সৈয়দ আহমেদ খানের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন।

৩। প্রচলিত ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সৈয়দ আহমেদ খানের ধারণা কী ছিল?

৪। সৈয়দ আহমেদ খানের রাষ্ট্রতত্ত্ব-এর ধারণা কী?

৫। 'সোশ্যাল রিফর্মার' পত্রিকায় সৈয়দ আহমেদ খান কোন্ কোন্ সংস্কারের কথা বলেছেন?

# একক - ৪ ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১)

গঠন


৪.০১ ভূমিকা

৪.০২ জীবন ও সময়

৪.০৩ ব্যক্তি অধিকার ও উদারনীতিবাদী ধারণা

৪.০৪ সমাজ ও রাষ্ট্র

৪.০৫ শ্রমিক ও সমবায়

৪.০৬ জাতি ও জাতীয়তাবাদ

৪.০৭ সামাজিক ন্যায়

৪.০৮ মানুষের ধর্ম

৪.০৯ পরিবেশবাদ

৪.১০ উপসংহার

৪.১১ সহায়ক পাঠ


## উদ্দেশ্য :

আলোচ্য এককে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সমাজ ভাবনা এবং রাষ্ট্র বিষয়ক অবস্থান প্রসঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে আলোকপাত করা হয়েছে। মূলত এই এককটি পাঠের ফলে জানা যাবে ঃ

- সমকালীন বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে ঠাকুর পরিবার এবং বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্যক পরিচিতি।
- রবীন্দ্রভাবনায় সমাজের স্বাতন্ত্র্য, তার সজীবতা ও সৃজনশীলতার পাশাপাশি রাষ্ট্রের আধিপত্য, তার যান্ত্রিকতা এবং সীমাবদ্ধতার লক্ষণীয় বৈপরীত্য।
- সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে শ্রমের মর্যাদা, সমবায়ের উপযোগিতা এবং গ্রামীণ উন্নয়নের গুরুত্ব এবং সর্বোপরি
- মানবতার পূজারী রবীন্দ্রদৃষ্টিতে ধর্মের সর্বজনীন রূপটির এক বিশদ ভাষ্য।

## ৪.০১ ভূমিকা

আধুনিক ভারতের উদারনৈতিক মেধা এবং সংস্কৃতির এক যথার্থ সম্মিলন হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সর্বজনের কাছে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুমুখী প্রতিভা এবং সৃজনশীলতা দিয়ে ভারতবর্ষের সামাজিক, সংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সমস্ত দিকেই প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে (১৮৯১-১৯৪১) এক আধুনিক মননের পরিচয় বহন করেছেন। সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ধারক হিসেবে তিনি সাহিত্য, কবিতা, গান, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক এবং রাষ্ট্রসমাজ ও মানবসভ্যতা নিয়ে যে বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করেছেন তা এক সার্বজনীন প্রেম এবং ভাতৃত্ববোধের ধারক হিসেবে মানবতার কণ্ঠস্বরকেই চিহ্নিত করেছে। তাঁর আশি (৮০) বছরের জীবনকালের প্রথমভাগ কেটেছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে, পরবর্তী ভাগ কেটেছে বিংশ শতাব্দীতে, সামাজিক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক প্রতিরোধের মুখে যখনই কোনো বিরাট সমস্যার মুখোমুখি সমাজ এসে দাঁড়িয়েছে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন ভাবে সেই সংকটের মোকাবিলায় এগিয়ে এসেছেন। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার অসংগঠিত রূপ, উন্নয়নের অভাব, সমাজ এবং রাজনৈতিক স্তরে হিংসা ও অসমতা, অর্থনৈতিক অনুন্নতি, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ, নারীত্বের অবমাননা, প্রান্তিক মানুষের বঞ্চনা, মানবাধিকার, পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা, সর্বোপরি সভ্যতার সংকট সববিষয়েই তিনি শুধু দৃষ্টিপাত করেননি, নিজের ভাবনা ও ধারণার উপযুক্ত রূপায়ণ ঘটাতে চেয়েছেন। সংক্ষেপে বলা যায় ভারতীয় নবজাগরণে রবীন্দ্রনাথই হলেন শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং রামমোহন, বিদ্যাসাগরের সার্থক উত্তরসূরী।

## ৪.০২ জীবন ও সময়

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন কলকাতার এক অভিজাত পরিবারে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ (ইংরেজি মতে ৭ই মে, ১৮৬১ মঙ্গলবার), তিনি পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদাদেবীর চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র। তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর কেবল এক প্রতিপত্তিশালী ও পরাক্রান্ত জমিদারই ছিলেন না, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার-ঠাকুর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম শিল্পোদ্যোগীদের একজন।

রবীন্দ্রনাথের উপর এই পরিবারের প্রভাব কত বড় করে পড়েছিল তা আমরা জানি তাঁর জীবনীকারদের থেকে তো বটেই, তাঁর নিজের কথা থেকেও। বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বাল্যকালেই বর্জন করা সত্ত্বেও এই পরিবারের সারস্বত পরিবেশেই তাঁর সর্বাঙ্গীণ শিক্ষালাভ ঘটেছিল। উপরন্তু এখান থেকেই তিনি লাভ করেছিলেন এক উদার মানবিকতাবাদী ধর্মবোধ, স্বজাত্যবোধ ও ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের চেতনা এবং ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ। বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধার মধ্যে স্বদেশিকতার ও আত্মমর্যাদার যে বীজ লুকিয়ে আছে তাও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রথম উপ্ত হয়েছিল এই পরিবারেই।

কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তিনি বাংলা ভাষার প্রতি প্রীতি ও আকর্ষণের উৎস হিসাবে উল্লেখ করেছেন পারিবারিক প্রভাবকে, ধর্মীয় অনুভববিশিষ্ট, অথচ প্রথাসিদ্ধ নিয়মাচারের বন্ধন থেকে যুক্ত পরিবারে

জন্মগ্রহণ করার সূত্রে রবীন্দ্রনাথের অনেকদিক থেকে সুবিধা হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় মূল্যবোধ ও জীবনচর্যাকে স্বীকার করে নেওয়ার ব্যাপারে তাঁকে এতটুকুও মানসিক টানাপোড়েন সহ্য করতে হয়নি। আবার তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের সূত্রেই মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয় হয় এবং মুঘল আমলের সমন্বিত সংস্কৃতির রস আহরণ করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়। উপরন্তু অন্যান্য সমকালীন ব্রাহ্মণ জমিদারদের অসদৃশভাবে এই পারিবারিক প্রেক্ষাপটই তাঁকে আধুনিক বিশ্বের নিত্যনতুন ঘটনাপ্রবাহের প্রতি উন্মোচিত রাখে, কারণ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় ঐতিহ্যকে লালনের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবার পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জকেও স্বাগত জানিয়েছিল এবং উভয়ের সংশ্লেষণে ব্রতী হয়েছিল।

তাঁর স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রভৃতি রাজনৈতিক চিন্তার এই দিকগুলি আলোচনার সঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়া উচিত, এগুলি হল রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক, মানবধর্ম, পরিবেশবাদ এবং সমাজ, অর্থনীতি, শ্রমিক ও সমবায়নীতি এবং জাতীয়তাবাদ, এগুলির মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সমগ্রতাকে একটি সর্বজনীন ধারণার মধ্যে ধরা যাবে।

## ৪.০৩ ব্যক্তি অধিকার ও উদারনীতিবাদী ধারণা

রামমোহনের যথার্থ উত্তরপুরুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তার পরিবেশেই গড়ে উঠেছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি মানুষের অন্তর্লীন দুঃখ ও অন্তর্নিহিত স্বাধীনতাবোধের প্রেরণায় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন তাঁর জন্ম তিনটি আন্দোলনের উপযুক্ত সঙ্গমে। এর একটি হল রামমোহন রায় প্রবর্তিত ধর্মীয় তথা ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন, দ্বিতীয়টি হল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত সাহিত্য আন্দোলন এবং তৃতীয়টি হল উদারপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন। এই তিনটি আন্দোলনের পরিবেশগত প্রভাবে অল্পবয়সেই রবীন্দ্রনাথের অন্তরে স্বাধীনতার মূল্যবোধ গ্রথিত হয়েছিল। যুক্তিবাদী মননশীলতার কারণেই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫-১৯০৮) সহিংস পন্থাকে অস্বীকার করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই অন্তর্মুখী মনের তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি হল তাঁর ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি ভালোবাসা, দ্বিতীয়টি হল তাঁর সামাজিক মুক্তির প্রতি সমর্থন আর তৃতীয়টি হল তাঁর আত্মস্ফুরণের এবং আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠার প্রতি আসক্তি। তাঁর সমগ্র জীবন ধরে তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। স্কুল জীবন থেকেই তিনি শিক্ষাব্যবস্থার রুটিনমাফিক সরসতাহীন এবং সামাজিক প্রথার স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। পরিণত জীবনে তিনি জাতপাত প্রথার বিরুদ্ধে ব্যক্তির মুক্তির শর্তকেই স্বীকার করেছেন। ইংরেজ উদারবাদী নেতা গ্ল্যাডস্টোন এবং জন ব্রাইটের ভাবনা দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন। 'দুর্ভাগা দেশ' কবিতায় এবং 'চোখের বালি', 'ঘরে বাইরে', 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে, 'তাসের দেশ', 'অচলায়তন', কালের যাত্রা' প্রভৃতি নাটকে এবং 'ছিন্নপত্রাবলী' রচনাতে তিনি এর সপক্ষে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন। 'প্রশ্ন', 'শিবাজী' প্রভৃতি কবিতায়, 'রক্তকরবী' নাটকে এবং 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির' প্রভৃতি কবিতা রচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর স্বাধীনতার প্রতি স্পৃহা এবং বন্ধনমুক্তির আর্তি উপলব্ধি করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের মন সমস্ত ধরনের সংকীর্ণতা, জড়তা, সংস্কার, অর্থহীন ধর্মীয় আচরণ এবং ভয় থেকে মুক্ত

ছিল। তাঁর আধুনিক জীবনদৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কবিতায় এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর,
আপন প্রাঙ্গন তলে দিবসশর্বরী বসুধারে
রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। যেথা বাক্য
হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উচ্ছসিয়া উঠে
যেথা নিবারিত স্রোতে দেশে দেশে
দিশে দিশে কর্মধারা ধায়, অজস্র সহস্রবিধ
চরিতার্থতায়। যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষের করেনি শতধা। নিত্য যেথা তুমি
সর্বকর্মচিন্তা আনন্দের নেতা, নিজহস্তে
নির্দয় আঘাত করি পিতঃ, ভারতেরে সেই
স্বর্গে কর জাগরিত।।

তাঁর 'ন্যাশান্যালিজম' সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলিতে (১৯১৬) রবীন্দ্রনাথ জাপানের উদগ্র জাতীয়তাবাদ এবং পশ্চিমী শক্তির সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেছেন। যুক্তি এবং তাত্ত্বিক বিচারে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, পুঁজিবাদী ধনিক শ্রেণীর দুর্বল জাতিকে শোষন করার মানসিকতা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তিনি বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে, যুক্তির নিক্তিতে, নৈতিক বিচারে সাম্রাজ্যবাদ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদকে একই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ধিক্কার জানিয়েছেন। তিনি যেমন পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকতাবিরোধী ছিলেন, তেমনি আবার পাশ্চাত্যের স্বাধীনতার মূল্যবোধ, পৌর অধিকার, বাক্‌স্বাধীনতা, বিবেক এবং সংস্কৃতির মুক্ত প্রকাশের পক্ষপাতী ছিলেন।

## ৪.০৪ সমাজ ও রাষ্ট্র

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধে সমাজ এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সমাজজীবন সম্পর্কে ও সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্রতা বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪) প্রবন্ধে তাঁর ধারণা তিনি প্রকাশ করেন। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য সর্বত্রই একটি দেশের মহাসমগ্রতার প্রতীক হল রাষ্ট্র এবং তৎসংক্রান্ত নীতিই হল পলিটিক্স বা রাষ্ট্রনীতি। তাহলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতি এবং সমাজ ও সমাজনীতির ভূমিকাগত পার্থক্যটা কোথায় ও কতখানি? 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সেই পার্থক্য নির্দেশ করে বলেছেন, বিলাতের 'স্টেট-এর সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত দেশের সমস্ত কল্যাণকার্যের ভার স্টেটে-এর হাতে সমর্পণ করিয়াছে—ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।...আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসম্পন্ন এবং প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্তব্য দ্বারা আবদ্ধ।...বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমগ্র দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এইজন্যই

য়ুরোপে 'পলিটিক্স' এত গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সমনে সংকট দেখা যায়। এই জন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি।

ভারতবর্ষে কর সংগ্রহ, রাজ্য রক্ষা ও যুক্তবিগ্রহ এবং প্রধানত নাগরিক বিচারকার্য—এসবের বাইরে রাষ্ট্রের বিশেষ কাজ ছিল না। 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''অন্য দেশ যেমন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে নানা প্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। আমরা যে হাজার বছরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে।'' এই জোরের জায়গাটা হল, সমাজ চলেছে এক 'সংযত সুশৃঙ্খল কর্তব্যনির্বাণ' অনুযায়ী। ''সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্যরূপে বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে, ফলে ভারতীয় এই ব্যবস্থায় 'সমাজ অত্যন্ত সহজ নিয়মে আপনার সমস্ত অভাব আপনিই মিটাইয়া লইত', 'পল্লীসমাজই খন্ডখন্ড ভাবে আপনার কাজ সম্পন্ন করিয়াছে, এবং এজন্য সমাজ বাইরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই।'

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের ধারণার থেকে তিনি ভারতীয় সমাজের ধারণাকে পৃথকভাবে লক্ষ্য করেন। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় প্রেক্ষাপটে রাজা বা রাষ্ট্র মূলত প্রতিরক্ষা এবং প্রজার প্রতি ন্যায়বিচারের দায়িত্ব পালন করেন। অন্যান্য কাজ যেমন শিক্ষা, কৃষি, সামাজিক কল্যাণ প্রভৃতির দায়িত্ব থাকে সমাজের ওপরে। শাসকের পরিবর্তন সমাজের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে নি। ব্রিটিশ শাসন ভারতে পাশ্চাত্য ধারণাটি চাপিয়ে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 'মেলা' (স্বদেশী স্বতঃস্ফূর্ত জমায়েত) সংগঠনের প্রতি জোর দিয়েছিলেন এই কারণে যে, এই মেলার পরিসরেই মানুষে মানুষে মিলন, সম্পর্ক স্থাপিত হবে যেখানে দেশের মানুষসম্প্রদায় নির্বিশেষে নিজেদের ভাবনার আদান প্রদান করতে পারবে এবং রাষ্ট্র বা সরকারের কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই এই মেলামেশা গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এবং শিক্ষিত নাগরিকের মধ্যেও একধরনের সমন্বয় গড়ে তুলতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের চাহিদার পরিপূরণ ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ সমাজের হাতেই ক্ষমতার গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। বিদেশী শাসকের তুলনায় তিনি একটি স্বদেশী রাষ্ট্র চেয়েছেন যা সম্পূর্ণতই রাষ্ট্রের তুলনায় সমাজের উপর গুরুত্ব অর্পণ করবে। জীবনের একটি পর্যায়ে প্রাচীন ভারতের সমস্ত কিছুই রবীন্দ্রনাথের কাছে মহান ও রমণীয় হয়ে উঠেছিল। 'প্রাচীনকালে যে সজীব সচেষ্ট তেজস্বী হিন্দুসভ্যতা ছিল' তার সঙ্গে ঐক্যবোধ থেকে রবীন্দ্রনাথ ১৯০৩ সালে এমন ঘোষণাও করেছেন যে, ''আমাদের বৃদ্ধ পিতামহের পদাঙ্ক চিহ্নিত সেই প্রাচীন প্রশান্ত সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না করি, তবে কোনোমতেই আমরা ব্যর্থ হইব না।'' প্রাচীন এই ব্যবস্থা সম্পর্কে মাঝে মাঝেই তিনি কিছুটা মোহ ও কিছুচা নস্ট্যালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন সত্য, কিন্তু একই সঙ্গে বিপরীত দিকটাও তার পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে এবং বর্ণনাক্রমে বিপরীতটাই তাঁর দৃষ্টিতে সত্য হয়ে ওঠে। তাঁর মনে হয় একদা যে সমাজস্থিতি ছিল গৌরবের, ''সেই গৌরব হারাইয়া আমরা...আপনার সমস্ত পুঁটলিপাঁটলা লইয়া ভীত চিত্তে এক কোণে বসিয়া আছি। ভারতবর্ষের সামাজিক নিশ্চলতার কারণ যে জাতিধর্ম বিভাজন, তা রবীন্দ্রনাথকে বরাবরই গভীরভাবে পীড়িত করেছে। অচলায়তন,

রবীন্দ্র নাটকে যার স্বরূপ উন্মোচিত। "এখানে নীতি আপনিই রীতিকে বরণ করিয়া চলে, আচারের পক্ষে বিচারের কোনো প্রয়োজনই হয় না। আমাদের কিছুই জানাইবার দরকার নাই, কেবল মানিয়া চলিলেই চলে।" তাই খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখা-ঝাপটানো সম্ভব সেইটুকুই বিধি। তাহাই ধর্ম, আর তাহার বাহিরে অনন্ত আকাশভরা নিষেধ।" যে মানুষ কর্তা, যে সৃষ্টি করে, তার মনকে মেরে কেবলই মেনে চলার ফরমান। মার্কসের ভাষারই যেন প্রতিধ্বনি শোনা যায় যখন রবীন্দ্রনাথ বলেন, "পাণ্ডা, পুরোহিত, বা স্মৃতিরত্ন বা শীতলা-মনসা-ওলাবিবি, দক্ষিণরায় শনি-মঙ্গল-রাহু-কেতুর কাছে এ যেন নতজানু মানুষের আত্মনিবেদন।"

ভারতবর্ষীয় সমাজস্থিতির কোনো অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেননি, বরং এই স্থিতির ভিত্তি হিসাবে 'সর্বজনস্বীকৃতির' কথাই উল্লেখ করেছেন। 'প্রাচ্য সমাজ' প্রবন্ধে তিনি অনেকটা স্পষ্ট করেই বলেছেন, '...আমাদের এশিয়ার সভ্যতার মধ্যে সেই প্রাণক্রিয়ার শক্তি নাই যাহার দ্বারা সমাজ বাড়িয়া উঠে, যাহার অবিশ্রান্ত গতিতে সমাজ পুরাতন ত্যাগ ও নূতন গ্রহণ করিয়া প্রতিনিয়তই আপনাকে সংস্কৃত করিয়া অগ্রসর হইতে পারে। সংকীর্ণ সম্পূর্ণতার মধ্যে চিরদিন বদ্ধ হইয়া থাকা স্বাস্থ্যকর নহে। এক্ষণে আমাদের প্রাদেশিক বিচ্ছেদগুলি ভাঙিয়া ফেলিবার সময় হইয়াছে। কিন্তু ভিতর থেকে ভাঙতে পারে এমন শক্তি ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতীয় সমাজের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়নি। তাই য়ুরোপের মহাক্ষেত্রে মানবশক্তি প্রাণের প্রাবল্যে, বিজ্ঞানের কৌতূহলে, পণ্যসংগ্রহের আকাঙ্ক্ষায় যখন বিশ্বাভিমুখী হইয়া বাহির হইল, তখন তাহারও একটি বৃহৎ প্রবল ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়াই বিধাতার আহ্বান বহন করিয়া আমাদিগকে আঘাতের দ্বারা জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে।

জীবনের শেষ পর্বে অবশ্য পশ্চিমি সভ্যতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আজন্মলালিত মোহ এবং ইউরোপের 'চিত্তদূতরূপে' ইংরেজের কাছে প্রত্যাশা ভেঙে যাচ্ছিল অতি দ্রুত। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারিত হল য়ুরোপ সম্পর্ক তাঁর প্রত্যাশার মৃত্যু ঘোষণা: "জীবনের প্রথম আরম্ভে সমগ্র মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণবার্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্রলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে। মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই।

## ৪.০৫ শ্রমিক ও সমবায়

ধনিক সভ্যতার সংকট, জাতীয়তাবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের নিদারুণ ক্রমিক উপলব্ধি এবং অপরাজিত, অপরাজেয় মনুষ্যত্বে নিঃসংশয় বিশ্বস করে জীবনের শেষ দেড় দশকে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ তাঁর অন্তরের গভীরতর যোগ অনুভব করতে থাকেন শ্রমজীবি মানুষের সঙ্গে। এইসময় তাঁর সাহিত্য কৃতির পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ সামাজিক অর্থনীতির বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে যে নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন তা অদ্ভুতভাবে মার্কসবাদী বিশ্লেষণের কাছাকাছি এসেছে। যদিও সমাধান নির্ণয়ে তিনি ভিন্নতর এক ভাববাদী অবস্থান গ্রহণ করেছেন, তথাপি রবীন্দ্রচেতনার এই প্রগতিশীল অভিমুখটি বিশেষ উল্লেখের অবকাশ রাখে।

১৯২৬-এ এসে রবীন্দ্রনাথ ঘোষনা করলেন, "আবার গ্রামে ফিরিতে হইবে; যেখানে গিয়া দারিদ্র, অজ্ঞতা এবং ব্যাধির বিরুদ্ধে বীরোচিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।" এই বীরোচিত সংগ্রামের প্রকরণ এবার সমবায়, একের পর এক সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে তিনি গ্রামবাসীর আপন শক্তিকে সম্পদে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। জমিদারের নেতৃত্বেই প্রজার মঙ্গলসাধন সম্ভব এই বদ্ধমূল ধারণা থেকে তখনও তিনি মুক্ত হতে পারছেন না। ১৯২৬ সালে এসেও প্রজাস্বত্ব নিয়ে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে বিতর্কে তিনি প্রজাস্বত্বের প্রবল বিরোধিতা করে বলেন, প্রজাস্বত্বকে আইনি প্রতিষ্ঠা দিলেই সমাজের বা গ্রামীণ অবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়, কেননা এর ফলে "দেখতে দেখতে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশটা ছোট জমিদার গজিয়ে উঠবে।" তাঁর মতে, রায়ত-খাদক রায়তের ক্ষুধা হল সর্বনেশে। "জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারসাইট, পরাশ্রিত জীব"—একথা জেনেও, জমি আঁকড়ে থাকার প্রবৃত্তি থেকে নয়, একজন প্রজাহিতৈষী জমিদার হিসেবে এদের হাতে প্রজাদের ছেড়ে দিতে তিনি রাজি নন: "আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আশমানদারি।"

## ৪.০৬ জাতি ও জাতীয়তাবাদ

'ন্যাশান্যালিজম্' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি বলেছেন যে জাতীয়তাবাদ মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর মনুষ্যত্বকে অবরুদ্ধ করে। কাল্পনিক এক সমষ্টির কাছে ব্যক্তিকে বলি দিয়ে মানুষের সৃজনশীল সত্তার বিকাশকে ব্যাহত করে। 'নেশন'-এর দাপটে ব্যক্তি যে শুধু যন্ত্রে পরিণত হয় তাই নয়। তার গতি ও প্রকৃতি নিরঙ্কুশ শক্তিমত্ততা ও ভীতির উপর অবস্থান করে। সেজন্য তিনি বলেন মানবতার প্রয়োজনে আজ আমাদের শক্ত সোজা দেহে সরব হতে হবে এই বলে যে জাতীয়তা এক নির্মাণ মহামারী; তার পাপপঙ্কিল সংক্রামক ব্যাধি আজ মানবসমাজে ঘুম ধরিয়ে মানুষের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে তুলেছে।

জাতীয়তাবাদ তাঁর মতে পশ্চিমের আবিষ্কার। ভারতের নাড়ির সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। তাই একে তিনি 'নেশনতন্ত্র' বলে বারবার অভিহিত করেছেন। তবে পাশ্চাত্য ধারণা বলেই তা পরিত্যাজ্য এমন অগ্রহনেচ্ছু উগ্র প্রাচ্যগরিমা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের ছিল না। তাঁর আপত্তি, এই তত্ত্ব পশ্চিমের স্পিরিট বা সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত নয়—তাঁর উদ্ভব পশ্চিমি সভ্যতা বা সিভিলাইজেশন থেকে। রবীন্দ্রনাথের বিচারে সংস্কৃতি সৃষ্টিধর্মী, আত্মার উদ্‌বোধক, আর সভ্যতা হল নির্মাণমূলক, বহিরঙ্গগত, যান্ত্রিক এক ব্যবস্থাতন্ত্র। সভ্যতার অবদান বলে 'নেশন' হল যান্ত্রিক ব্যবস্থা—বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি সর্বস্ব এক সমাজ—যা শুধুমাত্র বস্তুজগতের বিশালত্বে মুগ্ধ। যার মধ্যে দেহের প্রাসাদে যে বিশালত্ব বা স্থূলত্ব তা পরিদৃশ্যমান। সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে পার্থক্য নির্ধারণ করেছিলেন, তা ম্যাথু আর্নলগু-এর মতো কবি বা ম্যাক্‌আইভারের মতো সমাজতত্ত্ববিদের মতানুসারী হলেও আধুনিক সমাজতত্ত্ব অবশ্য সাধারণভাবে গ্রহণ করবে না। সেখানে সামাজিক মানুষের মননজাত ও বস্তুগত সমগ্র সৃষ্টিই তার সংস্কৃতির অঙ্গীভূত, আর সভ্যতা হল তার বিবর্তনের এক সুনির্দিষ্ট কালিক স্তর।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ নৈর্ব্যক্তিক। নিরবয়ব এক সমষ্টিতত্ত্ব। অপরদিকে ব্যক্তি হল প্রকৃষ্টভাবে মূর্ত এক সত্তা। যা সমষ্টির মধ্যে কখনও নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে না। জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে সেইটিই ঘটেছে। এখানে ব্যক্তি সমষ্টির কাছে অপমানিত, তার আত্মা নিস্পৃষ্ট। তাঁর মতে, ব্যক্তির অন্তসত্তার

দুটি রূপ—একটি তার 'ইন্ডিভিডুয়ালিটি' এবং অপরটি তার 'পার্সোনালিটি'। ইন্ডিভিজুয়াল হিসাবে ব্যক্তি আপন স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থবোধে উদ্বুদ্ধ, বস্তুজগতের প্রভু হবার জন্য ব্যস্ত, সার্বিক প্রতিযোগিতা মূলক নীতির অনুসারক এবং স্বার্থান্ধ সংগ্রহবাদ তথা গৃধ্নুতা দ্বারা তাড়িত। আর পার্সোনালিটি হল মানুষের মহত্তর প্রকৃতি। আত্মার বিকাশ, আত্মবোধ ও বিশ্ববোধের সংশ্লেষ—তা জগৎপ্রীতি, জগৎ ও জগৎ পরিব্যাপ্ত আত্মার মধ্যে আপনার সন্ধান এবং ত্যাগের মাধ্যমে আপনার সার্থকতার অভিলাষী, রবীন্দ্রনাথের বিচারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ হল ধনতন্ত্রের দর্শন এবং বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার লক্ষণ—যা কিনা দানা বেঁধে 'নেশনতন্ত্র' বা জাতীয়তাবাদের দানবমূর্তি পরিগ্রহ করেছে। তাই জাতীয়তাবাদ হল যথার্থ ব্যক্তিত্বের বিকাশবিরোধী। তার কাছে ব্যক্তিবিশেষের কোনো মূল্য নেই। ছিন্নভিন্ন, খণ্ডিত মনুষ্যত্বের উপর নেশনের পাদপীঠ।

আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র যে নাগরিক সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাকেই সে গ্রাস করে, মানুষের লোভ ও ভয়কে কাজে লাগিয়ে সমাজের প্রতিপত্তিশালী অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে তা সমাজেরই মৌল স্বার্থের বিরোধী হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মতে সমাজ আত্মনিবিষ্ট, সমাজের লোকেরই জন্য, লোকের সঙ্গে লোকের সম্পর্ক যেখানে স্বাভাবিক, না পরস্পরের পরিপূরক কেউ কারুর অপহারক নয়। তার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা, তার স্বাভাবিক নীতি সহযোগ। কিন্তু 'নেশন' হল নৈর্ব্যক্তিক সংসক্তির নির্বিচার দাপট ও সম্প্রসারণ। তার মূল কথা প্রতিযোগিতা, মানুষে মানুষে অবিশ্বাস ও পরস্পরের প্রতি সন্দেহ।

জাতীয়তাবাদের মূলে ও কেন্দ্রে আছে বিরোধ ও বিজয়। বিজ্ঞান ও সংগঠনের কল্যাণে প্রতিবেশী সমাজ ও দেশসমূহকে ঐহিক যুগের জন্য যে উত্তেজিত করে, পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষানল জ্বালিয়ে তোলে। তার মনস্তত্ত্ব আদিম বিবদমান যুগের মনস্তত্ত্ব। তাই এক জাতি অপর জাতির সবচেয়ে বড়ো শত্রু হয়ে ওঠে। জাতির শক্তি ও বৈভবের গরিমা, তার পতাকা ও মন্ত্র, তার মিথ্যা দেবোপাসনা, তার দেশপ্রেমিকতার কপট বজ্রঘোষণার আড়ালে যে মূল সত্যটি রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছেন তা হল জাতিই জাতির সবচেয়ে বড়ো শত্রু, অন্য জাতির বিরুদ্ধেই তার যত সতর্কতা, যেকোনো নতুন জাতির জন্মই তার কাছে এক নতুন আতঙ্কের উদ্ভব।

উদাহরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে জাপান পাশ্চাত্যেরই আলোকে নিজেকে নেশনে পরিণত করেছিল, সে জাপানই পাশ্চাত্য দেশগুলির কাছে পরিণত হয়েছে এক আতঙ্কে। জাপান নিজে আবার নেশনের নতুন অস্ত্র হাতে পেয়ে চীনের ওপর তার ধার পরীক্ষা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। চীন পাছে জাতি হিসাবে গড়ে ওঠে, তাই ইংরেজরা তাদের নাম দেয় 'ইয়োলো পেরিল' (সর্বনাশা হলুদ)। কোনো শাসক জাতি কখনই চায় না পরাধীন দেশে নেশনবোধের উন্মেষ ঘটুক। কেননা তা তার স্বার্থের পরিপন্থী। যে শক্তির উপর তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত সেই শক্তিভাণ্ডার সে অপরের ভাগ্য কখনই উন্মুক্ত করতে চায় না। তাই ভারতে ব্রিটিশ নেশনের শাসন জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঠেকাতে নির্বিচারে আইনশৃঙ্খলার ষ্টিম রোলার চালাচ্ছে। এইভাবেই রবীন্দ্র দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ সর্বদা স্ববিরোধী ও পারস্পরিক বিরোধে জর্জ রিতা।

জাতীয়তাবাদ যে ধনতন্ত্রের সঙ্গে এবং স্বাতন্ত্র্যের অনিবার্য নিয়মে উপনিবেশবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট উপলব্ধি ঘটেছিল, পূর্বোল্লিখিত 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন "সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজ যুগের পত্তন হইয়াছে।" "বৈশ্যরাজ যুগ'বলতে তিনি ভারতীয় জাতব্যবস্থার ভাষায় ধনতন্ত্রের যুগকেই বোঝাতে চেয়েছিলেন। তিনি জাতীয়তাবাদকে যে

ইন্ডিভিডুয়ালের দানবমূর্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, সেই ইন্ডিভিডুয়াল তো আসলে ধনতন্ত্রেরই ব্যক্তি একক, যার দর্শন ইন্ডিভিডুয়ালিজম বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদই হল ধনতন্ত্রের মৌল দর্শন। চরম প্রতিযোগিতা মূল নীতি এবং স্বার্থান্ধ সংগ্রহবাদ তথা গৃধ্নুতা (acquisitlivness) মূল চালিকা শক্তি।

রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে দেখেছিলেন এক সংগঠিত স্বার্থপরতা, ইন্ডিভিডুয়ালের এক দানবমূর্তি, নৈর্ব্যক্তিক নিরবয়ব এক সমষ্টিতত্ত্ব, মানুষের আবিষ্কৃত সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এক মাদকশক্তি এবং এক নৈতিক বিকৃতি হিসাবে। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদের অনিবার্য পরিণতি সাম্রাজ্যবাদে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে।

## ৪.০৭ সামাজিক ন্যায়

সামাজিক ন্যায়ের অনুসন্ধানে রবীন্দ্রনাথ প্রগতিশীল সমাজবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন, যদিও তিনি কোনো মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। ১৮৯০ সালে পতিসরে জমিদারীর তত্ত্বাবধান করার সময়ে তিনি তাঁর রায়তদের, গরীব প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার কথা জানতে পারেন, সম্পদের অসম বণ্টন ও শোষণই যে এই দুর্দশার কারণ, তাও তিনি উপলব্ধি করেন। "সাধনা" পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১২৯১) তিনি ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী আর্নেষ্ট বেলফোর্ট বক্স-এর সঙ্গে আলোচনা ভিত্তিক এক প্রবন্ধ লিখলেন যার শিরোনাম ছিল "সমাজতন্ত্র"। এখানে তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন, সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হলো ধনীর কর্তৃত্বের বদল এনে দরিদ্র, আর্ত মানুষদের কর্তৃত্ব স্থাপন। "ছিন্নপত্রাবলী" গ্রন্থে এবং "শাস্তি", "দুরাশা", "ঠাঁকুরদা", "অনধিকার প্রবেশ", "প্রায়শ্চিত্ত", "মহামায়া" প্রভৃতি ছোটগল্পে তাঁর এই ভাবনা ছড়িয়ে আছে। ভারতীয় সমাজের অসম সামাজিক কাঠামোর প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের সমাজতন্ত্র ও অসমতাহীন সমাজের ধারণা গড়ে উঠেছে। কৃষক ও শ্রমিকদের আর্থিক উন্নয়নের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ দারিদ্র দূরীকরণের স্বপ্ন দেখেছেন। অত্যাচারী জমিদারদের তিনি, "জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ" বলে চিহ্নিত করেছেন। পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানান জমিদারী এস্টেট একটি অছি পরিষদের মতো থাকা উচিত এবং প্রজারাও যেখানে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালন ব্যবস্থায় যেন অংশ নিতে পারে। "কালান্তর" এবং "রাশিয়ার চিঠি"তে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এক আদর্শ মানবতাবাদীর সুরে কথা বলা থেকে সরে এসে অর্থনৈতিক শোষণের অবসান এবং সামাজিক সমতার কথা বলেছেন।

তদানীন্তন সোভিয়েত সরকারের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে রাশিয়ায় যান। সোভিয়েতের শিক্ষাব্যবস্থা কৃষি এবং শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন, মুক্ত কণ্ঠে তিনি স্বীকার করলেন, "বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি,...উপলব্ধি হল অসামান্য...রাশিয়ায় না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অসমাপ্ত থাকত" (রবীন্দ্ররচনাবলী)। ১৯৩৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকায় একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ভবিষ্যতের জন্য আমাদের এই শিক্ষা প্রয়োজন যে আজ যারা মানব সমাজের পক্ষে সকল রকম শোষণের অবসান চাইছে, তাদের সাথেই মিত্রতা করতে হবে। রাশিয়ায় বিভিন্ন পশ্চাৎপদ জাতিসমূহের উন্নয়ন বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। শুধু সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পূনর্বিন্যাসে সরকারের আন্তরিক প্রয়াস রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ হন। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ সরকার যখন

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার (সম্প্রদায়ভিত্তিতে পৃথক পৃথক নির্বাচকের দাবী) নামে দেশে সাম্প্রদায়িক বিভাজন করতে চেয়েছিল তখন রবীন্দ্রনাথ গাঁধীর সঙ্গে সমানভাবে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সকলের জন্য সামাজিক ন্যায় দাবী করেছেন। তাঁর 'আত্মশক্তি'র রাজনীতি আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মোন্নয়নের পথের দিশারী।

## ৪.০৮ মানুষের ধর্ম

জ্ঞানদীপ্তির ঐতিহ্য অনুসরণকারী রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানবতাবাদের পূজারী। শৈশব থেকে কৈশোর পেরিয়ে ব্রাহ্মসমাজে তাঁর যাতায়াত অবধি তিনি ধর্মীয় আচারবিচার সংস্কারের তুলনায় মানবতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। যুক্তির গুরুত্বকে অস্বীকার না করেও রবীন্দ্রনাথ প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক সহযোগিতার উপর বিশ্বাসে জোর দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মানবতা বোধের ধারণা এক জৈবিক সামগ্রিকতায় আস্থাশীল; ঈশ্বরের চূড়ান্ত অস্তিত্বে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ মানবকর্মের পরিণতিতে ঈশ্বরের সাথে সমন্বয়ের প্রতিই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর 'জীবন দেবতা'-কে তিনি এইভাবেই 'সোনারতরী', 'চৈতালী', 'মানসী' কবিতার সৃজনে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। 'পত্রপুটে'র পঞ্চদশ কবিতায় এই তিনি আহ্বান জানিয়েছেন—

> "হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ
> পরিত্রাণ করো
> ভেদচিহ্নের তিলক পরা
> সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।।"

মানুষের ধর্ম প্রবন্ধে তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, অন্য এক ধর্ম এবং যা সর্বজনীন ও একান্তভাবে মানবিক। ব্যক্তিগত সত্য ক্রমে সর্বজনীন সত্যে লীন হয়ে যাবে অসীমের মাঝে। সকলের মহামিলনের মন্ত্রই মানবধর্মের মূল কথা।।

## ৪.০৯ পরিবেশবাদ

শিশু বয়সেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গৃহশিক্ষকের কাছে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতির পাঠ পেয়েছিলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটা ছোটো পরীক্ষাগারও ছিল। শিশুকাল থেকেই তাঁর বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ছিল। বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বোস তাঁর সুহৃদ ছিলেন। "বিশ্বপরিচয়" গ্রন্থে (১৯৩৭) বিজ্ঞান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের গভীর কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া যায়। গাঁন্ধীর মতো রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতির মধ্যে খুবই সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন। এই প্রেক্ষাপটেই তাঁর পরিবেশ বিষয়ক ধারণা উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বর্তমানে আমরা সভ্যতার যে প্রবণতা দেখি তাতে বোঝা যায় যে, সে ক্রমশই প্রকৃতির সহজ নিয়ম পেরিয়ে বহু দূরে চলে যাচ্ছে। মানুষের শক্তি জয়ী হচ্ছে প্রকৃতির শক্তির ওপরে। এই

জয়ের ব্যাপারে প্রথম গৌরব পেল মানুষের বুদ্ধিবীর্য, কিন্তু তার পিছন পিছন এল দুর্বাসনা।'' রবীন্দ্রনাথের মতে এটা টিকতে পারে না। কারণ ''প্রকৃতিকে অতিক্রম করে কিছুদুর পর্যন্ত যাওয়া যায়। তারপরে আসে বিনাশের পালা, ''আজকের ধারণায়, স্থিতিক্ষম উন্নয়ন বা সাসটেনেবল্ ডেভালপমেন্ট বলতে যা বোঝায়, তা-ই রবীন্দ্রনাথের কথায় স্পষ্ট হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র সাসটেনেবল্ ডেভালপমেন্ট-এর কথা বলেন নি। প্রকৃতির উপর লুণ্ঠন চালিয়েও ঘাতকসম বিকাশের যে সব মডেল চালু করার চেষ্টা আজকাল করা হচ্ছে তাকেও অনেক আগেই সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কথায়, ''মানুষ আপন সভ্যতাকে যখন অভ্রভেদী করে তুলতে থাকে তখন জয়ের স্পর্ধায় বস্তুর লোভে ভুলতে থাকে যে সীমার নিয়মের দ্বারা তার অভ্যুত্থান পরিমিত। সেই সীমায় সৌন্দর্য, সেই সীমায় কল্যাণ। সেই যথোচিত সীমার বিরুদ্ধে নিরতিশয় উদ্ধত্যকে বিশ্ববিধান কখনই ক্ষমা করে না। ...প্রকৃতির নিয়মসীমায় যে সহজ স্বাস্থ্য ও আরোগ্যতত্ত্ব আছে তাকে উপেক্ষা করেও কী করে মানুষ স্বরচিত প্রকাণ্ড জটিলতার মধ্যে কৃত্রিম প্রণালীতে জীবনযাত্রায় সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে, এই হয়েছে আধুনিক সভ্যতার দুরূহ সমস্যা'' (উপেক্ষিতা পল্লী)। রবীন্দ্রনাথ অরণ্যক্ষয়ের বিরুদ্ধে কথা বলেচেন। ''হলকর্ষন'' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন অরণ্যের আশ্রয়হারা আর্যাবর্ত আজ তাই খরসূর্যতাপে দুঃষহ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, লোভের বশবর্ত্তী হয়ে মানুষ যতই ব্যক্তি স্বার্থকে সমাজ স্বার্থের উপরে ঠাঁই দিয়ে প্রকৃতির উপর লুণ্ঠন চাপিয়ে দেয় ততই গ্রাম ও শহরের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন নগরায়ন প্রক্রিয়া কিভাবে পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে চলেছে। গ্রাম ও শহরের এই অসমতা দূর করার জন্য গ্রাম ও শহরের পরস্পর নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে তিনি এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে লোভ-অন্যায় বিযুক্ত এক সমাজ গড়ে উঠবে। ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত 'বিশ্বভারতী নিউজ বুলেটিনে' রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, বিজ্ঞান কি মানবিক হতে পারে? প্রগতি বা বিকাশ যদি নিছক যান্ত্রিক হয়, তবে তা কখন মানুষের অন্তহীন আত্মশক্তির বিকাশ ঘটাবে না, সামাজিক সুত্র আর সৌন্দর্যবোধ কখনই এক হতে পারে না। 'মুক্তধারা' নাটকে যন্তরাজ বিভূতি ও তার মন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ''রক্তকরবী'' নাটকে নন্দিনীর আহ্বানে সর্দারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুরে সেই শাশ্বত সৌন্দর্যবোধের কথাই বলা আছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তা কোনো বিচ্ছিন্ন ভাবনা নয়, বরং বলা শ্রেয় যে রবীন্দ্রনাথের সর্বজনীন চেতনার মধ্যেই এই ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে।

## ৪.১০ উপসংহার

আধুনিক সংস্কৃতির সত্য ধারণাটি যথাযোগ্যভাবে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় রূপ পেয়েছে। বহুমুখী প্রতিভা ও এক উপযুক্ত মুক্তিশীল মননের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বিশ্বের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির যোগ্য প্রতিনিধি। সার্বভৌম কবি ও আত্মিক মানবতাবাদের উপযুক্ত সংমিশ্রণ ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়। পরাধীন ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ এক যুক্তিশীল সংস্কারমুক্ত পুরসমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। হিন্দু-

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের অবসান ঘটিয়ে, দুই লোকসমাজকে অতিক্রম করে এক মহাজাতি নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাস্তব পরিস্থিতিকে তিনি ততটা গুরুত্ব দেননি। কিন্তু নতুন এক স্বপ্ন দেখেছিলেন, এইখানেই তাঁর সর্বজনীনতা এবং এজন্যই তিনি আজও ঘরে ঘরে নন্দিত।

## ৪.১১ সহায়ক পাঠ :

১. টি. প্যান্থাম এন্ড কে. এল. ডয়েটশ্ সম্পাদিত—পলিটিক্যাল থট্ ইন মডার্ন ইন্ডিয়া।
২. আনিসুর রহমান—সোস্যাল এন্ড ইকোলজিকাল থটস্ অফ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩. আবু সৈয়দ আয়ুব—আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ।
৪. সব্যসাচী ভট্টাচার্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: এ্যান ইন্টারপ্রিটেশন।
৫. ভি. পি. ভার্মা—মডার্ন ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল থট্।
৬. অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পা), ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয় (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ)।
৭. অশোক সেন - রাজনীতির পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথ (বিশ্বভারতী)।

## ৪.১২ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী :

**সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য প্রশ্নাবলী :**

১. রবীন্দ্রনাথের আধুনিক মননে ভারতের কোন কোন সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নাবলী গুরুত্ব পেয়েছিল?
২. জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার দুটি মৌল সূত্র নির্দেশ কর।
৩. রবীন্দ্রনাথ কীভাবে রাষ্ট্রের উপরে সমাজের স্থান নির্ণয় করেছিলেন?
৪. সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কারণে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টির অবদান বর্ণনা কর।
৫. স্বদেশী সমাজ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা কী ছিল?
৬. মানুশের ধর্ম বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ব্যাখ্যা কর।
৭. সমবায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা বিশ্লেষণ কর।

**দীর্ঘ উত্তরের জন্য প্রশ্নাবলী :**

১. পাশ্চাত্য আধুনিকতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ব্যাখ্যা কর।
২. রাষ্ট্র ও সমাজ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা আলোচনা কর।
৩. সামাজিক ন্যায় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধারণা বিশ্লেষণ কর।

৪. ব্যক্তির অধিকার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা আলোচনা কর।
৫. 'জাতি ও জাতীয়তাবাদ' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ব্যাখ্যা কর।
৬. পরিবেশ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা আলোচনা কর।
৭. রবীন্দ্রনাথের সমাজ দর্শনে 'মানুষের ধর্ম' বিষয়টি কীভাবে ও কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল আলোচনা কর।

# পর্যায় : দুই (Module - II)

## জাতীয়তাবাদ

# একক ১ ☐ বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় জাতীয়তাবাদ

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত বঙ্কিম-রচনায় জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি

১.৩ ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র ঃ হিন্দু ঐতিহ্যের গৌরব

১.৪. আনন্দমঠ ও জাতীয়তাবাদ

১.৫ সাম্প্রতিককালের সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ

১.৬ সহায়ক পাঠ

১.৭ প্রশ্নাবলী

## ১.১ উদ্দেশ্য

● বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ কীভাবে ঘটেছে?

● 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ।

● হিন্দু ঐতিহ্যের গৌরব কীভাবে বঙ্কিম রচনায় প্রকাশ পেল এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা।

● বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তার মূল্যায়ন কীভাবে করা হয়েছে?

## ১.২ 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত বঙ্কিম-রচনায় জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি

১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা। শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নয়, রাজনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি চিন্তায় 'বঙ্গদর্শন' এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল এবং তার অনেকটাই স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীকে কেন্দ্র করে। ১৮৭২ থেকে ১৮৭৬-এর মধ্যে লোকরহস্য, বিজ্ঞান রহস্য, সাম্য, বঙ্গদেশের কৃষক, কমলাকান্তের দপ্তর প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশ পেয়ে ছিল 'বিবিধ প্রবন্ধ' - এ সংকলিত সাহিত্যতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি বিষয়ে নানা নিবন্ধ। বস্তুত এই ইতিহাস-রাজনীতি-সামাজিক প্রবন্ধগুলিতেই বঙ্কিমের স্বাজাত্যাভিমান বা জাতীয়তা বোধের উদয় হয়েছিল।

১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাতে তিনি লিখেছিলেন 'ভারতকলঙ্ক' নামে এক নিবন্ধ, সেখানে তাঁর প্রশ্ন

ছিল ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ কী? ইউরোপীয়দের মুখাগ্রে সর্বদাই এর উত্তরে শোনা যেত 'Effeminate Hindoos' - এর ব্যঙ্গাত্মক কথাবার্তা, বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য তা মানেননি; তিনি মারাঠি আর শিখদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, ভারতীয় সিপাহিদের বীর্যবত্তা নিয়ে ইংরেজদের দেওয়া সার্টিফিকেটের কথাও বলেছেন। দীর্ঘ পরাধীনতার কারণ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমান যে, দুটি বিষয় এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ। এক, ভারতীয়রা স্বভাবগতভাবে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষারহিত। দুই, হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজ মধ্যে জাতি প্রতিষ্ঠার অভাব বা জাতি হিতৈষার অভাব। বঙ্কিমের ভাষায়, "স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা, কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের স্বভাব, এমত আমরা বলি না; ইহা হিন্দু জাতির চিরস্বভাব বোধ হয়"। সাতশ' বছরের পরাধীনতার কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, দীর্ঘকাল পরাধীন থাকতে থাকতে হিন্দুদের স্বভাব থেকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মুছে গেছে, ব্যাপারটা সেরকম মোটেই নয়। ইতিহাস বলছে যে সেই প্রাচীন কাল থেকেই স্বাতন্ত্র্য চেতনা (independence) হিন্দুদের মধ্যে নেই — প্রাচীন পুরাণ, নাটক, কাব্য, মহাকাব্যে স্বাধীনতার গুণগান নেই। একমাত্র প্রাক-ব্রিটিশ পর্বে মোগল বাদশার বিরুদ্ধে মেবারের রাণাপ্রতাপ, মারাঠাবীর শিবাজী বা শিখ-স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে রণজিৎ সিং ব্যতিক্রমী উদাহরণমাত্র। নচেৎ হিন্দুর স্বভাবে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা নেই। যুগে যুগে হিন্দু রাজারা নিজের নিজের রাজত্ব বজায় রাখার জন্য বা তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়াবার জন্য যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়েছেন বা বহিঃআক্রমণ রোধ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঠেকাবার জন্য, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজার পাশে দাঁড়িয়েছে এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "তিন সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া আর্য্যের সঙ্গে আর্য্যজাতীয়, আর্য্যজাতীয়র সঙ্গে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নজাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন জাতীয়;— মগধের সঙ্গে কান্যকুব্জ, কান্যকুব্জের সঙ্গে দিল্লি, দিল্লির সঙ্গে লাহোর, হিন্দুর সঙ্গে পাঠান, পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে ইংরেজ;—সকলের সঙ্গে সকলে বিবাদ করিয়া, চিরপ্রজ্বলিত সমরানলে দেশ দগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সে সকল কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধ; সাধারণ হিন্দু সমাজ কখন কাহারও হইয়া কাহারও সহিত যুদ্ধ করে নাই।"

অর্থাৎ স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, নিজের রাজ্য নিজের অধিকারে টিকিয়ে রাখার বাসনা—এসবই রাজার বা তাঁর পারিষদবর্গের মাথাব্যথা, সাধারণ প্রজাবর্গের এসব ব্যাপারে কোনো দায় ছিল না। বিদেশি কোনো রাজা যদি সিংহাসনে বসেন, সাধারণ জনগণ তাঁকেই রাজা বলে মেনে নেবে, তাদের দিনযাপনীতে এরফলে কোনো হেরফের ঘটবে না— এই ছিল হিন্দুসমাজের দস্তুর।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এই স্বাতন্ত্র্যবোধের তীব্র অভাব থেকেই ভারত-কলঙ্কের দ্বিতীয় কারণটির উন্মেষ। সেটা হল হিন্দুসমাজের অনৈক্য এবং সমাজমধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব। জাতি-প্রতিষ্ঠার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ বোধ বিশেষ প্রয়োজন। এক, "আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল"। —অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য সমানুভূতির গুরুত্বের কথা বলেছেন। দুই, "হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক

স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতি পীড়ন করিতে হয় করিব। জাতি প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ।''

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 'বঙ্গদর্শন'- এ প্রকাশিত এই রচনার সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্রের আরও একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ 'জাতি বৈর' যৌথ প্রকাশিত হয়েছিল 'সাধারণী' পত্রিকায় ১১ কার্তিক, ১২৮০ বঙ্গাব্দে। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, ''যত দিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, তত দিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতি বৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যত দিন জাতি বৈর আছে, ততদিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈরভাবের কারণই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে যত্ন করিতেছি।''

তাহলে স্বজাতিভুক্তের সমানুভূতি ছাড়াও অনিষ্টকারী অন্য জাতির প্রতি বৈরিভাব জাতি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ জরুরি বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছিলেন। তিনি আরও জানিয়ে ছিলেন যে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠা এই দুই অজানা বিষয়ই আমাদের জানতে সাহায্য করেছে ব্রিটিশ শাসন। ''ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে।'' অর্থাৎ ইংরেজদের দৌলতেই ভারতবর্ষে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিভাবনায় যে কথাটা এখানে প্রধান হয়ে উঠল—তা হল, হিন্দুজনমানসে জাতিচেতনার অভাব—রাজার রাজত্ব বজায় থাকল না গেল সে রাজার দুর্ভাবনার বিষয়, সাধারণ মানুষের তাতে কিছু এসে যায় না কারণ রাজার রাজত্বের ভিত্তি হিসেবে জনসাধারণের সম্মতি বলে কিছু ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, এই জনসাধারণের সম্মতি যদি রাষ্ট্রের ভিত্তি না হয়ে ওঠে তাহলে জাতিত্ব বা জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না।

এই জাতীয়তার প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্কিম হিন্দুত্ব ও ঐতিহ্যগৌরবের কথা বারবার বলেছেন। ১৮৭৩ সালে 'সাধারণী' পত্রিকায় (নভেম্বর সংখ্যা) বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, ''....ইংরেজরা জেতা, আমরা বিজিত। মনুষ্য স্বভাবই এমত নহে যে বিজিত হইয়া জেতার প্রতি ভক্তিমান হয় অথবা তাহাদিগকে হিতাভিলাষী নিস্পৃহ মনে করে। .....আজ্ঞাকারী আমরা বটে কিন্তু বিনীত নহি, হইতে পারিব না। কেননা আমরা প্রাচীন জাতি। অদ্যাপি মহাভারত রামায়ণ পড়ি, মনু যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতে অতুল্য সংস্কৃত ভাষায় ঈশ্বর আরাধনা করি। যতদিন এ সকল বিস্মৃত হইতে না পারি ততদিন বিনীত হইতে পারিব না।''

## ১.৩ ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র ঃ হিন্দু ঐতিহ্যের গৌরব

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, এই ঐতিহ্যগৌরব ও হিন্দুত্বের বোধ আমাদের জাতীয়তার মূল। আমরা প্রাচীন জাতি, বর্তমানে ব্রিটিশ শাসনে আমাদের হীনাবস্থা ঘটলেও আমাদের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান অস্বীকার করা যাবে না। বস্তুত ওই শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান থেকেই আমাদের জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা ঘটাতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র, মিল, স্পেনসার,

অগস্ত কোঁৎ প্রমুখ উনিশ শতকের ইউরোপীয় চিন্তানায়কদের প্রভাবে আপ্লুত ছিলেন। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন বলে ইউরোপীয় জ্ঞানালোকের বিভিন্ন উপকরণ—যেমন, ইউরোপীয় যুক্তিবাদ, উদারনীতিবাদ, দৃষ্টবাদ (positivism), ইতিহাসবাদ, হিতবাদ (utilitarianism) ইত্যাদি তাঁর অধিগত ছিল। উনিশ শতকীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের মানসকাঠামো তৈরি করেছিল। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক মেলবন্ধন ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। যুক্তিবাদী ইউরোপীয় জ্ঞানালোকের প্রেক্ষিত থেকেই তিনি হিন্দুত্বের প্রাচীন ভারতের গরিমা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। এবং সেই কারণেই বঙ্কিম লিখেছেন যে, শুধু মনু বা যাজ্ঞবল্ক্যের শাস্ত্রীয় বিধান মেনে আমরা চলি না, চলা উচিত নয়। হিন্দুধর্মের ও হিন্দু গৌরবের পুনরাবিষ্কার বা পুনর্বিচার করতে হবে আধুনিক যুগোপযোগী বিজ্ঞান ও যুক্তিশীলতার নিরিখে। বঙ্কিম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হিন্দুসমাজের সর্বপ্রকার গোঁড়ামি, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও আচার-বিচারের বিরুদ্ধতা করেছিলেন। প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার স্বরূপ আবিষ্কারের জন্য তিনি আধুনিক পাশ্চাত্যের যুক্তিবোধ, ন্যায়পরায়ণতা, বিজ্ঞানচেতনা ও ইউরোপীয় জ্ঞানালোকের চর্চায় আগ্রহী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থটিতে হিন্দুধর্ম ও আস্তিকতার এক নতুন সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করেছেন এবং দেশপ্রেমের সঙ্গে তার সাযুজ্য তৈরি করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, ধর্ম হবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মর্মস্থল। ধর্ম বলতে বঙ্কিম কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্ম অর্থাৎ 'রিলিজিয়ন' বোঝাতে চাননি, ধর্ম বলতে তিনি সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি অনুশীলন ধর্মের কথা বলেছেন, যে অনুশীলনের তাৎপর্য হল এমন এক সংস্কৃতি যা সমস্ত মানবিক দক্ষতার পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ চর্চা। এই অনুশীলনের মাধ্যমেই ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, সর্বোত্তম সুখ ও সর্বাঙ্গীন মুক্তির পথ তৈরি করতে হবে। স্বদেশকে ভালবাসাও তাঁর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। দেশমাতৃকার প্রতি তাঁর বিনম্র উচ্চারণ 'বন্দেমাতরম্'। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, এই অনুশীলনের মাধ্যমেই মাতৃভূমির গৌরব, ক্ষমতা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রচলিত হিন্দুধর্মে যে বৈরাগ্য ও নানাবিধ অপার্থিবতার কথা বলা হয়, সংসারকে মায়া বলে চিহ্নিত করা হয় বঙ্কিমচন্দ্র তার বিরুদ্ধতা করে ন্যায়পরায়ণতা ও ধার্মিকতার এক নতুন আদর্শ নির্মাণ করেছেন।

'ধর্মতত্ত্ব'-এর সমকালেই তিনি লিখেছিলেন 'কৃষ্ণচরিত্র'। বৃন্দাবনের লীলাময় কৃষ্ণ তাঁর আরাধ্য ছিল না, এক পুরুষোত্তম বা পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানুষ হিসেবে তিনি কৃষ্ণকে কল্পনা করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে যোদ্ধা কৃষ্ণ, কূটনীতিক কৃষ্ণ, আইনের পরামর্শদাতা কৃষ্ণ, গৃহী, ধর্মপ্রচারক ও দার্শনিক কৃষ্ণ ছিলেন আমাদের আদর্শ। গীতার কৃষ্ণকেই তিনি বন্দনা করেছেন। যুক্তিশীলতার ও ন্যায়পরায়ণতার ভরকেন্দ্র ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। গীতায় বর্ণিত জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বের ভিত্তি। আর এসবের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল তাঁর জাতীয়তার বোধ। তিনি দাবি করতেন, হিন্দুত্ব এমন এক উচ্চমানের আধ্যাত্মিকতা অর্জন করেছে যার উৎস মানুষের অন্তরাত্মায় অভিন্নতার দর্শন। সেই প্রত্যয়ই হতে পারে আমাদের জাতীয়তাবাদের নিয়ন্ত্রক শক্তিও। অর্থাৎ স্বদেশপ্রীতিকেই বঙ্কিম জাগতিক মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করেছেন এবং স্বদেশ-নির্মাণ ও স্বদেশকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তিনি মহাভারতের কৃষ্ণকে প্রতিনিধিমূলক আদর্শ মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। পশ্চিমের যুক্তিবোধ ও দৃষ্টবাদী চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান না করে তিনি ভারতবর্ষের আদি সম্পদ গীতা, মহাভারত ও পুরাণকে ব্যাখ্যা করলেন নতুন যুগোপযোগী দৃষ্টিতে। আর প্রতিষ্ঠা করলেন

জাতীয় ঐতিহ্যের যুক্তিবাদী চরিত্র ও শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমকালীন ভারতবর্ষে অখণ্ড রাষ্ট্রের কোনো মূর্তি দেখেননি, জাতপাত-ভাষা-বর্ণ-ধর্মে বিভক্ত সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই খণ্ড খণ্ড রাজনৈতিকতার আবর্তে ঐক্যবোধ গড়ে তোলার জন্যই বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদী প্রকল্প রচনা—যার ভিত্তি হিসেবেই 'ধর্মতত্ত্ব'- এর অনুশীলন ধর্ম আর 'কৃষ্ণচরিত্র' - এর কৃষ্ণকল্পনা। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ওই একই বোধের শৈল্পিক প্রকাশ।

## ১.৪. আনন্দমঠ ও জাতীয়তাবাদ

'আনন্দমঠ' আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নির্মাণে এক ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্কিম তাঁর অনুশীলন তত্ত্বে প্রীতির দর্শন বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যক্তির বা জাতির ব্যক্তিত্ব নির্মাণে শক্তির প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রীতির নির্মাণ। জাতি গঠনের মূল চালিকা শক্তিই হল প্রীতি। প্রীতির বন্ধনেই নৈতিকতা ও আত্মবিকাশের পথ তৈরি হয়। প্রীতি হল সেই স্বার্থশূন্য ভালোবাসা যা ক্রমশ প্রকাশমান। মানুষ মানুষের প্রতি, তার গোষ্ঠীর প্রতি, তার জাতির প্রতি এই স্বার্থশূন্য ভালোবাসার প্রকাশ ঘটায় আর প্রীতি যখন ঊর্ধ্বমুখী হয়—যখন তা ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত হয়, তখন তা ভক্তি হয়ে ওঠে। জাগতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি যখন তার আত্ম, পরিবার, প্রতিবেশী, সমাজ ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে স্বদেশের প্রতি প্রীতি ও ভক্তির প্রকাশ ঘটায় তখনই ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটে। অনুশীলন ধর্মের এই দর্শন প্রকাশিত হয়েছে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে। 'আনন্দমঠ'-এর উপক্রমণিকায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন, অরণ্যানির ''নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, 'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না'? এইরূপ তিন বার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল,

'তোমার পণ কি?'

প্রত্যুত্তরে বলিল, 'পণ আমার জীবনসর্বস্ব।'

প্রতিশব্দ হইল, 'জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে'।

'আর কি আছে? আর কি দিব?'

তখন উত্তর হইল, 'ভক্তি'।''

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ব্যক্ত এই ভক্তি স্বদেশের প্রতি। ভবানন্দ মহেন্দ্রকে জানাচ্ছেন, ''আমরা অন্য মা মানি না— জননী জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্য-শ্যামলা—'' মা, তাঁকেই আমরা বন্দনা করি।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতীয়তাবাদ হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্তের মনে নতুন সাড়া ফেলেছিল। ইতিহাসবেত্তা অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত তাঁর এক নিবন্ধে খুব স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, বাঙালি হিন্দুর জীবনে ও কাজে দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, তেজ আনবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। ননীচোরার কীর্তনে কিংবা জয়দেবের কাব্যে বর্ণিত কৃষ্ণ নয়, গীতার শ্রীকৃষ্ণকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন বঙ্কিম। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ইতিহাস থেকে

পুরাণের অংশ বাদ দিয়েছিলেন এবং বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে কিছুই ভাবেননি। তিনি কৃষ্ণকে খুঁজেছেন নির্মোহ ঐতিহাসিকের পন্থায়। বঙ্কিম-বর্ণিত এই পথেই বাঙালি বন্দেমাতরম্ গাইতে শিখলো, গীতার বক্তব্য উচ্চারণ করে ফাঁসিকাঠেও গেল। এতে এক ধরণের জাতি-বোধ প্রতিষ্ঠা পেল। কিন্তু সে-জাতীয়তা হিন্দুর জাতীয়তা, সমগ্র ভারতবাসীর জাতীয়তা নয়; বাঙালির জাতীয়তা এবং নিঃসন্দেহে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণির জাতীয়তা।

কোনো সন্দেহ নেই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চেতনায় এই হিন্দুত্ব, বাঙালিত্ব এবং মধ্যবিত্ততা তাঁর সীমাবদ্ধতাই বটে। বিপুলাকার ভারতবর্ষীয় সমাজে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-শিখ নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বাস। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ধর্মীয় বিচিত্রতার এই চেহারা তেমন গুরুত্ব পায়নি, যেমন পেয়েছিল পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মহাজাতির চেতনায়। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধে হিন্দুত্বের সন্ধান, হিন্দু ঐতিহ্যের গৌরব, হিন্দু সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের চিন্তা প্রাধান্য পেয়েছে। এই অর্থে বঙ্কিমের চেতনায় হিন্দু জাত্যাভিমানের প্রকাশ ঘটেছে বলে সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে না। বস্তুত বিশ শতকের গোড়ায় বাংলার চরমপন্থী রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের যে কর্মকাণ্ড তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ছাপ ও প্রভাব খুবই স্পষ্ট। অনুশীলন সমিতি বা যুগান্তর গোষ্ঠী অগ্নিময় বিপ্লববাদী তরুণদের আরাধ্য বিষয় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী উপন্যাসগুলি, তাঁর বন্দেমাতরম্ সংগীত কিংবা অজস্র দেশাত্মবোধ উদ্রেককারী প্রবন্ধ-নিবন্ধ। স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ বা বিপিনচন্দ্র পালের মতো ব্যক্তিত্ব বঙ্কিমের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ মন্ত্র কেবল একটি গান হিসেবেই নয়, জাতীয়তাবাদী ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে এই গানের সর্বাত্মক ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। বস্তুত পরবর্তীকালে উদ্ভূত কিছু বিতর্কের উৎস হলেও বন্দেমাতরমের গুরুত্ব ও আবেদন এখনও ম্লান হয়নি। বন্দেমাতরম্ নিয়ে যে-বিতর্ক সে-বিতর্কে তার হিন্দুত্বের বোধকে ঘিরে। ভারতবর্ষের ব্যাপক মুসলিম সমাজ এই গানকে তাঁদের আরাধ্য সংগীত বলে গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ বন্দেমাতরম্ গানে আছে হিন্দু দেবীর পৌত্তলিক প্রতিমা ও ভাব। পৌত্তলিকতাবিরোধী মুসলমান সমাজ তা গ্রহণ করতে পারেননি। উপরন্তু বঙ্কিমসৃষ্ট 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহ' ইত্যাদি উপন্যাসে মুসলমানবিরোধী মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে বলে মুসলমান সমাজ তীব্রভাবে বঙ্কিম-সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছেন। তাঁকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে চিহ্নিত করেছেন। আবেগকে গ্রাহ্য না করে নির্মোহ যুক্তিবাদী সমালোচকেরা (হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে) অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে চিহ্নিত করতে আপত্তি জানিয়েছেন; তবে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি যে বঙ্কিমচন্দ্রই নির্মাণ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেননি। এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৭ সালে বন্দেমাতরম্ বিতর্কের যুগে অভিমত দিয়েছিলেন যে, এই মহান জাতীয়তাবাদী সংগীতটিতে হিন্দু পৌত্তলিকতার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে এবং সেই কারণে মুসলিম সমাজের আপত্তির কারণ থাকতে পারে। নিরপেক্ষ ভাবে বলা যেতে পারে যে সমগ্র দেশের জন্য একটি জাতীয় সংগীত রচনার সচেতন প্রয়াস না হলেও, 'বন্দেমাতরমের মাতৃবন্দনা আসলে দেশবন্দনা'। সেই মহাসঙ্গীত যথাকালে দেশবাসীকে জাতীয় আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। লক্ষণীয়, এই গানের প্রথম স্তবকে পৌত্তলিকতার কোনো নিদর্শন নেই, আছে দেশকে মাতৃরূপে দেখা ও দেখানোর প্রয়াস। তাই ওই অংশটিকে

জাতীয় সংগীত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, স্বাধীনতার পর জাতীয় সংগীত হিসেবে যখন রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটিকে বিবেচনা করা হল, তখন বন্দেমাতরম্ - এর প্রথম স্তবকটিও দ্বিতীয় জাতীয় সংগীত হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। তার আগেও কংগ্রেসের জাতীয় ও প্রাদেশিক অধিবেশন গুলিতে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ও গীত দুইই ছিল সমাদৃত।

## ১.৫ সাম্প্রতিক কালের সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ

অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত সহ আরও বহু বঙ্কিমগবেষক এ-বিষয়ে একমত যে, বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সমাজে জাতীয়তার মন্ত্র পড়েছিলেন। বস্তুত উনিশ শতকের বাংলায় নবজাগরণ আন্দোলনের ঢেউও সীমিত ছিল উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত জগতে, সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবিত্তের আওতার বাইরেই ছিল বলা চলে। বঙ্কিমযুগে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির চরিত্র ও ভূমিকা বিষয়ে অধ্যাপক দাশগুপ্ত যে-কথাগুলি লিখেছেন, তা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য : "উনিশ শতকের মধ্যেই মধ্যবিত্ত সমাজের চেহারা ও ভূমিকা এক এক সময় এক এক রকম। আমাদের এইটুকু বোঝা দরকার যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রধানত পেশাদারী গোষ্ঠীর রূপ নিয়েছে। বড় ভূম্যধিকারী গোষ্ঠীর ছাতার তলা থেকে বাঙালি মধ্যবিত্ত বেরিয়ে এসেছে। জমিদারদের বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সরিয়ে রেখে তারা তখন নিজেদের পৃথক সমিতি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করেছে। সেজন্য জমিদার শ্রেণীর স্বার্থবিরোধী কিছু বক্তব্য উপস্থাপিত করার ক্ষমতা ও সুযোগ পেশাদারী মধ্যবিত্তের হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ চিন্তায় এই পরিবর্তনের ছাপ রয়েছে।

"স্মরণে রাখা ভাল, পেশাদারী মধ্যবিত্ত ইংরেজশাসনের সৃষ্টি। বঙ্কিমের সমাজচিন্তায় তাই সাম্রাজ্যবাদের দ্বিধাহীন কোন প্রতিবাদ নেই। ইংরেজ শাসনে ভারতবাসীর মঙ্গল হয়েছে এ-কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। ইংরেজ, তথা পশ্চিমী সংস্কৃতির গুণাবলী সম্পর্কে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। অবাধ বাণিজ্যের নীতিতে কোন দেশের ক্ষতি হতে পারে না, এটা ছিল গুরুমশায়দের (স্টুয়ার্ট মিল, স্পেন্সার, কোঁৎ প্রমুখ চিন্তাবিদ) কথা, বঙ্কিমের কাছে আপ্তবাক্য। গোল বাধতো আত্মসম্মানের ক্ষেত্রে। ভারতীয় জাতির প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ইংরেজের আওতার বাইরে করতে হয়, ইংরেজ নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে করতে হয়। পেশাদারী মধ্যবিত্তের সহজ ও স্বাভাবিক পথ সাহেবদের আশে পাশে। জাতি প্রতিষ্ঠার তাগিদ উল্টোদিকে টানে। বঙ্কিম-বক্তব্যে এই টানাপোড়েন ছিল।"

এই টানাপোড়েন সত্ত্বেও একথা অবিসংবাদিত যে, জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা হিসেবে 'বন্দেমাতরম্'-এর মন্ত্র বঙ্কিমচন্দ্রই দিয়েছিলেন এবং যে সংগীত কেবলমাত্র গান হিসেবে না থেকে আপামর ভারতবাসীর কাছে ক্রমে ক্রমে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী স্লোগান হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। অবশ্য তা ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরেই মূলত।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলার পরিসর থাকা উচিত। সেটি এই যে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী মন্ত্র, বিশেষত বন্দেমাতরম্, স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে সারা ভারতেই ব্যাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিম রচনায় বারংবার বাঙালি সমাজের কথাই উচ্চারিত হয়েছে। অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত লিখেছেন, "......দ্বিতীয় সন্দেহ থাকে বঙ্কিমের 'জাতি'টিকে নিয়ে। ভারতবর্ষের সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একটিকে তিনি বেছে নিলেন। অন্য সম্প্রদায়গুলির জায়গা হয়েও হল না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ ও সমাজচিন্তা বিষয়ে গবেষণা করেছেন একালের আরও দুজন খ্যাতনামা চিন্তক অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুদীপ্ত কবিরাজ। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পশ্চিমী বিদ্যা আহরণ করে বঙ্কিম পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ, উদারনীতি বাদ, ইতিহাসবাদ, দৃষ্টবাদ, হিতবাদ সহ উনিশ শতকীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবিষ্কারসমূহ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। তৎকালীন ইউরোপীয় দর্শন ও সমাজতত্ত্ব বা সামাজিক তত্ত্বগুলির সর্বজনীন দাবি নিয়ে বঙ্কিম কোনো প্রশ্ন তোলেননি। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রাচ্যবাদের পদ্ধতিগত অনুমান প্রসঙ্গ—অর্থাৎ ব্রিটিশপূর্ব ভারতবর্ষ অচল, অনড়, অপরিবর্তনীয় এক জনসমাজ এবং প্রাচ্যের মানুষ হল অলস, কাপুরুষ, অকর্মণ্য, মেয়েলি স্বভাবের আর প্রতীচ্যের মানুষ হল উদ্যমী, বীর ও পৌরুষসম্পন্ন—বঙ্কিম মৌলিক কোনো প্রশ্ন তোলেননি। বঙ্কিম এই জ্ঞানালোকের আবর্তে বন্দীই ছিলেন বলা চলে। এবং সেই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র,পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বিষয়ে মৌলিক কোনো সমালোচনা উত্থাপন করেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের ডিসকোর্স মূলত পশ্চিমী চিন্তা থেকেই আহরিত। ব্রিটিশ শাসনের ন্যায়পরায়ণতা, নৈর্ব্যক্তিক আইনের প্রতিষ্ঠা, মুক্ত বাণিজ্যের অর্থনীতি, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি বঙ্কিমকে মুগ্ধ করেছিল, তিনি এসবের সূত্রেই প্রাচীন ভারতবর্ষের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারের কথা ভেবেছেন এবং তারই ভিত্তিতে তাঁর জাতীয়তার চেতনা নির্মিত হয়েছে।

এই যুক্তিবিন্যাসে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে সমগ্রভাবে নয়, খণ্ডিতভাবে দেখানো হয়েছে।

অধ্যাপক সুদীপ্ত কবিরাজ বঙ্কিমচন্দ্রের ইওরোপীয় জ্ঞানালোকের প্রতি এই প্রীতির পাশাপাশি অন্য আরেক বঙ্কিমের সন্ধান করেছেন। কেবল অধ্যাপক কবিরাজই নন বঙ্কিম-গবেষকেরা অনেকেই এই দ্বিতীয় বঙ্কিমের গুরুত্ব বিচার করেছেন তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'কমলাকান্তের পত্র' বা 'কমলাকান্তের জবানবন্দী'-কে বিশ্লেষণ করে। ঔপনিবেশিকতার যুক্তিকাঠামোকে তীব্র কষাঘাত করেছেন বঙ্কিম এই রচনাগুলিতে। সুদীপ্ত কবিরাজ কমলাকান্তকে বিবেচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'গোপন আত্মচরিত' হিসেবে। কমলাকান্ত মূলত ব্যঙ্গাত্মক সাহিত্য, হাসি ও তামাশা নিপীড়িত অবদমিত মানুষের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এই ব্যঙ্গরসের সাহায্যেই বঙ্কিম ইউরোপীয় যুক্তিবাদ এবং তার আশ্রয়ে ভারতবর্ষে যে-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো তৈরি হয়েছে তাকে তীব্রভাবে আঘাত করেছেন। কেবল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো নয়, পশ্চিমী আধুনিকতার উদ্ভট অক্ষম অনুকরণ—যা ঔপনিবেশিক সমাজে নব্যশিক্ষিত বাঙালিসমাজ, বিশেষত বাবুসমাজ, করে থাকে তার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ কষাঘাত করেছেন বঙ্কিম। অধ্যাপক অসিতকুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন, "কমলাকান্তের অনুশীলনে দুটি মূল জিনিস চোখে পড়ে। এক — পারিপার্শ্বিক সমাজ, ক্ষমতাশীল শ্রেণী ও গোষ্ঠী, তাদের আদর্শ ও মত, এই

সবকিছুর সম্বন্ধে তীব্র বিরাগ, ক্ষোভ ও ধিক্কার।..... দ্বিতীয় যে মূলধারা চোখে পড়ে, তা এই অসহ্য পরিবেশ থেকে উত্তরণের আকাংক্ষাপ্রসূত ভাবময়তা।''

অধ্যাপক ভট্টাচার্য আবার এও জানিয়েছেন যে, উত্তরণের আকাঙক্ষা ব্যক্ত হয়েছিল বটে কিন্তু ''যে হতাশাকে অস্বীকার করার জন্যে বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় নির্বাসন বেছে নিয়েছিলেন, যার প্রভাবে কেশবচন্দ্রের সময় থেকেই শিক্ষিত সমাজে অবতারবাদের উদ্ভব, সেই হতাশার তাড়নাতেই বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত পশ্চাৎমুখী। শাস্ত্র না মেনেও শাস্ত্রপ্রমাণে নিযুক্তচিত্ত; ক্রমে, বিচার ও বিকাশে আস্থা হারিয়ে আনুগত্যের দর্শনব্যাখ্যায় নিবিষ্ট।''

দেখা যাচ্ছে, ১৮৭০ - এর যুগে 'বঙ্গদর্শন'-এর বঙ্কিম নন, ধর্মতত্ত্ব'-এর বঙ্কিম, 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর বঙ্কিম, 'প্রচার'-এর বঙ্কিমকে বিশ্লেষণ করে একথা লিখেছেন অসিতকুমার ভট্টাচার্য। সম্ভবত এই শেষোক্ত পর্যায়ের বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গিকে এভাবে আলাদা করে নিলে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের সঙ্গেও বঙ্কিমকে জড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিম-ভাবনায় জাতীয়তাবোধের মূল্যায়নে সেই প্রয়াস নিতান্তই আপেক্ষিক ও অসম্পূর্ণ। স্মরণে রাখা দরকার; সময়টা ছিল জাতীয়তাবোধের অস্পষ্ট ঊষাকাল। 'দেশ' কথাটির মধ্যে শুধু ভাবময়তা আরোপ করেই বঙ্কিম ক্ষান্ত হননি। দেশীয় সমাজে জাতীয়তার মতো শক্তিকে ধারণ করার উপযুক্ত শক্তির তখন বড়ো অভাব। তাই যতরকম অযৌক্তিকতা, অন্তঃকলহ, আত্মবঞ্চনা, হীনম্মন্যতা ও পরানুকরণে মানুষ নির্বীর্য ও নিশ্চেষ্ট, তার থেকে আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটানো ছিল অত্যন্ত জরুরি। এই জাতীয়তা বোধ জাগ্রত করার সমান্তরালে হিন্দুসমাজের আত্মবিশ্লেষণে বঙ্কিম ছিলেন সোচ্চার। মুসলমান সমাজের প্রতিও তিনি সমদর্শী ছিলেন। তাঁর লেখা কৃষককুলের দুরবস্থায় হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্যের পার্থক্য নেই। আসলে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ', 'মুসলমান জাতীয়তাবাদ' ইত্যাদি প্রকরণগুলি অনেক পরের উদ্ভাবন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মনীষার মূল্যায়নে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করাই ভালো।

## ১.৬ সহায়ক পাঠ


১. অশীন দাশগুপ্ত : প্রবন্ধ সংগ্রহ, আনন্দ পাবলিশার্স ('বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নিবারণ চক্রবর্তী' শীর্ষক প্রবন্ধ)।

২. পার্থ চট্টোপাধ্যায় : ন্যাশনালিস্ট থট অ্যান্ড দ্য কলোনিয়াল ওয়ার্লড : এ ডেরিভেটিভ ডিসকোর্স, অক্সফোর্ড।

৩. সুদীপ্ত কবিরাজ : দ্য আনহ্যাপি কনশাসনেস—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড দ্য ফর্মেশন অব্ ন্যাশনালিস্ট ডিসকোর্স ইন ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড

৪. অসিতকুমার ভট্টাচার্য : বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা, গ্রন্থজগৎ

## ১.৭ প্রশ্নাবলী

### ১.৭.১ বড় ব্যাখ্যামুলক প্রশ্ন

১. বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

২. বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদকে কি হিন্দু জাতীয়তাবাদ বলা যায়?

### ১.৭.২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

২. আনন্দমঠকে জাতীয়তাবাদী উপন্যাস বলা হয় কেন?

### ১.৭.৩ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

কোন্ কথাটি ঠিক?

১. (ক) জাতীয়তাবাদী মতাদর্শে জাতিবৈর এক প্রধান উপাদান—বঙ্কিমচন্দ্র একথা মানেন/মানেন না।

(খ) হিন্দু পুনরুত্থানবাদী হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রকে চিত্রিত করা হয়/করা হয় না।

(গ) 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটি জাতীয় স্তরে স্বীকৃত/স্বীকৃত নয়।

# একক ২ ❑ রবীন্দ্রনাথ ঃ জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ নেশন কী এবং ভারতবর্ষে নেশন গঠনের সমস্যা

২.৩ বঙ্গভঙ্গবিরোধ পর্বে রবীন্দ্রনাথ

২.৪ জাতীয়তাবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ

২.৫ আন্তর্জাতিকতার পথিক রবীন্দ্রনাথ

২.৬ সহায়ক পাঠ

২.৭ প্রশ্নের নমুনা

## ২.১ উদ্দেশ্য

- রবীন্দ্রনাথ 'নেশন' ধারণাটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?
- ১৯০৩-০৮ এর বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের পর্বে রবীন্দ্রনাথ যে স্বাদেশিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার স্বরূপ কেমন ছিল?
- জাপানে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যে-ভাষণগুলি দিয়েছিলেন তার বিশ্লেষণ।
- রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা।

## ২.২ নেশন কী এবং ভারতবর্ষে নেশন গঠনের সমস্যা

স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ পর্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছে ধীরে ধীরে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ মনীষীর চিন্তায় তো বটেই, পরবর্তী পর্যায়ে মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতিতে জাতীয়তাবোধের তীক্ষ্ণ প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথকে এই জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যের শরিক হিসেবে গণ্য করা উচিত হবে না। রাবীন্দ্রিক জাতীয়তার চিন্তা একটু স্বতন্ত্র।

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকত্বে নতুনভাবে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ ঘটেছিল। এই পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন'- এর প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—'নেশন কী' এবং 'ভারতবর্ষীয় সমাজ'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় প্রবন্ধটির শিরোনাম 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশকালে ছিল 'হিন্দুত্ব', পরে গ্রন্থভুক্ত হবার সময় তার নাম পরিবর্তিত হয়েছে। এই দুটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দুটি খুব জরুরি প্রশ্ন তুলেছিলেন। প্রথমোক্ত

প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, সনাতন ভারতবর্ষে 'নেশন' বলে কোনো পদার্থের অস্তিত্ব ছিল না। নেশন সম্পূর্ণতই পশ্চিমী ধারণা। আর দ্বিতীয় প্রবন্ধে লিখেছিলেন, বর্তমান ভারতবর্ষে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদকে মোকাবিলা করার জন্য ন্যাশনালিটি গড়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু নেশন গঠনের প্রক্রিয়া ভিন্নতর হতে হবে। এখানে আরও একটি কথা বলা জরুরি। তা হল এই যে, 'নেশন কী' নিবন্ধটি কবি রচনা করেছিলেন ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী রেনাঁর একটি প্রবন্ধ পাঠ করে। 'নেশন কী' মূলত রেনাঁর প্রবন্ধের ভাবানুবাদ।

এই নিবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, 'নেশন' বলে কোনো বস্তু আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যে ছিল না এবং সেই কারণে বাংলাভাষায় 'নেশন' শব্দের তর্জমাও সম্ভব নয়। 'জাতি' শব্দটি ব্যবহার করা হয় বটে, কিন্তু তাতে বিপদ বেড়েছে। কারণ Race, caste এসব শব্দেরও তর্জমা করা হয় জাতি হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ জাতি অর্থে Race বোঝাতে চান, নেশনের বাংলা 'নেশন'ই রাখতে চান।

দ্বিতীয় নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, ইউরোপীয় ঐতিহ্যে নেশন-রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজনে। নেশনের উদ্ভব সেখানে স্বাভাবিক ঘটনা কেননা ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি মূলত রাষ্ট্রক্ষমতা। কিন্তু আমাদের সভ্যতার চরিত্র ভিন্ন। প্রাক-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে এক ধরনের ঐক্য হিন্দুদের মধ্যেও ছিল, কিন্তু সে-ঐক্য রাজনৈতিক ঐক্য নয়, কোনো ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সে ঐক্য নির্মিত হয়নি। সে-ঐক্য ন্যাশনাল ঐক্য নয়। হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য বা ভারতীয়দের ঐক্য সামাজিক সূত্রে। সামাজিক সম্প্রীতির ভিতরেই ভারতীয়দের ঐক্যচেতনা। যদিও একথা সত্য যে, বিপুলায়তন ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের শেষ নেই— ধর্ম, ভাষা, জাতি (Race), জাতপাত, সংস্কৃতি এমনকি ভূখণ্ডের প্রকৃতির দিক থেকেও বিপুল বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য রয়েছে তা মূলত সমাজচেতনার সূত্রে, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্য কখনও ছিল না। ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের এইখানেই মৌলিক প্রভেদ।

'ভারতবর্ষীয় সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "......আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়ো। অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে — আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকল প্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। আমরা যে হাজার বৎসরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায় অধ:পতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই....সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এ সমাজ আমাদিগকে সুখকে বড়ো করিয়া জানায় নাই— সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই, কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে। সেই সমাজকেই আমাদের সর্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক"।

এদেশে জাতিগঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কায়েম হওয়ার পর। কিন্তু জাতি গঠনের উপাদানগুলি কী কী? সাধারণভাবে বলা হয় জাতিগত (racial) ঐক্য, ভাষাগত ঐক্য, ধর্ম, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, বৈষয়িক স্বার্থের বন্ধন ইত্যাদির সূত্রে জাতি গড়ে ওঠে। 'নেশন কী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নেশন তৈরি হবার পক্রিয়ায় এই উপাদানগুলি সবসময়ে কার্যকর ছিল না। ফরাসি ভাবুক রেঁনা-র চিন্তাকে অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ তাই সিদ্ধান্ত করেছেন

যে, নেশনের মূল উৎস আত্মিক ও মানসিক। "সুগভীর ঐতিহাসিক মন্থনজাত 'নেশন' একটি মানসিক পদার্থ ......একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ"। নেশনের অন্তঃপ্রকৃতি তৈরি হয়েছে দুটি জিনিস দিয়ে — সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ অর্থাৎ ঐতিহ্য এবং দ্বিতীয়ত, একত্রে বসবাস করার জন্য পারস্পরিক সম্মতি।

নেশনকে মূলত ভাবগত ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে রবীন্দ্রনাথ যে খুব নতুন কথা বলছেন, তা কিন্তু নয়। একথা আরও বিস্তৃত পরিসরে অনেক সমাজবিজ্ঞানী আগে এবং পরেও বলেছেন। কিন্তু যে-কথাটি নতুন এবং তাৎপর্যপূর্ণ তা হল এই যে, ভারতীয় নেশন গঠনের প্রক্রিয়ায় তিনি সামাজিক শক্তিগুলির গুরুত্বের কথা খুব জোর দিয়ে বলেছেন। ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক সভ্যতার মানদণ্ডকে পরিহার করতে বলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই সমাজসংস্কার, সামাজিক চৈতন্য, কৌমবোধ, সমাজগঠনের ওপর অর্থাৎ সামাজিক সংহতির ওপর যে গুরুত্ব আরোপ করেন রবীন্দ্রনাথ, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জাতি গঠনের চিন্তা সেখানে খুবই কম।

## ২.৩ বঙ্গভঙ্গ—বিরোধ পর্বে রবীন্দ্রনাথ

স্বদেশি আন্দোলনের পর্বে (১৯০৩ - ০৮) কিছুদিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গের কার্জনীয় ঘোষণার পর সমস্ত বঙ্গদেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবর্গের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মিটিং-মিছিলে যোগ দিলেন। একের পর এক স্বদেশ উদ্দীপক গান লিখে সমগ্র বাঙালি জাতিকে মাতিয়ে তুললেন। ১৯০৬ সালে কার্লাইল সার্কুলার প্রকাশিত হলে সরকার পরিচালিত স্কুল-কলেজ বয়কট করে যখন স্বদেশি শিক্ষার জন্য জাতীয় শিক্ষা পর্ষৎ (National Council of Education) তৈরি হল, রবীন্দ্রনাথ সেখানেও নেতৃত্ব দিলেন। অর্থাৎ স্বদেশি আন্দোলনের সমস্ত ক্ষেত্রেই কবির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

কিন্তু এই আন্দোলনের মূল সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল ছিল সর্বত্র, সেকথা কি বলা যাবে? বস্তুত ছিল না। স্বদেশি আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিগত অমিল ছিল গোড়া থেকেই। এই পার্থক্যটি ঠিক কোথায় সে-বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের সামান্য ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে হবে।

তৎকালীন 'ইন্ডিয়ান ওয়ার্লড' (মার্চ-এপ্রিল ১৯০৭) পত্রিকায় এক বিশিষ্ট মডারেটপন্থী নেতা পৃথ্বীশচন্দ্র রায় স্বদেশি আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন। তাঁর মতে এই আন্দোলনের নেতৃত্বে কেবল নরমপন্থী আর চরমপন্থী বিভাজনটিই ছিল না, এর মধ্যে ছিল আরও কিছু উপবিভাগ। মডারেট নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি চরমপন্থী নেতা অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্ররা তো ছিলেনই, আরও এক ধাপ এগিয়ে ছিল অনুশীলন ও যুগান্তর দলের বিপ্লবপন্থীরা। আর ছিল, পৃথ্বীশচন্দ্রের ভাষায়, 'ঠাকুরপন্থী' দল, যাঁরা ব্রিটিশ শাসন উপেক্ষা করে স্বনির্ভর আত্মশক্তির আন্দোলনে যেতে চান। এই আন্দোলনের মূল কথা ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার চাইতে সামাজিক ক্ষমতার উন্মেষ ঘটানো বেশি প্রয়োজন, তাই সমাজগঠনের চর্চাকে প্রাধান্য দিতে হবে। খেয়ালে রাখতে হবে যে, ১৯০৫ সালে বয়কট আন্দোলনের শুরুর দিকে রবীন্দ্রনাথ

বয়কটের পক্ষেই মত প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বয়কট-বিরোধী হয়ে উঠলেন। বয়কটের বিরুদ্ধে বক্তব্য কেবল তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধেই প্রকাশ পেল না, পরবর্তী কালে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে তাঁর তীব্র জেহাদ ধরা পড়ল।

আসলে বয়কট আন্দোলনের লক্ষ্য বিষয়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল। সুরেন্দ্রনাথের মতো নরমপন্থী নেতারা ভেবেছিলেন, ‘‘বয়কট হল একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা—একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছোবার উপায় মাত্র। এর একমাত্র লক্ষ্য হল বাংলার অভিযোগের প্রতি ব্রিটিশ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বঙ্গভঙ্গ রদ করে ওই অভিযোগ দূর করা হলে বয়কটও প্রত্যাহৃত হবে’’। অর্থাৎ নরমপন্থীদের কাছে বয়কট ছিল সাময়িক এক রণকৌশল। চরমপন্থীদের অর্থাৎ বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দ প্রমুখের 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সের' তত্ত্বে বয়কট ছিল শাণিত এক অস্ত্র, পূর্ণ স্বরাজলাভের উপায় এবং সেই কারণে সর্বাত্মক। ১৯০৬-০৭ সালে বয়কটের মর্মার্থ দাঁড়াল বিদেশি পণ্যবর্জন, বিদেশি বিচারালয় বর্জন, বিদেশি স্কুল-কলেজ বর্জন, বিদেশি শাসন বর্জন। সর্বাত্মক বয়কটের এই চেহারা দেখে মডারেটরা শঙ্কিত হয়েছিলেন এবং ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে যজ্ঞভঙ্গ তার পরিণাম।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় বয়কটের তাৎপর্য গোড়া থেকেই ভিন্ন। নরম ও চরম কারোর সঙ্গেই মেলেনি কবির দৃষ্টি। তাঁর বক্তব্য ছিল ‘‘.....ইংরেজদের উপর রাগ বা জেদের বশবর্তী হয়ে নয়, দেশকে ভালোবেসে দেশীয় শিল্পজাতীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার ও সেই কারণে কিছু ভোগ্যবস্তু থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখার মধ্যে যে ভাবাত্মক (positive) দিকটি আছে, তাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর রচনাগুলিতে’’। রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল খুব সঠিকভাবেই ওপরে উদ্ধৃত এই কথাগুলি লিখেছেন তাঁর ‘‘রবিজীবনী’’ (পঞ্চম খণ্ড) গ্রন্থে। 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' কিংবা 'ব্রতধারণ' রচনাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

বোঝাই যাচ্ছে নেতিবাচক দৃষ্টি থেকে বাহ্য রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে বয়কটকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না রবীন্দ্রনাথ। তিনি একে জাতির আত্মবল বৃদ্ধির, জাতীয় ঐক্যরচনার উপায় হিসেবে দেখছেন। কিন্তু বয়কট যখন নেতাদের হুকুম আর রাজনৈতিক জবরদস্তির বিষয় হয়ে ওঠে, স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা হারায়, রবীন্দ্রনাথ বয়কট-বিরোধী হয়ে ওঠেন। আর জোরজুলুমের বয়কট আন্দোলনের সূত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের যে-প্রবল অবনতি, তা রবীন্দ্রনাথকে কাতর করে তোলে। গঠনাত্মক কাজের যে বিকল্প কিছু নেই—এই প্রত্যয় আরও দৃঢ় হয়।

স্বদেশি আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের মগ্নতা এবং 'গীতবিতান'-এর স্বদেশ পর্যায়ের গানগুলির সঙ্গে তাঁর ভাবনা বিশ্লেষণ করে কেউ বলতেই পারেন যে, রবীন্দ্রনাথ একজন মস্ত জাতীয়তাবাদী কবি। কথাটায় প্রাথমিকভাবে আপত্তি করার কোনো কারণও নেই। রবীন্দ্রনাথের মতো আর কেই বা অতো গভীরভাবে স্বাদেশিক চিন্তা প্রকাশ করেছেন তাঁর সাহিত্যে এবং জাগতিক কাজকর্মে। কিন্তু দেশকে ভালোবাসা এক, আর জাতীয়তাবাদ অন্য কথা। একথাটার বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

## ২.৪ জাতীয়তাবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ

কবি তাঁর বন্ধু সি এফ এন্ড্রুজকে একটা চিঠিতে একবার লিখেছিলেন, "I love India, but my India is an Idea and not a geographical expression. Therefore I am not a patriot — I shall even seek my compatriots all over the world." দেশের ওপর অত্যাচার হলে, বিদেশিদের দখলদারিত্ব চললে— তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে এবং এটা আমাদের দায়িত্ব যাবতীয় অন্যায়ের প্রতিরোধ করা। কিন্তু সে দায়িত্ব পালন করতে হবে একজন ভারতবাসী হিসেবে নয়, একজন মানুষ হিসেবে। অর্থাৎ মনুষ্যত্ববোধ কবিকে তাড়িত করেছে মনুষ্যত্বের অপমানকে রোধ করতে। তাঁর স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা বিশ্ববাসীকে ভালোবাসার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে না। এই যদি মনোভাব হয়, তাহলে বলতে হবে রবীন্দ্রনাথ দেশের ভূখণ্ডের ওপর কোনো দেবত্ব আরোপ করতে চাননি, দেশমাতৃকার প্রতি যুক্তিহীন অন্ধভক্তি প্রদর্শন করেননি। তিনি বিশ্বমানবিকতার প্রতি আস্থা রেখে স্বদেশের মঙ্গল চেয়েছেন। মানুষের অপমান তাঁকে আহত করেছে। ভারতীয় মানুষ বলে আলাদা কোনো অনুভূতির কথা কবি বলেন না। এবং সেইজন্যই 'Nationalism' নামে তাঁর বক্তৃতাসংকলনটিতে তিনি বলেছেন, "I deeply feel for all the races who are being insulted and injured by the ruthless exploitation of the powerful nations belonging to the West and the East. I feel as much for the Negroes brutally lynched in America, often for economic reasons, and for the Koreans who are the latest victims of Japanese imperialism, as for any wrongs done to the helpless multitude of my own country."

রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে জাতীয়তাবাদের দুটি ভিত্তি : এক, স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি ও আনুগত্য। দুই, অপর জাতিগুলিকে নিজের থেকে আলাদা করে দেখা— এক ধরনের বৈরি মনোভাব থেকে তাকে দেখা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "নিজের প্রতি বা আপন জাতির প্রতি এই যে অন্ধ আনুগত্য বা ভালোবাসার বোধ, সেটা আত্মহত্যার নামান্তর। এই স্বাজাত্যপ্রীতি স্বদেশের মুক্তির পথ প্রশস্ত করে না।"

১৯২১ সালে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যখন সারা দেশ উত্তাল, রবীন্দ্রনাথ সেই আন্দোলনের মতাদর্শের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন খোলাখুলি। তাঁর সমালোচনার প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে, এই আন্দোলন নেতিবাচক। অসহযোগের চিন্তা ভারতবাসীকে শেখাচ্ছে বিশ্বের সভ্যতা থেকে দূরে থাকো। তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো। অসহযোগের মন্ত্র মানুষের প্রতি সেবা বা প্রীতির চিন্তার ওপর স্থাপিত নয়, এই আন্দোলনের আদর্শ তাকে অন্ধতা ও বিদ্বেষের পথে ঠেলে নিয়ে যাবে। একথা মনে রাখা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথ অন্ধ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কেবল ১৯২১ সালেই নয়, তার কয়েকবছর আগে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, জাপানে ও আমেরিকায় ভ্রমণকালে ওই দুই দেশে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেছিলেন। সবকটি বক্তৃতার বিষয়ই ছিল জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি বিষয়ে। এই বক্তৃতাগুলিই 'Nationalism' নামক পুস্তিকায় সংকলিত হয়েছে।

এই প্রবন্ধগুলিতে ব্যক্ত বিশ্লেষণের অন্যতম এক বক্তব্য ছিল এইরকম : "In small minds, patriotism

dissociates itself from the higher ideal of humanity. It becomes the magnification of self, on a stupendous scale – magnifying our vulgarity, cruelty, greed, dethroning God, to put up this bloated self in its place."

সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্ববোধবর্জিত, নৈতিকতাবিহীন স্বাদেশিকতার চর্চার বিরোধী ছিলেন কবি। তাঁর মতে, মনুষ্যত্বচর্চা কথাটার অর্থ হল ব্যক্তিকে সৃষ্টিশীল হয়ে উঠতে হবে, সামাজিক হতে হবে, সর্বপ্রকার ব্যক্তিস্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে হবে নিজেকে। অতএব যে-নীতিবোধগুলি দিয়ে ব্যক্তি পরিচালিত হবে তা হল — সহযোগিতা ও সহমর্মিতার নীতি। জাতীয়তাবাদ ঠিক এর বিপরীত নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। জাতির প্রতিষ্ঠা ঘটেছে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নির্ভর করে — অপরের সঙ্গে নিজের পার্থক্যের বোধকে স্বীকার করে। সেই অর্থে জাতি সৃষ্টিশীল নয়, ব্যাপক মনুষ্যত্বের চর্চার শরিক নয়। তার একান্ত নীতি অপরের ওপর ধারাবাহিক ক্ষমতার বিস্তার।

এই ক্ষমতার সৌধ তৈরি হয়েছে স্বার্থপরতার ভিত্তিতে। নিজের জাতির বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যকে বাড়াতে হবে যেন তেন প্রকারেণ—সেটাই হল জাতীয়তাবাদের প্রকাশ, তার চরম ও পরম ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "......The spirit of national selfishness is the brain disease of a people which shows itself in red eyes and clenched fists in violence of talk and movement, all the while shattering its natural restorative powers." আর এই যদি হয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি, তাহলে সেই জাতীয়তাবাদের চরম পরিণতি থেকেই জন্ম নেবে সাম্রাজ্যবাদ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তারই প্রকাশ। এ হল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক প্রতিশোধমূলক যুদ্ধ।

জাতীয়তাবাদের এই সংকীর্ণ আদর্শ তাহলে একটি জাতিকে মুক্ত করতে পারে না, বৃহত্তর মনুষ্যত্বের চর্চা করতে শেখায় না, কেবল অন্ধ রাষ্ট্রপ্রীতি ও ক্ষমতার রাজনীতির পথ প্রশস্ত করে। অতএব এই লুণ্ঠনকারী জাতীয়তাবাদ সামরিক-সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের জনক, সহযোগিতানির্ভর, বিশ্বশান্তির পথে সহায়ক সমাজ তৈরি করে না। তাই জাতীয়তাবাদ সভ্যতার পরিপন্থী।

## ২.৫ আন্তর্জাতিকতার পথিক রবীন্দ্রনাথ

মানবসমাজের সৃষ্টিশীলতার প্রতি গভীর আস্থা থেকেই বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ। ১৯৩০ সালে হিবার্ট বক্তৃতায় তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'The Religion of Man' এবং সেই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "....man misses himself when isolated; he finds his own larger and truer self in his wide human relationship. His multicellular body is born and it dies; his multi-personal humanity is immortal." মানুষ তার সত্যকার সত্তার সন্ধান পায় যখন সে তার দৈনন্দিন স্বার্থপরতা ও জাগতিক বৈষয়িক নীচতাকে অতিক্রম করে সর্বজনীন ইচ্ছার কাছাকাছি যেতে পারে, নিজেকে বিশ্বাত্মার সঙ্গে মেলাতে পারে। এই প্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতাবাদের সূত্রগুলি অনুসন্ধান করতে হবে।

রাবীন্দ্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রথম সূত্রটি হল এই যে, ব্যক্তিমানুষ বা জাতির জীবন অতিশয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে যদি বিশ্বচেতনার সঙ্গে জাতির চেতনার মেলবন্ধন ঘটানো না যায়। বিশ্বজনীনতার অর্থ এই নয় যে নিজের ঘরের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলা। বিশ্বজনীনতার তাৎপর্য হল প্রতিবেশী দেশগুলির মানুষের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করা, দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক রচনা করা। বস্তুত সেই ছিল বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূল চিন্তা।

এই সূত্রটির সমর্থন পাওয়া যায় পিয়ার্সনের কাছে লেখা কবির একটি চিঠিতে (১৯১৮ সালে লেখা)। সেখানে তিনি লিখেছেন, "Our heart is like a fountain. So long as it is driven through the narrow channel of self it is full of fear and doubt and sorrow, for them it is dark and does not know its end. But when it comes down unto the open, on the bossom of the all, then it glistens in the light and signs in the joy of freedom."

দ্বিতীয় সূত্রটি হল, একটি দেশের মনুষ্যগোষ্ঠীর বা জাতির প্রগতিই যথার্থ প্রগতি নয়। আরেক প্রতিবেশী দেশের মানুষ যদি অন্ধকারে থাকে বা নিষ্পেষিত হয়, তাহলে সেটা গোটা বিশ্বের লজ্জার বিষয়। অতএব কেবল নিজের সম্পদ স্ফীত করা নয়, নিজের ক্ষমতার পরিধি বিস্তার নয়, অপরের প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠাটাই মানুষের কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ".......If in the night only my lamp is lit and the rest of the world is dark, the lamp has no real illumination for me."

তৃতীয় সূত্র হল, জাতি-বিদ্বেষ ও অন্ধ জাতীয়তা পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলে। জাতিগত উৎকর্ষবোধ (racial superiority) প্রতিবেশী জাতিগুলিকে শত্রু করে তোলে, অনতিক্রম্য বিভেদ তৈরি করে মিলনের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেয়। অতএব পুবের সঙ্গে পশ্চিমের আদান-প্রদানের দ্বারগুলি খুলে দিতে হবে, বন্ধুত্বের পথ রচনা করতে হবে। ১৯২১-এর আন্দোলনে গান্ধীর সঙ্গে মতবিরোধের এইটেই ছিল প্রধান যুক্তি এবং বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার তাৎপর্যও এতে নিহিত।

চতুর্থত, বিশ্বভারতী গঠনের চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ একথাও জোর দিয়ে বলতেন যে, বিশ্বের সবকটি জাতির নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্য রয়েছে, প্রতিটি জাতির যদি তাদের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ফসলগুলি অপরের হাতে তুলে দেয় এবং অপরের শ্রেষ্ঠ গুণরাজি নিজেরা আত্মস্থ করে, তাহলে বিশ্বসভ্যতা এক উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছোতে পারবে। এই পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া ও মতবিনিময়ের মধ্যে দিয়েই এক বলিষ্ঠ আন্তর্জাতিক সমাজ রচিত হবে। প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সভ্যতার ভিতরে এই সহাবস্থান ও মিলনেচ্ছার সুর শোনা গেছে— তার সমাজ সংস্থানে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। দেশবাসীর কর্তব্য ওই ঐতিহ্য অনুসরণ করে এক সমুন্নত স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করা।

## ২.৬ সহায়ক পাঠ

রবীন্দ্রনাথের লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ—

১. স্বদেশী সমাজ, ২. 'নেশন' কী

৩. ভারতবর্ষীয় সমাজ ৪. অবস্থা ও ব্যবস্থা

৫. রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত

৬. Nationalism (পুস্তিকা)

অন্যান্য

শচীন সেন : The political Thought of Tagore, General Printers and publishers Ltd, Calcutta, 1947.

সুধীর চক্রবর্তী (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রনাথ : বাক্‌পতি বিশ্বমনা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডভুক্ত দুটি নিবন্ধ— অনুরাধা রায় : রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ। অভ্র ঘোষ : নেশন নয়, সামাজিক সামঞ্জস্য চাই) ইনস্টিট্যুট অব ডেভলাপমেন্ট স্টাডিস, কলকাতা, ২০১১

নেপাল মজুমদার, ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

[চিন্মোহন সেহানবীশ, রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা চিন্তা, নাভানা, কলকাতা ১৯৮৩]

## ২.৭ প্রশ্নাবলী

### ২.৭.১ বড় ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১. 'নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ' — রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় নেশনের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

২. বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের পর্বে রাবীন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

৩. 'Nationalism' শীর্ষক পুস্তিকায় রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের যে সমালোচনা করেছেন তার পরিচয় দাও।

৪. রাবীন্দ্রিক আন্তর্জাতিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

### ২.৭.২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ইউরোপ রাষ্ট্রপ্রধান সভ্যতা, ভারতবর্ষ সমাজপ্রধান—রাবীন্দ্রিক বিশ্লেষণে একথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

২. জাতীয়তাবাদ সভ্যতার পক্ষে বিপজ্জনক— রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দাও।

### ২.৭.৩ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

1. নেশন একটি বিদেশি ধারণা— একথা মনে করতেন না/করতেন রবীন্দ্রনাথ।

2. বিশ্বভারতী রাবীন্দ্রিক জাতীয়তার/আন্তর্জাতিকতার প্রকাশ।

# একক - ৩ ☐ মহাত্মা গান্ধী : জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ গান্ধীজির রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি

৩.৩ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

৩.৪ গান্ধীজির আন্দোলনের গণভিত্তি

৩.৫ গান্ধীজির অর্থনৈতিক চিন্তা

৩.৬ গান্ধীজি ও নেশন স্টেট (জাতি-রাষ্ট্র)

৩.৭ গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতপার্থক্য

৩.৮ গান্ধীজির আন্তর্জাতিকতার ধারণা

৩.৯ সহায়ক পাঠ

৩.১০ প্রশ্নের নমুনা

## ৩.১ উদ্দেশ্য

- গান্ধীজির জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তিগুলি ব্যাখ্যা করা।
- ভারতবর্ষে রাজনৈতিক সংগ্রামের গণভিত্তি যে গান্ধীজিই স্থাপন করেছিলেন, তা ব্যাখ্যা করা।
- জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসেবে গান্ধীজির অর্থনৈতিক চিন্তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা।
- জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর বিতর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা।
- গান্ধীজির আন্তর্জাতিকতার ধারণা ব্যাখ্যা করা।

## ৩.২ গান্ধীজির রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি

'জাতির জনক' হিসেবেই মহাত্মা গান্ধী সর্বাধিক পরিচিত। অতএব জাতীয়তাবাদী চিন্তক ও রাজনীতিবিদ্ হিসেবে গান্ধীজির গুরুত্ব অবিসংবাদিত। গান্ধীর জাতীয়তা বোধের উন্মেষ ঘটেছিল মূলত তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকালে। তাঁর আত্মজীবনীতে গান্ধীজি নিজেই সে-কথাটা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন : "....God laid the

foundations of my life in South Africa and sowed the seed of the fight for national self-respect." দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রা লাঞ্ছিত হত সেখানকার সরকারের চূড়ান্ত বর্ণবৈষম্য নীতির কারণে। ১৮৯৩ সালে পোরবন্দরের জনৈক ব্যবসায়ীর একটি দেওয়ানি মামলায় একজন সহায়ক আইনজীবী হিসেবে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় যান এবং সেখানকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের দ্বারা নানাভাবে নিপীড়নের সম্মুখীন হন। তাছাড়া ভারতীয় কুলিদের ওপর চরম নিষ্পেশনের কারণে গান্ধীজি ভারতীয়দের সংঘবদ্ধ করে আন্দোলন শুরু করেন এবং ক্রমে একজন অবিসংবাদী নেতা হয়ে ওঠেন। শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে গান্ধীজির আন্দোলনের চরিত্র কিন্তু গোড়া থেকেই এক ভিন্ন মাত্রা অর্জন করেছিল। সেই সময়কার চালু আন্দোলনের ধরন গ্রহণ না করে গান্ধীজি রাজনীতিতে নিয়ে এলেন এক নতুন মন্ত্র—অহিংস সত্যাগ্রহ। মনে রাখতে হবে যে, বিশ শতকের সূচনায় ভারতবর্ষে তিলক-বিপিনচন্দ্র পালের চরমপন্থী আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে চালু হয়েছিল 'প্যাসিভ রেসিস্টান্স'-এর তত্ত্ব ও কৌশল। বয়কট, অবরোধ, আইন অমান্য ইত্যাদি ছিল তার অস্ত্র। গান্ধীজি তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এই অস্ত্রগুলি ব্যবহার করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার মেজাজ, দর্শন, লক্ষ্য ইত্যাদি ছিল ভিন্ন। গান্ধীজি বলেছেন, সত্যাগ্রহ আর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এক কথা নয়। প্যাসিভ রেসিস্ট্যান্স বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ছিল চূড়ান্তভাবে রাজনৈতিক অস্ত্র। সত্যাগ্রহ এক নৈতিক আন্দোলন। অহিংসার আশ্রয় নিয়ে সত্যের প্রতি অবিচল থেকে সত্যাগ্রহ মূর্ত হয়। আত্মত্যাগ, নিপীড়নকে ভয় না পেয়ে তার অহিংস মোকাবিলা, প্রতিপক্ষকে শারীরিক আঘাত না করে তাকে জয় করার চেষ্টা সত্যাগ্রহের বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকে বিবেচনা করলে সত্যাগ্রহ সবলের আন্দোলন, ত্যাগধর্মের আন্দোলন, চারিত্রিক বীর্যবত্তার আন্দোলন। প্যাসিভ রেসিস্ট্যান্স তুলনায় দুর্বলের অস্ত্র, এক নেতিবাদী রাজনৈতিক কৌশল। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজি এই সত্যাগ্রহের সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ১৯১৫ সালে ভারতে ফিরে এসে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি এই সত্যাগ্রহের ক্রম-উন্মোচন ঘটিয়েছেন।

অহিংস সত্যাগ্রহের দর্শন থেকেই একথা স্পষ্ট যে, গান্ধী তাঁর রাজনীতিতে ধর্মের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। ধর্ম মানে কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্মমত বা বিশ্বাস নয়, হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান ধর্মের আচার-বিচার ও রীতিনীতি মান্য করা নয়, গান্ধীজি ধর্ম বলতে বুঝতেন সত্যের প্রতি আগ্রহ। তাঁর ভাষায় 'God is Truth' নয়, 'Truth is God', অর্থাৎ জাগতিক জীবনে নৈতিকতার চর্চা করে চরম সত্যকে আহরণ করা মানুষের কর্তব্য। রাজনীতিতেও চাই ওই সত্যের প্রতি আগ্রহ আর নৈতিকতার ব্যাপক চর্চা। এই অর্থে গান্ধীজির রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নৈতিকতাসম্পন্ন, ধার্মিক। গান্ধী-গবেষকদের মতে, গান্ধী রাজনীতিকে ধার্মিক ও নৈতিকতাসম্পন্ন করে তুলেছেন। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি যেমন বলেছিলেন, "Gandhi had spiritualised politics".

## ৩.৩ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গান্ধীজির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আরও এক অভিনব মাত্রা ছিল। ধর্ম-ভাষা-জাতি-জাতপাত-সংস্কৃতি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে ভারতবর্ষ এক বৈচিত্র্যসম্পন্ন দেশ। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রচনা করে জাতি গঠন করার দায়িত্ব ছিল দেশনেতাদের। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ পর্যায় থেকে বিশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু চেতনার আধিপত্য ছিল, বহু ঐতিহাসিক একে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পর্ব বলে অভিহিত করেছেন। কেবল হিন্দু জাতীয়তাবাদ নয়, ইংরেজি-শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও নব্য মধ্যবিত্তের জাতীয়তাবাদ বলেও একে অভিহিত করা যায়। কারণ জাতীয় সংগ্রামগুলিতে ব্যাপক হারে সাধারণ মেহনতী মানুষের অংশগ্রহণের চল তেমন ছিল না। স্বাধীনতা আন্দোলনের গান্ধীযুগে অর্থাৎ ১৯১৫ থেকে স্বাধীনতার কাল পর্যন্ত জাতিগঠনের আন্দোলনে গান্ধীজি কয়েকটি নতুন মাত্রা সংযোজন করলেন। প্রথমত, হিন্দুয়ানি নয়, সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে হিন্দু-মুসলিম-শিখ-জৈন-পার্সি নির্বিশেষে সমস্ত ধর্মমতের প্রতি সম্মান ও সহিষ্ণুতা বজায় রেখে। এক মহাজাতি নির্মাণের লক্ষ্যে সমগ্র ভারতবাসীকে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। কেবল ধর্ম নয়, বিচিত্র জাতপাত-অধ্যুষিত ভারতীয় সমাজে সমস্ত ভেদ-বৈষম্য দূরীকরণের জন্য জাতপাতবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলাও গান্ধীজির কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছিল। অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলন, মন্দির আন্দোলন গান্ধীজির রাজনৈতিক সংগ্রামের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন, সমাজের অভ্যন্তরে জনসমাজের মধ্যে এই অভ্যান্তরীণ দ্বন্দ্ব-ভেদবুদ্ধির নিরসন করতে না পারলে যথাবিহিত ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বস্তুত এইসব অভ্যন্তরীণ ভেদ-বৈষম্যের ছিদ্রপথ দিয়েই বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী সরকার তাদের অন্যায় নিপীড়ণমূলক শাসনের মাত্রা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, এইসব ছিদ্রপথেই সমাজে শনির অনুপ্রবেশ। গান্ধী তারই নিরসন চেয়েছিলেন। অতএব হিন্দু বা মুসলিম জাতীয়তা নয়, এক মহাভারতীয় জাতীয় চেতনা নির্মাণই হবে আমাদের লক্ষ্য। তাতে হিন্দু-মুসলিম-শিখ-খ্রিস্টানের আপন আপন ধর্মমত পরিপোষণে কোনো বাধা নেই। কিন্তু জাতীয়তার বোধ নির্মাণে এদের কোনো গুরুত্ব নেই। ভারতীয়ত্বই সেখানে একমাত্র বিবেচ্য। ব্যক্তিগতভাবে প্রবল হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজির জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতপাতনিরপেক্ষ আদর্শ। এই পরিপ্রেক্ষিতেই গান্ধীর চিন্তা ও কর্মপ্রণালীর সঙ্গে প্রবল জাতীয়তাবাদী সাভারকার কিংবা বর্ণহিন্দুবিরোধী দলিত নেতা আম্বেদকরের রাজনীতির সাদৃশ্য ছিল না। বরং বিরোধিতাই ছিল। সাভারকারের হিন্দুত্ব বা আম্বেদকর সমর্থিত দলিতবর্গের পৃথক অধিকার নীতির সঙ্গে গান্ধীজির বিরোধিতার ইতিহাস দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে আছে।

## ৩.৪ গান্ধীজির আন্দোলনের গণভিত্তি

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক সংগ্রামকে গণসংগ্রামে পরিণত করার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ভারতবর্ষে গান্ধীজিই প্রথম করেছিলেন। তাঁর আগে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ছিল উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির আবর্তে সীমাবদ্ধ।

সাধারণ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে আন্দোলনকে বৃহৎ পরিসরে ব্যাপ্ত করার উদ্যোগ গান্ধীজির নেতৃত্বেই ঘটতে শুরু করল। সমগ্র ভারতবর্ষে কৃষক আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে গান্ধীজি সাধারণ মানুষের চেতনা প্রসারের চেষ্টা করেছিলেন। জাতীয়তার সংগ্রাম এক গণভিত্তি অর্জন করতেও শুরু করেছিল। তাঁর নেতৃত্ব ও সৃজনশীলতার কারণেই জাতীয় কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচির গণতন্ত্রীকরণ শুরু হয়েছিল। রাজনীতি শিক্ষিত উচ্চবর্গের আবর্ত থেকে বেরিয়ে নিম্নবর্গের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল এবং কংগ্রেসের মঞ্চও গণভিত্তি পেল। আরও যে-বিষয়টি লক্ষ্যণীয়, তাহল এই যে, গান্ধীজি তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনগুলিতে কোনো বিশেষ একটি শ্রেণি (class) বা সম্প্রদায়ের (community) স্বার্থের কথা মাথায় রাখতেন না। সমাজের সর্বপ্রকার শ্রেণি ও কৌমের স্বার্থবন্ধনের ওপর জোর দিতেন। ইংরেজিতে যাকে multi-class-community-movement-of-the-Indians বলা হয়। এই দিক থেকে বিবেচনা করে বলা যেতে পারে যে, সমগ্র জাতিকে গান্ধীজি শ্রেণি-ধর্ম-জাতপাত নির্বিশেষে একসূত্রে বেঁধে এক মহাভারতীয় চেতনায় উদ্বোধিত করার চেষ্টা করেছিলেন। নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষজনকে পূর্বেকার 'এলিট' রাজনীতির বৃত্ত থেকে বের করে নিয়ে এসে এই যে এক গণ-রাজনীতির বা গণজাতীয়তাবাদের সূচনা করলেন মহাত্মা গান্ধী, সেকারণে তাঁকে সঠিক ভাবেই জাতির জনক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রখ্যাত গান্ধী, গবেষক ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য লেনিনকে উদ্ধৃত করে গান্ধীজিকে ভারতবর্ষে 'সিরিয়াস রাজনীতি'র প্রবর্তক বলেছেন। লেনিন তাঁর এক রচনায় লিখেছিলেন, যেখানে জনগণ আছে—হাজারে নয়, অযুতে, লক্ষে — সেখানেই 'সিরিয়াস রাজনীতি'র সূত্রপাত।

গণজাতীয়তাবাদের স্রষ্টা গান্ধীজি আমজনতার কাছে ছিলেন 'গান্ধীমহারাজ'। হাঁটুর ওপর পরা চরকায় বোনা ধুতি-চাদর গান্ধীজিকে সাধারণ 'অশিক্ষিত' ভারতীয়দের কাছে তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সরল হিন্দুস্থানি ভাষায় তাঁর কথোপকথন এবং তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাপন তাঁকে সাধারণের কাছে আপনজন করে তুলেছিল। বস্তুত রাজনীতিতে গান্ধী যেসব ইডিয়ম ও প্রতীক ব্যবহার করতেন তা তাঁকে আপামর জনসাধারণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "....মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহু কোটি গরিবের দ্বারে — তাদেরই আপন বেশে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যকার জিনিস, এর মধ্যে পুঁথির কোনো নজির নেই। এই জন্যেই তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম।" প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের কালে এই প্রবন্ধটি বক্তৃতাকারে জনসভায় পেশ করেছিলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতায় মুখর হয়েছিলেন। তিনি গান্ধীর এই প্রবল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে গ্রহণ করতে পারেননি, কিন্তু মহাত্মাজি যে প্রকৃত গণ-আন্দোলনের স্রষ্টা তা স্বীকার করতে কখনো কুণ্ঠিত হননি।

## ৩.৫ গান্ধীজির অর্থনৈতিক চিন্তা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে ভারতীয় উৎপাদনব্যবস্থা ও তার সামাজিক কাঠামো ভেঙেচুরে তছনছ করে

দিয়েছিল—সে-বিষয়ে গান্ধীজির কোনো সন্দেহ ছিল না। দাদাভাই নৌরজি-রমেশচন্দ্র দত্ত থেকে শুরু করে সমস্ত জাতীয়তাবাদী নেতারা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে, দেশের অপর্যাপ্ত আর্থিক সম্পদ কীভাবে বিদেশি বাণিজ্যপতিরা তাদের নিজেদের স্বার্থে নিষ্কাশন করে (Drain Theory) ভারতবর্ষকে ক্রমাগত শোষণ করে চলেছে। দেশের সম্পদ কীভাবে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদকে পুষ্ট করে তুলছে। শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজির প্রতিযোগী হয়ে দেশীয় পুঁজি নির্মাণের প্রক্রিয়া ঈষৎ শুরু হয়েছিল ১৯০৩-০৮-এর স্বদেশি আন্দোলনের পর্বে। গান্ধীজি তখন দক্ষিণ আফ্রিকায়। ১৯০৯-এ লেখা তাঁর 'হিন্দ-স্বরাজ' গ্রন্থে গান্ধীজি স্বদেশি আন্দোলনের এই দেশীয় পুঁজির গুরুত্বের কথা লিখেছিলেন। কিন্তু বিদেশি পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে দেশীয় পুঁজি নির্মাণের প্রক্রিয়া বিষয়ে জাতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য ছিল। স্বদেশি অর্থনীতির ভিত্তি নির্মাণে তিনি যন্ত্রশক্তির বিরুদ্ধতা করলেন। তিনি পশ্চিমের আর্থিক শোষণই শুধু নয়, পশ্চিমী উৎপাদনব্যবস্থার মূল ভিত্তি বৃহৎ যন্ত্র ও শিল্পায়নের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন, এ এক 'শয়তানের সভ্যতা'। এর পরিবর্তে দেশীয় পরিস্থিতির অনুকূল দেশীয় ধারায় অর্থনীতিকে গড়ে তোলার তিনি পক্ষপাতী। তাঁর 'চরকা নীতির' অর্থ সরল যন্ত্র ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি-উৎপাদনব্যবস্থার ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ। এভাবেই তিনি চাইতেন দেশের বৃহৎ জনসমষ্টির শ্রমকে ব্যবহার করতে। কৃষি, কৃষি-নির্ভর শিল্প, কুটির শিল্পের অবাধ বিস্তারের পক্ষে যুক্তি দেখাতেন গান্ধীজি। গান্ধীজি এই অর্থে শিল্পপুঁজি সংগঠনের বিরুদ্ধে, বৃহৎ শিল্পায়নের বিরুদ্ধে।

'হিন্দু-স্বরাজ'-এ ব্যক্ত এই মত গান্ধীজি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জিইয়ে রেখেছিলেন, সন্দেহ নেই। অবশ্যই এটা তাঁর আদর্শবাদী দৃষ্টির পরিচায়ক। তাঁর আরেক সত্তা 'বাস্তববাদী গান্ধী' ১৯২০-এর দশক থেকেই সীমিত হারে বৃহৎ শিল্প বা যন্ত্রশিল্পের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এমনকী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে শিল্পায়নের প্রচেষ্টাকেও তিনি গ্রাহ্য করেছিলেন। এর প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করতে হয় তাঁর সম্পাদিত 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু কিছু বিবৃতি। যেমন, ১৯২১ - এর ৩ নভেম্বর-এ গান্ধী লিখলেন, "আমি সবচেয়ে জটিল যন্ত্রের ব্যবহারেরও পক্ষে থাকব, যদি তা দিয়ে ভারতের দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা দূর করা যায়"। কিংবা ১৯২৫ সালের ২০ নভেম্বরে লিখলেন, "আদর্শ পরিস্থিতিতে আমি সব রকম যন্ত্রের বিরুদ্ধে......কিন্তু যন্ত্র থাকবেই"। আর ১৯২৬-এর ১৫ এপ্রিলে তিনি জানালেন, "যন্ত্রের ব্যবহার সঙ্গত, যখন এতে সবার উপকার হয়"। ১৯৩০-৪০-এর যুগে গান্ধীজি কিছু কিছু ভারি শিল্পের প্রয়োজনকেও গ্রাহ্য করেছেন এবং সেসব সরকারি মালিকানায় থাকুক এমন মতও দিয়েছেন। তথাপি এসব তথ্য প্রমাণ করবে না যে, পরিণত গান্ধী তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা আমূল পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। বরং ১৯২১ সালে 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-তে প্রকাশিত আর এক মন্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি তাঁর চিন্তার গতি-প্রকৃতি। তিনি বলেছেন, "আমাদের শিল্পগুলি আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট উৎপাদন করতে পারে না।" মিল-কলকারখানা এবং যন্ত্রশিল্প ভারতবর্ষের অগণিত গ্রামবাসীর কর্মসংস্থান করতে পারবে না, ঘরে ঘরে চরকা সে-সংস্থানের বড় উপায়। বস্তুত বিকেন্দ্রিত উৎপাদনব্যবস্থার গুরুত্বের দিকে আমাদের নজর ফেরানোর জন্যই তাঁর সমগ্র আন্দোলন। 'হিন্দ-স্বরাজ'-এর দর্শন ওই দিক থেকেই বিচারের দাবি রাখে। রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসেবে গান্ধীজির এই বুনিয়াদি স্বদেশি অর্থনৈতিক চিন্তার গুরুত্ব যে সমধিক, একথা বিস্মৃত হলে চলে না।

## ৩.৬ গান্ধীজি ও নেশন স্টেট (জাতি-রাষ্ট্র)

আধুনিক জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে নেশন স্টেটের ধারণা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ইওরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ ব্যাপ্ত হওয়ার প্রেক্ষিতেই নেশন স্টেট বা জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব। আধুনিক সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী দোসর হল আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। তার নৈর্ব্যক্তিকতা, আমলাতান্ত্রিকতা, আইনের অনুশাসন ইত্যাদি ধারণাগুলির গুরুত্ব অপরিমেয়। গান্ধীজির দর্শনে মানবজীবনে রাষ্ট্রের এই কেন্দ্রিকতা কি স্বীকৃতি পেয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্র বিষয়ে গান্ধীজির মতামতের দুই ভিন্ন রূপ আমাদের সামনে প্রতিভাত।

আদর্শবাদী গান্ধী রাষ্ট্রকে সভ্যতার পরিপন্থী বলেই মনে করতেন। গান্ধীবাদ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একসময় তাঁর একান্ত সচিব অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু জানাচ্ছেন, রাষ্ট্রের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গান্ধী বলেছিলেন, "The state represents violence in a concentrated and organised form. The individual has soul, but as the state is a soulless machine, it can never be weaned from violence to which it owes its very existence." এই বিবৃতি থেকে রাষ্ট্র বিষয়ে গান্ধীর ধারণার কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক, রাষ্ট্র একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠান তাই তার হিংসা প্রয়োগের মাধ্যম সরাসরি প্রত্যক্ষগোচর হয় না। রাষ্ট্র আইন ও নিয়মকানুনের মাধ্যমে হিংসা প্রয়োগ করে এবং লাগাতারভাবে করে না, প্রয়োজনে হিংসার আশ্রয় নেয়। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির সত্তা তার স্বাধীনতার দ্বারা উদ্ভাসিত। রাষ্ট্র ব্যক্তির সজীব সত্তাকে তার নিষ্ঠুর আমলাতান্ত্রিকতা দিয়ে বধ করে। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের সংগঠিত পাশবিক শক্তি ব্যক্তির নৈতিক বিবেক-বুদ্ধি-সচেতনতাকে সংহার করে। এসব কারণে রাষ্ট্র মানবসভ্যতার শত্রু, আদৌ অপরিহার্য শর্ত নয়।

তাহলে কি গান্ধীজি সর্বতোভাবে রাষ্ট্রবিরোধী নৈরাজ্যবাদের সমর্থক? ইতিহাস কিন্তু সেকথা বলে না। তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে গান্ধীজি ভারতে স্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, সংসদীয় গণতন্ত্র, রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছেন। তিনি জাতীয় রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন—একথা ইতিহাসগ্রাহ্য সত্য নয়। আসলে গান্ধীজি অপছন্দ করতেন সর্বব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন আগ্রাসী রাষ্ট্র। অনৈতিক ও অসংবেদনশীল রাষ্ট্রযন্ত্র। যে রাষ্ট্র দাবি করে যে মানবকল্যাণের অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হল রাষ্ট্র এবং নৈতিকতার বিচারে সে শ্রেষ্ঠ—গান্ধীজি এই দাবিকে ভ্রান্ত বলে মনে করতেন। পক্ষান্তরে গান্ধীর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল এমন এক রাষ্ট্র যা ব্যক্তির অধিকার রক্ষায় সদা-তৎপর। যে-রাষ্ট্র আইন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার চরম অভিভাবক এবং আইন যেখানে জনমত দ্বারা সৃষ্ট। আর যে-রাষ্ট্র সুরাজ্য বা Good governance -কে সুরক্ষিত করে। গান্ধীর দর্শনে গ্রাম স্বরাজ-এর গুরুত্ব বারবার ফুটে উঠেছে সর্বগ্রাসী নেশন-স্টেটের নয়। গ্রামস্বরাজের ধারণার মূল কথা স্বয়ংনির্ভর গ্রামীণ কৌমসমাজ। গ্রামীণ কৌমসমাজগুলি তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে গড়ে তুলবে পঞ্চায়েত স্তরের সরকার ও প্রশাসন এবং ধাপে ধাপে ব্লক-জিলা-রাজ্য-কেন্দ্র এই গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের সৌধের ওপরেই গড়ে উঠবে। সেটাই হবে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রামরাজ্য। রাষ্ট্র যেখানে সংহারক শক্তি নয়, ব্যক্তি ও কৌমসমাজের

স্বাধীনতার রক্ষক। একেই বলা যেতে পারে গান্ধীজির বিকেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রের ধারণা। বলা বাহুল্য বিংশ শতাব্দীর ইওরোপীয় নেশন স্টেট-এর ধারণা থেকে গান্ধীজির চিন্তা ছিল অনেকটাই পৃথক।

## ৩.৭ গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতপার্থক্য

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের সংগ্রামের ধারায় মহাত্মা গান্ধীকে কোনো অর্থেই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী বলা চলে না। 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় ১৯২১ সালে গান্ধী লিখেছেন, "Patriotism for me is the same as humanity" কিংবা ১৯২৯ সালে লিখেছেন, "Through the realisation of freedom of India, I hope to realise and carry on the mission of brotherhood of men" ইত্যাদি। রমাঁ রঁল্যা তাঁর 'ভারতবর্ষ' নামক ডায়েরিতে সঠিকভাবেই লিখেছেন, গান্ধী জাতীয়তাবাদী, কিন্তু মহত্তম, সর্বোত্তম জাতীয়তাবাদী এবং সেই রকম,—যিনি ইওরোপের সমস্ত ইতর, অথবা নীচ, অথবা অপরাধপ্রবণ জতীয়তাবাদের আদর্শ বলে গণ্য হতে পারেন। অর্থাৎ রল্যাঁর বিচারে গান্ধী জাতীয়তাবাদী কিন্তু সংকীর্ণতা তাঁকে স্পর্শ করেনি। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ আগ্রাসী হতে বাধ্য এবং তা অপরিহার্যরূপে সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়। পক্ষান্তরে সৃষ্টিশীল, আত্ম উন্মোচনকারী জাতীয়তার বোধ এক মহৎ গুণ এবং তার অভিমুখ আন্তর্জাতিকতার দিকে। এই অর্থে জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার পথে প্রতিবন্ধক নয়, সুস্থ জাতীয়তাবাদের প্রসারেই আন্তর্জাতিকতাবাদ তৈরি হয়। গান্ধিজী নিজেও এই কথাটি বলেছেন, "It is impossible for one to be internationalist without being a nationalist. Internationalism is possible only when nationalism becomes a fact i.e. when peoples belonging to different countries have organised themselves and are able to act as one man." বিশ্বমানবতার আদর্শে এই এক হয়ে ওঠা সম্ভব নয় যদি না আত্ম-স্বাতন্ত্র্য বা নিজের স্বাধীনতা না থাকে। গান্ধীজি 'ইয়ং ইন্ডিয়া'য় লিখেছিলেন, "cooperation presupposes free nations worthy of cooperation."

গান্ধীজির নেতৃত্বে ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন ছিল গভীরভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিরোধও হয়েছিল এই আন্দোলনকে ঘিরে। কবি তখন বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার করে বেড়াচ্ছেন পশ্চিমী দুনিয়ায়। বলছেন বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান এক নীড়ে আহরণ করতে হবে। বিশ্বভারতী হবে মৈত্রী-ভ্রাতৃত্ব-শান্তির সন্ধানে বিশ্ববিজ্ঞানের আকর। ঠিক এমনই এক সময়ে গান্ধীজি ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ঘোষণা করলেন অসহযোগ। কেবল প্রশাসনিক-রাজনৈতিক স্তরে সীমিত থাকল না অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২১ সালের ২৪ মার্চ কটকে এক জনসভায় ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষা বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন গান্ধী, "Tilak and Rammohan would have been far greater men if they had not had the contagion of English learning......Rammohan and Tilak (leave aside my case) were so many pygmies who have no hold upon the people compared with chaitanya, Sankar, Kabir and Nanak. Rammohan and Tilak were pygmies before these saints." গান্ধীর

এই মন্তব্য—রামমোহনকে পিগমি বলা রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল। তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। কারণ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, রামমোহন এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তক ও আধুনিকতার অগ্রদূত হলেও প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে নবযুগের মিলনের ধারা তিনিই সূচনা করেছিলেন। পশ্চিমকে আবাহন করেছিলেন বলে তিনি প্রাচ্যজ্ঞানের জগৎ থেকে দূরে সরে যাননি। তিনি এই দুয়ের মিলবার স্থান প্রশস্ত করেছিলেন।

১৯২১-এর ৮মার্চ শান্তিনিকেতনের শিক্ষক জগদানন্দ রায়কে তিনি জানাচ্ছেন, "Nationalism হচ্ছে একটা ভৌগোলিক অপদেবতা। পৃথিবী সেই ভূতের উপদ্রবে কম্পান্বিত—সেই ভূত ছাড়াবার দিন এসেছে। কিছুদিন থেকে আমি তারি আয়োজন করচি। দেবতার নাম করলে তবেই অপদেবতা ভাগে। ...আমাদের বিশ্বভারতীতে সেই দেবতার মন্দির গাঁথ্‌চি। ...যে গৃহস্থ বিশ্বের আকাশে আলোককে নিজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবার পথ উন্মুক্ত করে দেয় সেই ঘরকে যথার্থ ভালবাসে। সেদিন যখন খবরের কাগজে পড়লুম মহাত্মা গান্ধী আমাদের মেয়েদের বলেছেন, তোমরা ইংরেজি পড়া বন্ধ কর, সেইদিন বুঝেছি আমাদের দেশে দেয়াল গাঁথা শুরু হয়েছে, অর্থাৎ নিজের ঘরকে নিজের কারাগার করে তোলাকেই আমরা মুক্তির পথ বলে মনে কর্‌চি—আমরা বিশ্বের সমস্ত আলোককে বহিষ্কৃত করে দিয়ে নিজের ঘরের অন্ধকারকেই পূজা করতে বসেছি—একথা ভুলছি, যে-সব দুর্দান্ত জাতি পরকে আঘাত করে বড় হতে চায় তারাও যেমন বিধাতার ত্যাজ্য, তেমনি যারা পরকে বর্জন করে স্বেচ্ছাপূর্বক ক্ষুদ্র হতে চায় তারাও তেমনি বিধাতার ত্যাজ্য।"

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। দেশের পত্র-পত্রিকা তো বটেই বিদেশি পত্রিকাতেও কবির এই জাতীয়তাবাদ-বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছিল। এই একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু অ্যান্ডরুজকে যে-চিঠিগুলি লিখেছিলেন তাতেও ছিল কবির জাতীয়তাবাদ বিরোধী মনোভঙ্গি। শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা যাতে অসহযোগ আন্দোলনে মেতে না ওঠে—সেরকম এক সাবধান বাণীও এসব চিঠিতে কবি জানিয়েছিলেন। কবির এই মনোভাবের বিরুদ্ধে গান্ধীও চুপ করে থাকতে পারেননি। 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় ১৯২১-এর ১ জুন তারিখে গান্ধীজির প্রতিক্রিয়া জানা গেল দুটি স্বতন্ত্র রচনায়। লেখাগুলির শীর্ষ নাম ছিল 'English Learning' এবং 'The poet's Anxiety'। প্রথম রচনাটিতে গান্ধী জানালেন, "The poet does not know perhaps that English is today studied because of its commercial and so-called political value. Our boys think, and righty in the present circumstances, that without English they cannot get government service. Girls are taught English as a passport to marriage. I know several instances of women wanting to learn English so that they may be able to talk to Englishmen in English. I know husbands who are sorry that their wives cannot talk to them and their friends in English. I know families in which English is being made the mother tongue. Hundreds of youths believe that without a knowledge

of English freedom for India is practically impossible. The canker has so eaten into society that, in many cases, the only meaning of Education is a knowledge of English."

মেয়েরা যোগ্য স্বামী আর ছেলেরা চাকরি পাবার জন্য ইংরেজি শেখে—একথা অংশত সত্য হলেও ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার ভূমিকা ওইটুকুতেই সীমিত—এটা অবশ্য যথেষ্ট বিতর্কসাপেক্ষ হয়ে উঠেছিল। দেশে উনিশ-বিশ শতকে সাংস্কৃতিক আলোড়নে ইংরেজি শিক্ষার যে এক মস্ত ভূমিকা ছিল, সে-কথা গান্ধীজির চিন্তায় উপেক্ষিত হয়েছিল বলে কবির তো বটেই, অন্য অনেকের কাছেও, মনে হয়েছিল। গান্ধীজি অবশ্য তাঁর প্রতিবাদী রচনায় লিখেছিলেন, "I hope I am as great a believer in free air as the great poet. I do not want my house to be walled in on all sides and my windows to be stuffed." গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথকে আরও জানিয়েছিলেন যে, "My religion has no geographical limits. It I have a living faith in it, it will transcend my love for India herself.' বলেছিলেন 'Isolated independence is not the goal of the world states. If is voluntary independence." গান্ধী বিশ্বাস করতেন জাতীয়তাবাদ স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো আদর্শ নয়, তার সম্পূর্ণতা আন্তর্জাতিকতার আশ্রয়ে। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁরও সমালোচনা ছিল পশ্চিম দেশীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যখন তারা সংকীর্ণ, স্বার্থান্ধ, মদমত্ত একক (exclusive) মতাদর্শে আচ্ছন্ন হয় এবং অপরের স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করে। গান্ধীজি দাবি করেছিলেন যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি ভিন্ন। তা কখনো স্বার্থান্ধ একক শক্তি নয়। তাঁর ভাষায়, "There is no limit to extending our service to our neighbours across state-made frontiers."

## ৩.৮ গান্ধীজির আন্তর্জাতিকতার ধারণা

গান্ধীজির দর্শনে মানবধর্ম ও অহিংসার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। কেবল ভারতবর্ষীয় সমাজে নয়, আন্তর্জাতিক বিশ্বে অহিংসার মাধ্যমে মানবধর্মের বিস্তার গান্ধীজির অভিপ্রেত আদর্শ। যুদ্ধকে পরিহার করে বিশ্বশান্তি, সাম্য ও মৈত্রী স্থাপন করা তাঁর রাজনীতির গোড়ার কথা। এই যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ে গান্ধীর বক্তব্য কিন্তু একমাত্রিক ছিল না। একথা বলা অনুচিত হবে যে, গান্ধীজির অহিংসাতত্ত্ব বা যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ছিল সর্বাত্মক বা চরম। বস্তুত তাঁর কর্মজীবনের নানা বাঁকে, নানা ঘটনার মোকাবিলায়, নানা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে অহিংসা ও যুদ্ধ বিষয়ে তাঁর চিন্তার বিচিত্রতা প্রকাশ পেয়েছে। আত্মজীবনীতে (An Autobiography or The story of My Experiments with Truth) তিনি লিখেছেন, "It is quite clear to me that participation in war could never be consistent with Ahimsa. But it is not always given to be equally clear about one's duty. A votary of truth is often obliged to grope in the dark." অর্থাৎ গান্ধীজির কাছে শান্তিবাদ

(pacifism) চরম কোনো মতবাদ নয়। শান্তি ও যুদ্ধবিরোধিতার প্রশ্নে কিংবা অহিংসার ধর্ম প্রতিপালনে বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থাকে মাথায় রাখতে হবে। শান্তিবাদ শর্তহীন মতবাদ নয়, প্রয়োজনে অহিংসাবাদীকেও হিংসার আশ্রয় নিতে হতে পারে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধকে সময় সর্বতোভাবে পরিহার করার মনোভাব দেখা যায়নি গান্ধীজির চিন্তায়। বরং এক দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব ধরা পড়ে তাঁর এই বক্তব্যে : "When two nations are fighting, the duty of a votary of ahimsa is to stop the war. He who is not equal to that duty, he who has no power of resisting war, he who has not qualified to stop war, may take part in the war, yet whole-heartedly tried to free himself, his nation and the world from war." এই দ্বিধাগ্রস্ততাতেই বোঝা যায় গান্ধীজির শান্তিবাদ ছিল শর্তসাপেক্ষ প্রতিবাদ। যে কোনো মূল্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা নয়। ১৯০৪-০৫ সালে সাম্রাজ্যবাদী জারের রাশিয়া যখন অন্যায়ভাবে জাপানকে আক্রমণ করল, গান্ধীজি 'Indian Opinion' কাগজে আক্রান্ত জাপানের প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। অন্যায় যুদ্ধ ও ন্যায় যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য করেছেন তিনি সব সময়েই। যুদ্ধবিরোধীদের উদ্দেশে তিনি একবার বলেছিলেন, "It is open to a war resister to judge between two combatants and wish success to the one who has justice on his side." এই বিশ্বাসের জোরেই তিনি ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে স্পেনের রিপাবলিকানদের যুদ্ধ সমর্থন করেছেন, কিংবা জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চিনাদের সংগ্রামকে অভিবাদন জানিয়েছেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর্বে জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পোলিশদের অকুণ্ঠ সমর্থন জুগিয়েছেন। যুদ্ধ-প্রতিরোধকারীদের সংগ্রামকে, তা সশস্ত্র হলেও, গান্ধীজি ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্বে জার্মানদের বা বলা উচিত হিটলার ও তাঁর নাৎসিবাহিনীর ইহুদিনিধন যজ্ঞকেও তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করিছেলেন গান্ধীজি। তিনি হরিজন পত্রিকায় জানিয়েছেন, " My sympathies are all with the Jews' কারণ "the German persecution of the Jews seems to have no parallel in history." হিংসা ও যুদ্ধবিরোধী হলেও ন্যায় যুদ্ধের ধারণা তিনি পোষণ করতেন এবং লিখেছেন, "If there could be a justifiable war in the name and for himanity, a war against Germany, to prevent the wanton prosecution of a whole race would be completely justified."

১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোসিমা-নাগাসাকিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমা নিক্ষেপ করলে ওই বীভৎস ঘটনার বিরুদ্ধে বিশ্বের সমস্ত শান্তিকামী মানুষ তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। গান্ধীজি গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন, বলেছিলেন "War knows no law except that of might".

ভারতের স্বাধীনতার লগ্ন থেকেই পাক-ভারত সীমান্ত সমস্যার অন্ত ছিল না। সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়াল কাশ্মীর নিয়ে। কাশ্মীরকে রক্ষা করার জন্য ভারত সরকার যখন সশস্ত্র ফৌজ পাঠালেন কাশ্মীরে

মহারাজা হরি সিংকে সাহায্য করার জন্য, গান্ধীজি সরকারের এই যুদ্ধনীতিকে সমর্থনই করেছিলেন। গান্ধী-সমালোচকবর্গ এ-বিষয়ে গান্ধী বিষয়ে যথেষ্ট মুখর হলেও গান্ধীজি কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি প্রয়োগে আপত্তি করেননি। গান্ধীজি আন্তর্জাতিক বিবাদ কলহ যুদ্ধবিগ্রহের মীমাংসার ক্ষেত্রে বরাবরই অহিংসার কথা বলেছেন, শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনা ও অহিংসা পদ্ধতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু প্রয়োজনে ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বলপ্রয়োগধর্মী উপায়গুলিকে সর্বতোভাবে বর্জন করেননি। সেটা বিভিন্ন বিষয়ে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। এটাকে বোধহয় গান্ধীনীতিতে স্ববিরোধের সমস্যা বলে চিহ্নিত করা উচিত নয়। কারণ ন্যায় যুদ্ধ ও অন্যায় যুদ্ধের মধ্যে এক বিভাজন রেখা গান্ধীজির রাজনৈতিক দর্শনে বরাবরই স্থান পেয়েছে। তাই তাঁকে নিছক বা চরম (absolute) শান্তিবাদী চিন্তক বলে সাব্যস্ত করা উচিত হবে না। তাঁর আন্তর্জাতিকতাকে জাতীয় স্বার্থের পরিপূরক শক্তি বলেই গণ্য করতে হবে।

## ৩.৯ সহায়ক পাঠ

১. ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : Evolution of the political Philosophy of Gandhi, Calcutta Book House 1969.

২. নির্মল কুমার বসু : Studies in Gandhism, Indian Associated Publishing. 1962

৩. শিবাজীপ্রতিম বসু : The Poet and the Mahatma, Engagement with Nationalism and Internationalism, progressive Publishers, 2009

## ৩.১০ প্রশ্নের নমুনা

### ৩.১০.১ বড় ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১. মহাত্মা গান্ধীর জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তিগুলি ব্যাখ্যা কর।

২. গান্ধীজির জাতীয়তাবাদী মতাদর্শে তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

৩. জাতীয়তাবাদকে ঘিরে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের বিতর্কের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

৩. গান্ধীজির ধারণায় আন্তর্জাতিকতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

৪. গান্ধীজির ধারণায় আন্তর্জাতিকতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

### ৩.১০.২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গান্ধীজির দর্শনে অহিংস সত্যাগ্রহের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

২. গান্ধীজি কি নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক?

৩. গান্ধীজির অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের চিন্তা ব্যাখ্যা কর।

### ৩.১০.৩ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

কোন্ কথাটি ঠিক?

১. দ্বিধাহীন ভাবে গান্ধীজি নেশন রাষ্ট্রের সমর্থক ছিলেন/ছিলেন না।

২. গান্ধীজির চিন্তায় ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য বৃহদায়তন শিল্পবিস্তার অবশ্য প্রয়োজনীয়/অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়।

# একক - ৪ □ সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা

## গঠন


৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় জাতীয়তাবাদের বিকাশ

৪.৩ সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের স্বরূপ

৪.৪ সুভাষচন্দ্রের আন্তর্জাতিকতার চিন্তা

৪.৫ সহায়ক পাঠ

৪.৬ প্রশ্নের নমুনা


## ৪.১ উদ্দেশ্য

- সুভাষচন্দ্র কিভাবে জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠলেন, তার সূত্র সন্ধান।
- সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করা।
- সুভাষচন্দ্রের আন্তর্জাতিকতার চিন্তা ব্যাখ্যা করা।

## ৪.২ সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় জাতীয়তাবাদের বিকাশ

১৯২৭ সালে এক বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "পরাধীন দেশে যদি কোনো মতবাদ (ism)-কে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে হয়, তবে তা হল জাতীয়তাবাদ"। সুভাষচন্দ্রের এই বক্তব্য পড়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের অবশ্যই একথা মনে পড়বে যে, জাতীয়তাবাদের আদর্শ বা মতবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে। ইওরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদের মতাদর্শ যেভাবে তৈরি হয়েছে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে তার নির্মাণ প্রক্রিয়া ছিল ভিন্ন। মূলত বিজাতীয় সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেশনের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া হিসেবে জাতীয়তাবাদ সঞ্চারিত হয়েছে ভারতবর্ষের মতো বিভিন্ন পরাধীন দেশে। ঔপনিবেশিক সমাজে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তৈরি হয়েছে কেবল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শানিত অস্ত্র হিসেবেই নয়, দেশজ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস চর্চা করে আত্মগঠনের ভাবনার মধ্য দিয়েও বটে। বৈরিতা, অন্যদিকে স্বজাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নের চিন্তার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও প্রতিষ্ঠা। তার সঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন তো রয়েছেই।

সুভাষ এই দুই দিক থেকেই ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা কেবল প্রত্যক্ষ করেননি, তিনি জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ গড়ে তোলার কাজে প্রবলভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে তাঁর অবস্থান ইতিহাসের সর্বোচ্চ সারিতে। তাঁর স্বদেশপ্রেমের গভীরতা বোঝাতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধী একবার বলেছিলেন, সুভাষ 'Patriot of patriots'। ছাত্রাবস্থা থেকে শুরু করে আজাদ হিন্দ ফৌজ আন্দোলন গড়ে তোলা পর্যন্ত তাঁর বীরত্ব, সাহসিকতা, ত্যাগ ও দেশপ্রেম ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিলেতে গিয়ে আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সরকারি চাকরি গ্রহণ করেননি, দেশে ফিরে এসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। স্বদেশকে তিনি মাতৃভূমি বলে বিশ্বাস করতেন এবং এই বিশ্বাসের পিছনে তাঁর অনুপ্রেরণা ছিল বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গানও ছিল তাঁর উদ্দীপনার উৎস। ১৯১৪ সালে সুভাষের বয়স যখন সতেরো — কলেজের ছাত্র — কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সুভাষ গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। দেহ মনে তাদের প্রবল উত্তেজনা যে 'বলাকা'র কবি রবীন্দ্রনাথের মুখে উদ্দীপনাময় কথাবার্তা শুনবেন। তবে সেটা ছিল নিতান্ত কল্পনা, কবি কী বলবেন তা তাঁদের জানা ছিল না। ১৯৩৮ সালে কলকাতায় শ্রীনিকেতন শিল্পভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসবে সুভাষচন্দ্র তার বক্তৃতায় বলেছিলেন, "যখন আমরা কবির কাছে যাই তখন তিনি কি সম্বন্ধে আমাদের বলিবেন তাহার কোনো ধারণা আমাদের ছিল না। প্রথমটা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বাঙলার ভাবপ্রবণ যুবকদের কাছে কেন, তিনি নীরস পল্লীগঠনের কথা বলিতেছেন, সত্য কথা বলিতে কি, তখন আমরা কোন প্রেরণা বোধ করি নাই, তাহার পর হইতে যতই দিন কাটিতে লাগিল ততই অনুভব করিতে লাগিলাম যে, বাস্তবিক তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মূল্য কতখানি।"

বস্তুত রাজনীতি, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দেখার ভঙ্গির সঙ্গে যে সেই সময়কার স্বাদেশিক নেতাদের চিন্তার ধরনে এক বড়ো পার্থক্য ছিল, সেকথা সুভাষচন্দ্রের এই বিবৃতির মধ্যে ধরা পড়ে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের চাইতে সমাজগঠনের দর্শন রবীন্দ্রনাথের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর রাজনীতির সারার্থ ছিল ব্যক্তির ও জাতির আত্মশক্তির বিকাশ। ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াই কবির কাছে মুখ্য বিষয় ছিল না। সুভাষচন্দ্রদের কাছে স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরুত্ব ছিল প্রাথমিক এবং মুখ্য। সমাজগঠন, জাতিগঠন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তা সম্ভব নয় রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে না পেলে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল ধারা হিসেবে এই শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল প্রবল এবং প্রধান ধারা।

স্বভাবতই ১৯২১ সালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের অংশগ্রহণ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মনে রাখতে হবে যে, স্বপ্নের চাকরি আই সি এস বৃত্তি পরিহার করে ১৯২১-এর ১৬ জুলাই সুভাষ দেশে ফিরে এলেন এবং বোম্বাই বন্দরে নেমে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি বোঝার চেষ্টা করেন। কিন্তু গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনা করে তিনি কোনো স্পষ্ট ধারণা পাননি, বরং তাঁরই পরামর্শে সুভাষচন্দ্র কলকাতার প্রখ্যাত নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দেখা করে আন্দোলনে

সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। এই আন্দোলনের সময়কালেই সুভাষ জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত হন, তাঁদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। ১৯২২ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসে যোগদানের জন্য তিনি আমন্ত্রণও পেয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি তিনি পাননি। সে যাই হোক, ১৯২২-এ চৌরিচৌরার ঘটনার পর গান্ধীজি যখন অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন, দেশের অধিকাংশ নেতাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রও গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রবল সমালোচনা করেছিলেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ ও মোতিলাল নেহরু কংগ্রেস দলের মধ্যেই স্বরাজ্যদল গঠন করলেন। সুভাষ চিত্তরঞ্জনের সহযোগী হিসেবে এই কার্যক্রমে যোগ দিয়েছিলেন এবং অতি দ্রুত জাতীয় নেতৃত্বের স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ১৯২৮ সাল সুভাষের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্বপ্রদান, জওহরলাল নেহরুর সহায়তায় 'ইন্ডিপেন্ডেন্স ফর ইন্ডিয়া লিগ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও যুগ্ম-সম্পাদক পদে বৃত হওয়া, জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জেনারেল-অফিসার-কমান্ডিং-এর দায়িত্ব সফলভাবে পালন করা এবং বাংলার যুবসমাজের নেতা হয়ে ওঠা এই ১৯২৮ সালের ঘটনা। কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই সুভাষ গান্ধীজির প্রস্তাবিত ডোমিনিয়ন স্টেটাসের নীতির বিরুদ্ধে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নিয়ে আসেন, যদিও সে-প্রস্তাব তিনি পাস করাতে পারেননি। ১৯৩৩ সালে গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করলে সুভাষ ভিয়েনা শহর থেকে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন এবং কংগ্রেসের কর্মপন্থার আমূল পরিবর্তন ও নতুন নেতৃত্বের দাবি তুলেছিলেন। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তৈরি হল কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি নামে এক মঞ্চ। আচার্য নরেন্দ্র দেবের নেতৃত্বে জয়প্রকাশ নারায়ণ, মিনু মাসানি, এন জি গোরে, নামবুদ্রিপাদ প্রমুখ তরুণ নেতারা ছিলেন এই মঞ্চের উদ্যোক্তা। জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের দর্শন ছিল এঁদের মতাদর্শ। সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এই সমাজবাদী মঞ্চের গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন এবং বাইরে থেকে মদত দিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালের শেষ দিকে গান্ধীজির ইচ্ছানুসারে সুভাষচন্দ্রকে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে অভিষিক্ত করার প্রস্তাব আসে এবং ১৯৩৮ সালের জন্য তিনি সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। এই বছরেই কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বললেন, জাতীয় কংগ্রেসকে ব্যাপকতম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির সুযোগ গ্রহণ করে বৃহত্তর জাতীয় সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। হরিপুরা অধিবেশনের বক্তৃতায় সুভাষ তাঁর সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক যোজনার মাধ্যমে দেশের আর্থিক উন্নয়নের চিন্তাও ব্যক্ত করলেন। তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হয় এবং সুভাষের চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মে গান্ধীজি এবং কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃবর্গ খানিকটা ভীত হয়ে পড়েছিলেন। এবং ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে তিনি দ্বিতীয়বার সভাপতিপদে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও গান্ধী অনুগামী সদস্যদের অসহযোগিতার কারণে তাঁকে ইস্তফা দিতে হয়। এবং তাঁকে তিন বছরের জন্য জাতীয় কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র গঠন করলেন ফরওয়ার্ড ব্লক এবং তাঁর কর্মপন্থায় জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের এক সমন্বিত রূপ প্রকাশ পেল। ১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলন শুরু হয় এবং প্রবল জাতীয়তাবোধের এই বিদ্রোহে তাঁকে আবার কারারুদ্ধ হতে হল। সুভাষ জেলের অভ্যন্তরে

অনশন আন্দোলনে ব্রতী হলে তাঁকে সরকার স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখলেন। এর পরেই ঘটল তাঁর ঐতিহাসিক মহানিষ্ক্রমণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অরাজক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য বার্লিনে 'ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৯৪২ সালে সুভাষ জার্মান একনায়ক হিটলারের সাহায্য চান ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের জন্য। ওই মুহূর্তে অবশ্য হিটলার সুভাষচন্দ্রের আবেদনে সাড়া দিতে পারেননি। এরপরেই শুরু হয় গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো বা অগস্ট আন্দোলন। সুভাষ আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র থেকে এই আন্দোলনের সপক্ষে তাঁর মত ঘোষণা করলেন এবং আন্দোলনের জন্য বিস্তারিত কর্মসূচি ব্যাখ্যা করলেন। জার্মানির সাহায্য না পেয়ে সুভাষচন্দ্র জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্রিটিশ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং ১৯৪৩-এর ২১ অক্টোবর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই আজাদ হিন্দ বাহিনী ব্রিটেন ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আইনমাফিক যুদ্ধও ঘোষণা করেছিলেন। জাপান, জার্মানি, ইতালি, নানকিং, ফিলিপিন্স, থাইল্যান্ড, বার্মা ইত্যাদি সরকারগুলির কূটনৈতিক স্বীকৃতিও পেয়েছিল আজাদ হিন্দ সরকার। ক্রমে জাপানের সহযোগিতায় আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছে যায় আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং তার সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারিতে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান দপ্তর স্থানান্তরিত হয় রেঙ্গুনে (বার্মা)। কিন্তু এই বছরের শেষের দিকে যুদ্ধের গতি মিত্রপক্ষের অনুকূলে চলে আসে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের দুটি শহরে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে ১৯৪৫ সালের অগস্টে। জাপান আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। আজাদ হিন্দ বাহিনীকেও পশ্চাদপসরণ করতে হয়। ১৯৪৫-এর ১৮ অগস্ট সুভাষ টোকিও-র উদ্দেশে রওনা হন, কিন্তু কয়েকদিন বাদে টোকিও বেতারে ঘোষিত হয় যে বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের জীবনাবসান ঘটেছে। এই মৃত্যুর খবর নিয়ে তখন থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত। এখনও পর্যন্ত সে-বিতর্ক অব্যাহত।

## ৪.৩ সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের স্বরূপ

রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত থেকেই সুভাষ প্রখর জাতীয়তাবাদী। গান্ধীজির অহিংস পন্থার চাইতে সশস্ত্র বিপ্লবপন্থার প্রতি তাঁর ঝোঁক বরাবরই প্রবল। বিপ্লবপন্থী গুপ্ত আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। আর তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রাম তো সরাসরি যুদ্ধের পর্যায়েই পড়ে।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সুভাষের আপসহীন জাতীয়তাবাদী বিরোধিতার নানা দিক রয়েছে। রাজনৈতিক ভাবে তাঁর সংগ্রাম কখনো গান্ধীর নেতৃত্বকে স্বীকার করে নিয়ে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের আন্দোলন অনুসরণ করে। কখনো-বা প্রত্যক্ষ যুদ্ধের ঘোষণা করে। দুইয়ের পিছনেই ছিল প্রবল জাতীয়তাবাদের মন্ত্র। এরই পাশাপাশি সুভাষের জাতীয়তাবাদের এক অর্থনৈতিক দৃষ্টি ছিল। এশিয়া-আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীদের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক শোষণের রূপ বিশ্লেষণের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের নজর ছিল ছাত্রজীবন থেকেই। নওরোজি, রাণাডে, রমেশচন্দ্র দত্তের বিশ্লেষণের ধারা বিষয়ে সুভাষচন্দ্র যেমন অবহিত ছিলেন, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বিশ্বঅর্থনীতির প্রকৃতি বিষয়েও তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের পর সুভাষ নানারকম গঠনমূলক আন্দোলনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বস্তুত কংগ্রেসে যোগ দেবার

আগে থেকেই সুভাষ বিশ্বাস করতেন যে, স্বাধীনতার লড়াই কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, আত্মগঠনের জন্য, স্বদেশকে চিনবার জন্য, জাতিগঠনের জন্য চাই বিশেষ বিশেষ গঠনাত্মক কার্যক্রম। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার আগে তিনি চিত্তরঞ্জন দাশকে চিঠিতে জানাচ্ছেন যে, কংগ্রেসের উচিত তার কর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন বিভাগ তৈরি করা যাতে সমাজে শিক্ষার বিস্তার, জনসচেতনতার বিস্তার, সমাজসেবা ও নানা প্রকার গবেষণামূলক প্রকল্প তৈরি করা হয়। সুভাষ নিজেও এরকম কিছু কিছু প্রকল্পের দায়িত্ব নিতে চান। তিনি চিত্তরঞ্জনকে লিখে ছিলেন, "আপনি অবশ্য বলিতে পারেন যে Congress এখন existing order ভাঙ্গিতে ব্যস্ত, সুতরাং ভাঙার কাজ সম্পূর্ণ না হইলে constructive কাজ আরম্ভ করা অসম্ভব, কিন্তু আমার মনে হয় যে, এখন থেকেই ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের যে-কোনও সমস্যা সম্বন্ধে একটা policy ঠিক করিতে গেলে অনেক দিনের চিন্তা এবং গবেষণা চাই। সুতরাং এখন থেকেই গবেষণা আরম্ভ করা দরকার। কংগ্রেস যদি complete programme প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে যেদিন আমরা 'স্বরাজ' পাইব সেই দিন কোন বিষয়ে কোন policy -র জন্য আমাদের ভাবিতে হইবে না।" সুভাষের 'তরুণের স্বপ্ন' বইটির মধ্যে একরকম আরও বহু গঠনাত্মক প্রয়াসের বিবরণ ও তথ্য আছে। ১৯২০ থেকে ১৯৩০-এর দশকের বিভিন্ন বক্তৃতাতেও সুভাষ স্বদেশের আর্থিক কাঠামোর উন্নয়নের জন্য কংগ্রেস কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছেন। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির আসন থেকে সুভাষচন্দ্রের যে-অভিভাষণ, তার দীর্ঘ অংশ জুড়ে ছিল গঠনমূলক জাতীয়তাবাদের কথাবার্তা। তিনি এই ভাষণে কংগ্রেসের নেতৃত্বে সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক যোজনার সাহায্যে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। এবং একটি প্ল্যানিং কমিটিও তৈরি করেছিলেন। পণ্ডিত নেহরু ছাড়া এই কমিটি গঠনে এবং দেশে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। ১৯৩৯ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের পরেও সুভাষচন্দ্র যে করণীয় কর্তব্যগুলির কথা জানিয়েছিলেন, তার মধ্যেও ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়সমূহ।

সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ ছিল এক অখণ্ড বহুমাত্রিক দেশ। ধর্ম, ভাষা, জাতপাত, আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিপুল বৈচিত্র্য এই ভারতবর্ষে। জাতীয়তাবোধ নির্মাণ করতে হলে এই বহু বিচিত্রতার মধ্যে এক ঐক্যবোধ সঞ্চার করা জরুরি। সুভাষ ওই ঐক্য রচনার জন্য জাতীয় কংগ্রেসকে এক বড়ো হাতিয়ার বলে মনে করতেন। ধর্ম ও জাতপাতে বিন্যস্ত ভারতবর্ষীয় সমাজে বিবিধের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা এক কঠিন কাজ। কিন্তু ওই ঐক্যের সাধনাই সুভাষের কাছে জাতিগঠনের সর্বপ্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল। ধর্মবোধকে হাতিয়ার করে বীর সাভারকার যে জাতীয়তার আন্দোলনে ব্যাপৃত ছিলেন কিংবা জাতপাতের বৈষম্যে ক্লিষ্ট অবদমিত দলিতদের সংঘবদ্ধ করে আম্বেদকর যে বর্ণহিন্দুবিরোধী সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠন করেছিলেন, সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন তার বিপরীত মার্গে ছিল। তিনি চাইতেন এক কম্পোজিট জাতীয়তাবাদী ঐক্য। যেখানে ধর্ম-ভাষা-আঞ্চলিকতা-জাতি (race)—জাতপাত ইত্যাদির মধ্যে কোনো ভেদবুদ্ধি থাকবে না, এক ভারতীয়ত্বের বোধ যেখানে গড়ে উঠবে।

হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা নয়, তাদের মধ্যে ঐক্য তৈরি করাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। দেশত্যাগ করার পর জার্মানিতে ইন্ডিয়ান লিজিয়ন যখন গড়ে তুললেন তিনি, বা পরে পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তোলার সময় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা যাতে কোনপ্রকার ইন্ধন না পায়, তারজন্য সতত তৎপর ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করাই ছিল মহান ব্রত। দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য তিনি গান্ধী এবং অন্যান্য জাতীয় নেতাদের কাছে বারংবার আবেদন জানিয়েছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বাধিনায়ক হিসেবে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় সেনা ও কর্মীদের মনোবল শক্ত করার জন্য যে জাতীয়তাবাদী স্লোগান তৈরি করেছিলেন তার ভাষা ছিল উর্দু—ইত্তেফাক (ঐক্য), ইত্তেমাদ (বিশ্বাস), কুরবাণী (আত্মত্যাগ)। বোঝাই যাচ্ছে যে, সম্প্রদায়গত রাজনীতি ও সংস্কৃতির উর্ধ্বে থেকে সুভাষচন্দ্র এক অখণ্ড ভারতীয়ত্ব নির্মাণে সচেষ্ট ছিলেন।

## ৪.৪ সুভাষচন্দ্রের আন্তর্জাতিকতার চিন্তা

উগ্র স্বাজাত্যাভিমান প্রকৃত জাতীয়তাবাদ নয়, এমনই মনে করতেন সুভাষচন্দ্র। সুস্থ ও পরমতসহিষ্ণু জাতীয়তাবোধের মাধ্যমে পৌঁছতে হবে আন্তর্জাতিকতায়—এটাই ছিল তাঁর ঐকান্তিক বাসনা। ১৯৪৩ সালে যখন তিনি ভারতের বাইরে থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নতুন রূপ তৈরির চেষ্টায় মগ্ন সেই সময় বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সম্মেলনে তিনি আমন্ত্রিত হন এবং তাঁর ভাষণে যে কথাগুলি বলেছিলেন তার মধ্যে ছিল এরকম এক অংশ : "প্রকৃত আন্তর্জাতিকতা জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করে না, বরং সুস্থ জাতীয়তাবাদের মধ্যেই নিহিত থাকে প্রকৃত আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি, আর ভ্রান্ত আন্তর্জাতিকতা দাঁড়িয়ে থাকে জাতিসমূহের নিজস্ব সত্তাকে অস্বীকার করে। লক্ষণীয় হল, এই ব্যাপারে রঁমা রলাঁ, ল্যাস্কি, জিমারম্যান প্রমুখ ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ এবং বিবেকানন্দ, অরবিন্দ প্রমুখ ভারতীয় মনীষীগণ মনে করতেন 'The road to internationalism lies through nationalism', অবশ্য জাতীয়তাবাদকে উগ্র স্বাজাত্যাভিমান পরিত্যাগ করে হতে হবে সুস্থ ও পরমত সহিষ্ণু।" এই সম্মেলনের ভাষণে সুভাষচন্দ্র এক বৃহৎ এশিয়াব্যাপী যুক্তরাষ্ট্র বা 'Pan-Asian Federation' গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন।

সুভাষ তাঁর ভাষণে আরও বলেছিলেন যে, প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যে বিশ্বজনীনতা এক স্বতঃস্ফূর্ত উপাদান। হিন্দুসভ্যতা সকলকে ধারণ করতে শেখায়, বর্জনের বিরোধী। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল চিন-জাপানের দিকে, সমগ্র এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ছিল বুদ্ধের শান্তিবার্তা ও মোক্ষের বাণী। মধ্যযুগে পশ্চিম এশিয়া থেকে এল ইসলাম, ভারতবর্ষ তাকেও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে তার যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তা ছিল ভ্রান্ত, কেননা আন্তর্জাতিকতা পরজাতিসমূহের স্বাধীন আশা-আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট করে না, দমনও করে না। বস্তুত আন্তর্জাতিকতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, জাতীয়তাবাদকে অবজ্ঞা না করে পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমাজ গড়ে তোলা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মিত্রশক্তির বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনের চিন্তাভাবনা শুরু করেছিল। সুভাষচন্দ্র তাঁর বক্তৃতায় ইঙ্গিতে সেই উদ্যোগকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁর ভাষণে আছে, ‘‘আজ আমাদের বিশ্বাস জন্মেছে বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়াসহ সমৃদ্ধ অঞ্চলের জন্য এক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মতো সংগঠন যদি আমরা গড়ে তুলতে পারি তাহলেই জাতিসমূহের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠন করা সম্ভব।’’ প্যান এশিয়ান সংগঠন গড়ে তোলার সময় এটাও খেয়ালে রাখতে বলেন সুভাষচন্দ্র যে, তা যেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভিয়েনা কংগ্রেসের মতো দুর্বৃত্তদের আখড়া না হয়ে ওঠে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রকৃত সখ্য গড়ে উঠলে এবং এশিয়া-আফ্রিকার উপনিবেশগুলির মধ্যে ঐক্যবোধ তৈরি হলে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে লড়াই করার পথও মসৃণ হবে।

টোকিও ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের কাছে ভাষণ (নভেম্বর ১৯৪৪) দিতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, ‘‘আন্তর্জাতিকতা একটি অবশ্য কাম্য আদর্শ’’ আর ‘‘স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও পারস্পরিকতার ভিত্তিতেই আমরা একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনগড়ে তুলতে পারি.....শূন্য থেকে হঠাৎ কোনো আন্তর্জাতিক সংগঠন স্থাপন করা এবং তাকে সফল করা কঠিন। ....একটি আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রক্রিয়াই ক্রমশ একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার একমাত্র উপায়।’’

সুভাষচন্দ্রের আন্তর্জাতিকতার চিন্তায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা ছিল। তিনি জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামে আন্তর্জাতিক প্রচারের গুরুত্বের কথা বলতেন। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ভাবমূর্তিকে সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য ইওরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে জাতীয় কংগ্রেসের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি রাখা প্রয়োজন। তাঁর ভাষণে ছিল, ‘‘......আমরা এতকাল মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাকে অবহেলা করে এসেছি, অথচ ভারত সম্পর্কে তারা গভীরভাবে আগ্রহী। আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাজ করছে এমন সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপৃত ভারতীয় বণিকসভা ভারতের আন্তর্জাতিক সংযোগ বৃদ্ধির কাজে কংগ্রেসের সহায়তা করতে পারে। এছাড়া, ভারতীয়দের অবশ্য কর্তব্য হবে প্রতিটি আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে বা সম্মেলনে যোগদান করা। এইসব সম্মেলনে অংশগ্রহণের ফলে ভারতের পক্ষে যে প্রচার হয় তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সুস্থ।’’

সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ছিল, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার জন্য এই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন নয়। ভারতবর্ষের সুবিশাল সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্য প্রচারের জন্য এই সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ। এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যথাযথ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে ভারতবাসীর স্বাধীনতার দাবি বিশ্বসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

১৯৪২ সালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জটিলতাকেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে কাজে লাগাবার কথা ভেবেছিলেন সুভাষচন্দ্র। বিশ্বযুদ্ধের আবর্তে জার্মানি ও জাপানের সাহায্য নিয়ে ব্রিটিশদের মোকাবিলা করা যেমন ছিল এক রাজনৈতিক কৌশল, তেমনি ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিকে ব্যবহার করে সোবিয়েতের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কৌশলও তাঁর অভিপ্রেত উদ্দেশ্য ছিল।

জার্মানি ও জাপানের সঙ্গে মৈত্রীভাব তৈরির কারণে সুভাষচন্দ্রকে সমালোচনা শুনতে হয়েছিল যে, তিনি ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের প্রতি আসক্ত। কিন্তু এই সমালোচনা যথেষ্ট যুক্তিসহ নয়, ১৯৩৬ সালের ২৪ মার্চ জার্মান অ্যাকাডেমি ফর ফরেন রিলেশনস-এর অধিকর্তা ড. ফেলডারের কাছে সুভাষচন্দ্র একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমি এক জাতির ওপর অন্য জাতির আধিপত্যের নীতি মানি না.....জার্মান জাতীয়তাবাদ জাতিপ্রাধান্য ও স্বার্থপরতার দ্বারা অনুপ্রেরিত হচ্ছে দেখে আমি খুব বেদনা অনুভব করছি।' চিঠিতে ব্যক্ত এই মনোভাব থেকে বোঝা যায় যে সুভাষচন্দ্র উগ্র জাতীয়তাবাদ বা হিটলার-মুসোলিনির আগ্রাসী জাতীয়তাবাদকে কখনোই প্রশ্রয় দেননি। তাঁর অভিপ্রেত জাতীয়তাবাদ অন্য জাতিকে পীড়ন করার অস্ত্র নয়, অপরাপর জাতিসমূহের সঙ্গে সখ্যস্থাপনের সহায়ক শক্তি। এই পথেই জাতীয়তাবাদের চর্চা করতে হবে।

## ৪.৫ সহায়ক পাঠ


১. সুভাষচন্দ্র বসু : নির্বাচিত ভাষণ সংগ্রহ (১ম খণ্ড), লোকমত প্রকাশনী, ১৯৯৬

২. সুভাষচন্দ্র বসু : তরুণের স্বপ্ন, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০-সংস্করণ।

৩. অশোককুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩, [অশোক মুখোপাধ্যায়ের সুভাষচন্দ্র বিষয়ে আলোচনা।]


## ৪.৬ কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা

### ৪.৬.১ বড় ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১. সুভাষচন্দ্র বসুর জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও কর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ কর।

২. সুভাবচন্দ্রের আন্তর্জাতিক চিন্তার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

### ৪.৬.২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় গঠনাত্মক স্বদেশির ধারণা কি ছিল?

২. সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ আন্দোলনের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

### ৪.৬.৩ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

কোন্ কথাটি ঠিক?

১. গান্ধীজির মতো সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণ অহিংসাবাদী ছিলেন/ছিলেন না।

২. কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য ছিলেন/ছিলেন না সুভাষচন্দ্র।

# পর্যায় : তিন (Module - III)

## সমাজতন্ত্র

# একক -১ ❑ স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা

## গঠন :

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও জীবনদর্শন

১.২ বিবেকানন্দ কি ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রী ?

১.৩ মার্কস ও বিবেকানন্দ

১.৪ বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রের প্রকৃতি

১.৫ সারাংশ

১.৬ অনুশীলনী

১.৭ সহায়ক পাঠ

## উদ্দেশ্য

এই একক নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করেছে।

- বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ।
- বিবেকানন্দ ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রী কি না সে বিষয়ে বিতর্কের অবতারণা ও বিশ্লেষণ।
- মার্কস ও বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক ভাবনার সাযুজ্য ও পার্থক্য।
- বিবেকানন্দর প্রস্তাবিত সমাজতন্ত্রের প্রকৃতির উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণ।

## ১.০ সূচনা

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বাঙলা তথা ভারতের আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের উদগাতা এবং বিপ্লবী আন্দোলনের অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস। তাঁর কর্মব্যস্ত জীবন ছিল নরনারায়ণের সেবার আদর্শে নিয়োজিত। তাছাড়া ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাণীকে তিনি পাশ্চাত্যের দরবারে প্রচার করেছিলেন এবং পরাধীন ভারতের মানুষের মনে অভয়মন্ত্র দিয়ে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। শক্তির আরাধনার কথা বলে তিনি লুপ্তবীর্য ভারতের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। রাজনীতির তাগবতের সঙ্গে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ সংশ্রব ছিল না কিন্তু বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের উপরেই বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল অপরিসীম। প্রচলিত অর্থে তাত্ত্বিক বলতে যা বোঝায় তা বিবেকানন্দ ছিলেন না কিন্তু সাম্যের আদর্শের প্রতি

ছিল তাঁর অবিচল প্রত্যয়। সমাজতন্ত্রে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন যদিও তিনি কেবলমাত্র কার্যকারিতার জন্যই এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন। তাকে অবিমিশ্র মঙ্গলের প্রতীক হিসাবে কখনই দেখেননি। মতাদর্শগতভাবে সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর কোন পক্ষপাত ছিল না। বিবেকানন্দ জীবনে আদর্শেরই জয়গান করেছেন, মতাদর্শের নয়। সমাজতন্ত্র সম্পর্কেও তিনি কোন অনড় অবস্থান গ্রহণ করেননি, তথাপি তাঁকে ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রীরূপে কোন কোন বিশেষজ্ঞ গণ্য করে থাকেন। বিবেকানন্দ সমাজতান্ত্রিক তাত্ত্বিক ছিলেন কি না সে প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আর একটি প্রশ্নের খোঁজা উচিত তা হল, বিবেকানন্দকে আদৌ তাত্ত্বিক বলা যায় কিনা? চিন্তানায়ক তাঁকে অবশ্যই বলা যায়, যদিও চিন্তার কোন তাত্ত্বিক কাঠামো তিনি গড়ে তোলেন নি। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে তাঁর কোন নিজস্ব বা অভিনব তত্ত্ব বা চিন্তা ছিল না তবে তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন এবং নানা রাজনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি অকপটে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর রচনাবলী ও বক্তৃতামালা থেকে বিবেকানন্দের চিন্তা জগতের একটি সামগ্রিক রূপরেখা আমরা অঙ্কন করতে পারি। বিবেকানন্দ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না কিন্তু রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি অবশ্যই ছিলেন। মৌলিক তত্ত্বরচনা না করলেও ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে বিবেকানন্দের অন্তর্ভুক্তি অপরিহার্য।

## ১. ১ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও জীবনদর্শন

১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি বিবেকানন্দের জন্ম। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৮১ সালের নভেম্বর মাসে দক্ষিণেশ্বরে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের সান্নিধ্যে আমার পর থেকেই নরেন্দ্রনাথের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। রামকৃষ্ণদেব তাঁকে শিবজ্ঞানে জীবসেবা আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। তার পূর্বে নরেন্দ্রনাথ স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতক হন কিন্তু প্রচুর চেষ্টা সত্ত্বেও কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন প্রসিদ্ধ অ্যাটর্নি কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর নরেন্দ্রনাথের পরিবারে তীব্র অনটন দেখা দেয়। শ্রী রামকৃষ্ণের অনুপ্রেরণা তিনি আধ্যাত্মিক তপস্যায় মগ্ন হন। তাঁর দেহত্যাগের পর নরেন্দ্রনাথ তাঁর গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে বরানগরে শ্রী রামকৃষ্ণমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি ও তাঁর দশজন গুরুভ্রাতা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং নরেন্দ্রনাথ প্রথমে বিবিদিযানন্দ, পরে বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন। নিদারুণ ক্লেশ স্বীকার করে বিবেকানন্দ পরিব্রাজকরূপে ভারত পরিক্রমা করেন। ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সালে তিনি শিকাগোর ধর্মমহাসভায় যোগদান করেন। তাঁর বক্তৃতা শ্রোতামণ্ডলীকে মুগ্ধ করে এবং তাঁর সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী— তাঁকে ধর্মমহাসভার শ্রেষ্ঠ বক্তার স্বীকৃতি এনে দেয়। এরপর বিবেকানন্দ স্বামীজী নামে পরিচিত হন এবং আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বেদান্তের বাণী প্রচার করতে থাকেন। ১৮৯৫ সালের আগস্ট মাসে তিনি ইউরোপ যান এবং প্যারিস ও লন্ডনে প্রচারকার্য শেষে ডিসেম্বরে আবার আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করেন। আবার ১৮৯৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি আবার লন্ডনে আসেন। তাঁর বাগ্মিতার গুণে ইউরোপ ও আমেরিকার অঙ্গ নে ভারতের ভাবমূর্তি নূতনরূপে উদ্ভাসিত হয়। প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা বিপিনচন্দ্র পাল এক চিঠিতে লেখেন যে বিবেকানন্দের প্রভাবে ইংল্যান্ডে অনেকের চোখ খুলছে। লন্ডন থেকে স্বামীজী ভারতের পথে রওনা হন। ১৫ জানুয়ারি ১৮৯০, তিনি কলম্বোতে পৌঁছল।

পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের অবিস্মরণীয় সাফল্য লুপ্তবীর্য ভারতবাসীর হীনমন্যতাকে দূর করে তাদের মনে নতুন করে সাহস, পৌরুষ ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করে। বিদেশে তিনি যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তা ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছিল। ২ মে ১৮৯৭ তিনি রামকৃষ্ণ মিশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। ৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮ বেলুড়ে রামকৃষ্ণমঠ স্থাপিত হয়। ৪ জুলাই ১৯০২ স্বামীজির দেহান্ত হয়। ভারতের নবজাগরণের পথিকৃৎ হিসাবে বিবেকানন্দের অবদান অনস্বীকার্য। তিনিই প্রকৃত দেশপ্রেমের সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলেছিলেন 'দেশপ্রেমিক হও - যে জাতি অতীতকালে আমাদের জন্য এত বহু বহু কাজ করেছে, সেই জাতিকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসো।' তিনি আরো বলেন 'যদি এই পৃথিবীতে এমন কোন দেশ থাকে যাকে পুণ্যভূমি নামে বিশেষিত করা যেতে পারে......যদি এমন কোন দেশে থাকে যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হয়েছে, তবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। সে আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।'

বিবেকানন্দের জীবনদর্শনের কেন্দ্রস্থানীয় নীতি ছিল জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার নারী জাতির জাগরণ, আত্মনির্ভরশীলতা সঞ্চারণ বিদেশের সঙ্গে আদান প্রদান, স্বকীয়তা ও নিজস্বতাকে বিসর্জন না দিয়ে এবং সর্বোপরি আধ্যাত্মিক বিপ্লব। প্রত্যয়জাত উপলব্ধি থেকে বিবেকানন্দ বলেছিলেন ভারতকে সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবে প্লাবিত করার আগে প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত করল। ভারতবাসী প্রথমে.....ধর্ম, তারপর অন্যান্য জিনিস। একই সঙ্গে বিবেকানন্দ ধর্ম নিয়ে কোন আতিশয্যকে প্রশ্রয় দেন নি। তিনি বলেছিলেন 'প্রথমে অন্নের ব্যবস্থা করতে হবে, তারপর ধর্ম।' দরিদ্রনারায়ণের সেবার আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে পুরোহিততন্ত্রের উপর বিবেকানন্দ নির্মম কশাঘাত করেন। এখানেই সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রীরূপে বিবেকানন্দর পরিচয়।

রাজনীতির জগতের সঙ্গে বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষ সংশ্রব এগিয়ে চলেছিলেন কিন্তু বিপ্লবী সমাজের মধ্যে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের প্রখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষকে ঢাকায় সাক্ষাতকালে স্বামীজী বলেছিলেন 'পরাধীন দেশের কোন ধর্ম নেই। তোদের ধর্ম দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্জন করা। যে কোন উপায় ও পন্থা অবলম্বন করে এ কাজ করতে হবে।' তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন 'ভুলিওনা তোমরা জন্ম থেকেই দেশের জন্য বলিপ্রদত্ত।' তিনি বৃন্দাবনের কৃষ্ণের পূজার পরিবর্তে শক্তিপূজার কথা বলে দেশবাসীকে উদ্দীপিত করেন। রাজনৈতিক বিপ্লবের তুলনায় সমাজবিপ্লবের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও বিবেকানন্দের চিন্তায় দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নটি সদা জাগরূক ছিল।'

## ১.২ - বিবেকানন্দ কি ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রী ?

বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রের পক্ষে বক্তব্য পেশ করেছিলেন। সাম্যের আদর্শের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা ছিল। তাঁর পূর্বে কোন ভারতীয় চিন্তানায়ক সমাজতন্ত্রের কথা বলেন নি, সেই কারণেই বহু মার্কসবাদী বিশেষজ্ঞ

তাঁকে ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রী বলে মনে করেন। তাছাড়া বিবেকানন্দ শূদ্র জাগরণের ভবিষ্যদবাণীও করেছিলেন। ১৮৯৬ সালে সিস্টার খ্রিস্টানকে স্বামীজী বলেন 'The next upheaval that is to usher in another era will come from Russia or from China. The world is still in the third epoch under the domination of the vaishya. The fourth epoch will be under that of the shudra'.

তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন ১৯১৭ সালে পেট্রোগ্রোডের দুনিয়া কাঁপানো দশ দিনের ভবিষ্যদ্ বাণী স্বামীজী নির্ভুলভাবে করেছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন 'in so earlys a time, a labour or socialist government anywhere in the West, had been a pious wish only. But with prophetic instinct, he visualized the establishment of the proletarian state of the future. It was he who was the first person in the world to envisage a government of the toiling masses and prophesied about the proletarian culture of the future.'

প্রসিদ্ধ বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে ১৯০১ সালে ঢাকায় স্বামীজী আনগত দিনের শোষনমুক্ত সমাজের ভবিষ্যদবাণী করে বলেন 'হ্যাঁ, সারা পৃথিবী জুড়ে শূদ্রদের অভ্যুত্থান ঘটবে। তোরা দেখতে পাচ্ছিস না, আমি আবরণের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর ঘটনাবলির ছায়া প্রত্যক্ষ করছি। ভগবানের আশীর্বাদে বহু বৎসরের নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই অন্তর্দৃষ্টি আমার মধ্যে এসেছে। তোরা আমার কাছ থেকে একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, শূদ্রের অভ্যুত্থান প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায় এবং তার পরে চিনে। ভারতের অভ্যুত্থান ঘটবে তারপর এবং ভবিষ্যত পৃথিবীতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে ভারত।'

বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক ছিলেন না তবে তাঁর পূর্বে শুদ্ররাজের অভ্যুত্থানের ভবিষ্বদবাণী ভারতবর্ষ থেকে কেউ করেনি। বিবেকানন্দ স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন শূদ্রের প্রাধান্য হইবে। সোস্যালিজম অ্যানার্কিজম, নিহিলিজম প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই কারণেই বিবেকানন্দকে বলেছেন, Patriot - prophet.

## ১.৩ মার্কস ও বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ মার্কসের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা তা নিয়ে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না কারণ তাঁর রচনা ও বক্তৃতার কোথাও মার্কসের নামোল্লেখ নেই। প্রখ্যাত মনীষী রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত মনে করেন যে বিবেকানন্দের মার্কসের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত থাকারই কথা কারণ ১৮৯৩ সালে আমেরিকায় শ্রমিক দল ব্যাপকভাবে সমাজতান্ত্রিক ধারণা প্রচার করেছিল। শিকাগোর ধর্মসভার সময়ও সেখানে শ্রমিক সমাবেশ হয়েছিল এবং এর কয়েক মাস পরে ইউরোপেও শ্রমিক সমাবেশ হয়েছিল বিবেকানন্দ এসব বিষয়ে নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন। তবে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের মতে বিবেকানন্দ যদি মার্কসের কাছে ঋণী থাকতেন তাহলে অবশ্যই তা স্বীকার করতেন। বিবেকানন্দের রচনাবলীর মধ্যে সমাজতন্ত্রের উল্লেখ একাধিক জায়গায় আছে।

"Prince Kropoth in এর সঙ্গে ১৯০০ সালের আগষ্ট মাসে তাঁর পরিচয় হয় প্যারিসে। রাশিয়ায় যাবার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। একথা অনস্বীকার্য যে যে সময় তিনি সর্বহারার বিপ্লবের কথা বলেন তখন প্লোখানভ বা লেনিনের মত মানুষ এ বিষয়ে কোন চিন্তাই করেন নি। মার্কস বলেছিলেন প্রথম সর্বহারার বিপ্লব হবে পশ্চিম ইউরোপে যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শক্তিশালী ছিল। এখানে কিন্তু বিবেকানন্দের ভবিষ্যদবাণী সফল হয়েছিল মার্কসের নয়। প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী রাইবাকভ যথার্থই বলেছেন 'Isnt it a miracle that he had heard the roaring of the coming social and political events of the twentieth century in the slow and serene life of the nineteenth century and had for seen, that the liberation would come from Russia?'

বিবেকানন্দ যদিও শোষিত, নির্জাতিত মানুষের মুক্তির কথা বারে বারে বলেছেন কিন্তু তাঁর চিন্তা সর্বক্ষেত্রে মার্কসের, সমধর্মী ছিল না। রক্তক্ষয়ী হিংসাশ্রয়ী শ্রেণীসংগ্রামের পথকে তিনি পরিহার করেন। তাছাড়া মার্কস যেখানে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী বলে মনে করতেন বিবেকানন্দ সেখানে যুবসমাজকে এই স্থানে বসিয়েছেন। মার্কসের অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদের তত্ত্বকে বিবেকানন্দ অর্থকে একমাত্র শক্তি হিসেবে না ধরে অন্যতম মৌল শক্তি হিসেবে গণ্য করেছিলেন। অর্থনৈতিক চাহিদা তার মতে মানব মনের স্বাভাবিক চাহিদা নয়, একটি সামাজিক ক্রিয়া। মার্কসের একমুখী ব্যাখ্যার জায়গায় বিবেকানন্দ বহুমুখী ব্যাখ্যা দিয়ে সমাজের গতিপ্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। মার্কসের কাছে ধর্ম ছিল জনগণের আফিম (opium of the poor)। বিবেকানন্দেরও ধর্মের ধ্বজাধারীদের শোষণমূলক ভূমিকাকে তীব্র আক্রমণ করে প্রায় মার্কসের ভাষায় ধর্মকে বলেছেন intellectual opium eating । কিন্তু তিনি ধর্মীয় উপাদানকে জাতীয় জীবনের প্রাণকেন্দ্র বলে মনে করতেন। এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন 'The difference between Marx and Vivekananda with respect to religion was fundamental. While Swamiji made a clear water tight compartment between true religion and priestcraft, Marx has made a mess of the two.' আধ্যাত্মিকতা যে ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্বরূপ, বিবেকানন্দ তা সুনিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনিও পুরোহিততন্ত্রকে কশাঘাত করে বলেছেন 'Priestcraft in its nature is cruel and heartless. Religion goes down when, Priestcrafta arises' জনসাধারণের দুর্দশার জন্য বিবেকানন্দ কিন্তু ধর্মকে দায়ী করেননি। তিনি বলেছেন 'তোমাদের ধর্ম তো শেখাচ্ছেন জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মার বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই দুরবস্থার কারণ এই তত্ত্বকে কাজে পরিণত না করা। সহানুভূতির অভাব হৃদয়ের অভাব........সমাজের এই অবস্থাকে দূর করতে হবে সমাজকে নষ্ট করে নয়—হিন্দুধর্মের মানে শিক্ষাকে অনুসরণ করে এবং তার সঙ্গে হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি যে বৌদ্ধধর্ম তার অদ্ভুত সহানুভূতির ভাবকে যুক্ত করে।' এইজন্যই তিনি কুসংস্কার ও ছুৎমার্গের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন।

মার্কসের বিচ্ছিন্নতা বা alienation এর তত্ত্বও বিবেকানন্দের অনুরূপ ছিল না। মার্কসের মতে মানুষ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অমানুষে পরিণত হয় এবং উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিবেকানন্দ বলেছেন যে

শোষিত মানুষ তার প্রকৃত সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় (এখানে বস্তুগত বিচ্ছিন্নতার (material alienation) জায়গায় আধ্যাত্মিক বা আত্মিক বিচ্ছিন্নতা (Spiritual alienation) অগ্রাধিকার পেয়েছে। বিবেকানন্দ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন। তিনি বলেছিলেন Each soul is Potentially divine। মানুষ যখন এই দেবত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তখন তাকে জাগ্রত করার কথা বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছিলেন 'Teach every one has real nature, call upon the sleeping soul and see how it awakes'. মানবচরিত্রে দেবত্ব আরোপ মার্কসের কল্পনার অগোচর ছিল।

## ১.৪ বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রের প্রকৃতি

বিবেকানন্দের কাছে বেদান্তই ছিল শেষ কথা। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তর মতে তাঁর সমাজতন্ত্র ছিল বৈদান্তিক সমাজতন্ত্র। আধ্যাত্মিক প্রমূল্য ছিল তার ভিত্তিস্বরূপ। তিনি সাম্যের আদর্শকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। জাতপাতের ধ্বজাধারী উচ্চ বংশের হিন্দুদের তিনি বলেছেন চলমান শ্মশান। তাঁর ভাষায় 'নতুন ভারত বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুঠির ভেদ করে, জেলে মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে নীরবে সয়েছে - তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে — তাতে পেয়েছে অচল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না। এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই।'

সাম্যের আদর্শের জয়গান করে বিবেকাননাদ বলেছেন 'সদর্পে বল - আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' এই সর্বমানবিকতার আদর্শের উপরেই তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তা গড়ে উঠেছিল। শূদ্রদের তিনি বলেছিলেন ভারবাহী পশু। অস্পৃশ্য অন্ত্যজদের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষের অমানুষিক আচরণকে তিনি বারে বারে ধিক্কার জানিয়েছেন। ভারতের শ্রমজীবী মানুষকে উদ্দীপিত করে বিবেকানন্দ বলেছেন তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন, তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে, আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি - তাদের গুণগান কে করে? আমাদের গরীবরা ঘরদুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুঁজে কর্তব্য করে যাচ্ছে তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশহাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী! তোমাদের প্রণাম করি।'

বিবেকানন্দ শ্রম ও পুঁজির অবশ্যাম্ভাবী সংঘাত ও তার ফলশ্রুতিস্বরূপ। শূদ্র রাজের আধিপত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'Each upper class must dig its own grave'। প্রলেতারিয় সংস্কৃতি শব্দটিও তিনি ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর সমাজতন্ত্র কিন্তু মার্কসীয় সমাজতন্ত্র ছিল না। সমাজতন্ত্রকে তিনি অবিমিশ্র মঙ্গল বলে মনেও করেন নি। তিনি বলেছিলেন 'I am a socialist not because I think it is a perfect

system but because half a loaf is better than no bread.' সমাজতন্ত্রে মানুষের জীবন প্রাণহীন যান্ত্রিকতা পর্যবসিত হয় একথা ব্যাখ্যা করে বিবেকানন্দ বলেছেন "All these things are done by people guided like lifeless machines. There is no mental activity, no unfoldment of the heart no vibration of life, there is no strong stimulation of the will no sign of inventive genins.'

বিবেকানন্দ এমন এক শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন যা সাম্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠাতা ২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৮ তিনি এক চিঠিতে লেখেন যে সমাজতন্ত্র ব্যক্তিকে সমাজের যুপকাষ্ঠে বলিদান করে। ২ ফেব্রুয়ারি ১৯০০, আমেরিকায় এক বক্তৃতায় তিনি বলেন 'You are trying today what you call Socialism! Good things will come, but in the long run, you will be a blight upon the race. Freedom is the watchword. I would rather be doing evil freely, than be doing good under bondage. The Indian people are intensely Socialist. But beyond that, there is a wealth of individualism। এ থেকেই বিবেকানন্দের বৈদান্তিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে মার্কসের জড়বাদী সমাজতন্ত্রের পার্থক্য পরিস্ফুট হয়। মৌলিক স্তরে মার্কসের সঙ্গে বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রের পার্থক্য ছিল এই যে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি আত্মিক প্রমূল্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল যা জড়বাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'Deluge the Country with spiritual ideas' দুর্গত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ হল গণশিক্ষার বিস্তার। বিবেকানন্দ বলেছিলেন— 'Educate and raise the masses and thus alone a nation is possible'. হেমচন্দ্র ঘোষকে তিনি বলেছিলেন 'Dont touchism is the sin of sins that has to go.' ম্লেচ্ছ বলে পৃথিবীতে কেউ নেই। সকলেই ন্যায় পরায়ণ। বিবেকানন্দের বাণী ছিল মানুষ তৈরির বাণী — Man making is my mission of life। নারীজাতিকে তিনি মহাশক্তি মহামায়ারূপে দেখেছিলেন এবং নারী শিক্ষা বিনা সকল শিক্ষাই যে বৃথা, সেকথা দ্বর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি মানুষের সর্বতোমুখী আত্মবিকাশ ও পূর্ণাঙ্গ মুক্তির কথা ভেবেছিলেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্যকে খর্ব করে যে সমাজতন্ত্র সফল হয় না, স্বামীজীর এই চিন্তা কত ক্রান্তদর্শী ও সুদূরপ্রসারী ছিল, পূর্ব ইউরোপে নয়ের দশকে কম্যুনিজমের পতন তা প্রমাণ করে।

## ১.৫ সারাংশ

বিবেকানন্দ যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বলেছেন তা কোন অনড় বা গোঁড়া মতবাদের জায়গা থেকে উৎসারিত হয়নি। তিনি চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন এবং তাঁর ইতিহাস সচেতনতা অত্যন্ত প্রখর ছিল। কিন্তু কোন বাঁধা ধরা তত্ত্বের মোড়কে পুরে নিজের সমাজতান্ত্রিক ভাবনাকে তিনি উপস্থাপিত করেন নি। তিনি জনগণের ক্ষমতা বা Peoples' Power এর কথা বলেছিলেন। দুর্গত, দরিদ্র, শোষিত মানুষকে তিনি আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে তুলতে চেয়েছিলেন। ও তিনি জানতেন যে শুধু উচ্চবর্গের ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আয়ত্ত হয় না, জনশক্তির শাসনক্ষমতা আয়ত্ত না হলে মুক্তির স্বপ্ন অধরা থাকে। মার্কসের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে চিন্তা ও মনোভাবের সাযুজ্য থাকলেও ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেন নি। তাঁর চিন্তা ছিল বহুত্ববাদী বা Pluralist,

একত্ববাদী বা monistic নয়। ভারতে তিনি যে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন তার মধ্যে ছিল আত্মিক স্বাধীনতা। তিনি বলেছিলেন freedom is the song of the soul। স্বামীজী জনশিক্ষার মাধ্যমে সমাজবিপ্লবকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া নারীশিক্ষাকে তিনি অপরিহার্য মনে করতেন। সাম্যের আদর্শ ছিল তাঁর সমাজতন্ত্রের কেন্দ্রস্থল। তিনি সর্বপ্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে দৃপ্তকণ্ঠে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর সমাজবাদ ছিল মানবতাবাদী সাম্যবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। রাশিয়াতে কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী যেমন নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি সমাজতন্ত্রের নেতিবাচক দিকগুলি সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ পরবর্তীকালে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে পূর্ব ইউরোপে কম্যুনিজমের বিপর্যয়ের মধ্যে।

## ১.৬. অনুশীলনী

১. বিবেকানন্দ কি অর্থে সমাজতন্ত্রী ছিলেন বিশ্লেষণ করেন।

২. বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা কি মার্কসের সমধর্মী ছিল? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৩. বিবেকানন্দ কি সমাজতন্ত্রকে সর্বোৎকৃষ্ঠ ব্যবস্থা মনে করতেন? বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করুন।

৪. বিবেকানন্দকে কি ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রী আখ্যা দেওয়া যায়? যুক্তি সহযোগে আলোচনা করুন।

## ১.৭. সহায়ক পাঠ


১. স্বামী বিবেকানন্দ, <u>বাণী ও রচনা</u>

২. স্বামী গম্ভীরানন্দ, <u>চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ</u>

৩. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, <u>বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ</u>

৪. স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, <u>স্বামী বিবেকানন্দ, মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে</u>

৫. Bhupendra Nath Dutt, <u>Swami Vivekananda Patriot - Prophet.</u>

৬. Hiren Mukherjee, <u>Vivekananda and India's Freedom.</u>

৭. স্বামী বিবেকানন্দ, <u>পত্রাবলী</u>

৮. সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, <u>বিবেকানন্দের সমাজদর্শন</u>

৯. R.K. Dasgupta, <u>Swami Vivekananda & Vedantic Socialism.</u>

# একক ২ □ মানবেন্দ্রনাথ রায়— জাতীয়তাবাদ, মার্কসবাদ, নবমানবতাবাদ

## গঠন

১.০. উদ্দেশ্য

১.১. জীবন, কর্ম, চিন্তা

১.২. মার্কসবাদ প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ

১.৩. নব মানবতাবাদে উত্তরণ

১.৪. বিশ্লেষণ ও সমালোচনা

১.৫. সারাংশ

১.৬. অনুশীলনী

১.৭. সহায়ক পাঠ

## উদ্দেশ্য

এই এককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে।

- মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবন ও কর্মের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা।
- জাতীয়তাবাদী থেকে মার্কসবাদে মানবেন্দ্রনাথের রূপান্তর।
- মার্কসবাদ সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।
- চিন্তার বিবর্তনের শেষ পর্য্যায়ে মানবেন্দ্রনাথের নব মানবতাবাদে উত্তরণ।

## ১.০ সূচনা

বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় চিন্তানায়কদের মধ্য যাঁদের প্রকৃত মৌলিকত্ব ছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। নানা বিচিত্র উত্থান পতন ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর জীবন। কোন নির্দিষ্ট ছক বা কাঠামোর মধ্যে তাঁর চিন্তাদর্শনকে বিন্যাস করা অত্যন্ত কঠিন কারণ কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতে মানবেন্দ্রনাথ কখনো অনড় অবস্থান গ্রহণ করেন নি। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সাথে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাও পরিবর্তিত হয়েছে এবং সেই কারণেই এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে যে পরবর্তী পর্যায়ের মানবেন্দ্রনাথের চিন্তা কি তাঁর পূর্ববর্তী চিন্তার নেতিকরণ? প্রথম জীবনে তিনি বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে

দীক্ষিত হন। তারপর মার্কসবাদের প্রতি অনুভব করেন প্রবল আকর্ষণ এবং মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও সংগঠকরূপে পরিচিতি ও স্বীকৃতি অর্জন করেন। শেষ পর্য্যায়ে তিনি এক বিকল্প পথের অনুসন্ধান করেন যা ছিল প্রচলিত মার্কসবাদ ও বামপন্থী চিন্তাধারার বিরোধী। মানবতাবাদ নামে এক স্বকীয় রাজনৈতিক দর্শন উদ্ভাবন করেন তিনি যেখানে ভাববাদের প্রাধান্য থাকলেও পরিবর্তনের ধারণার গুরুত্ব অস্বীকার করা হয়না। এই নবমানবতাবাদ কিন্তু মার্কসবাদকে সম্পূর্ণ বর্জন করেনি যদিও মার্কসবাদ সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের প্রাথমিক প্রত্যয় শেষ পর্য্যায়ে ছিল অনেকাংশে স্তিমিত। তাঁর নবমানবতাবাদ ছিল জাতীয়তাবাদী আবেগ ও মার্কসের সমাজচেতনার সমন্বিত রূপ। মানবেন্দ্রনাথের অনুরাগীবৃন্দ মনে করেন যে নয়ামানবতাবাদী দর্শনই মার্কসবাদের যথার্থ বিকল্প, আবার সনাতনী বামপন্থীরা তাঁকে মার্কসবাদ বিরোধী চিন্তাবিদ আখ্যা দিয়ে তাঁর চিন্তার জগৎকে নস্যাৎ করেন। মূল প্রশ্ন হল এই যে মানবেন্দ্রনাথের নয়ামানবতাবাদ কি মার্কসবাদবিরোধিতায় পর্যবসিত হয়েছিল নাকি একটি ভিন্ন আঙ্গিকে তিনি মার্কসবাদকে ধরতে চেয়েছিলেন? তিনি কি মার্কসবাদের বহুচর্চিত, প্রচলিত ভাবধারার বিরোধিতা করেছিলেন।' সহজ ভাষায়, সত্যিই কি তিনি মার্কসবিরোধী হয়েছিলেন?

## ১.১. জীবন, কর্ম, চিন্তা

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রকৃতনাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ২১ মার্চ ১৮৮৭ সালে তাঁর জন্ম হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অব্যবহিত পরে বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং রাজনৈতিক ডাকাতির মত বেশ কিছু বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট হন। বেশ কয়েকবার তাঁকে কারাবরণও করতে হয়। ১৯১১-১৩ পর্বে যখন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) নেতৃত্বে জার্মানির সহয়তায় ভারতে বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করা হয় তখন মানবেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯১৫ সালে বুড়ি বালামের যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের আত্মবলিদানের পর মানবেন্দ্রনাথ তাঁর অসমাপ্ত কাজকে সম্পন্ন করার জন্য একক প্রচেষ্টায় জার্মানি থেকে অস্ত্রসংগ্রহের আশায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে বার্লিন পৌছবার প্রস্তুতি নেন।

প্রবাসী জীবনযাপনকালে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর জাতীয়তাবাদী সত্তাকে পরিত্যাগ করেন এবং ১৯১৬ সালে সানফ্রানসিসকোয় পদার্পণ করে নিজের পিতৃদত্ত নাম পরিবর্তন করে মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে পরিচিত হন। ১৯১৭ সালে তিনি চলে যান মেক্সিকোতে এবং তার কিছুদিনের মধ্যেই রাশিয়ায় ঘটে ঐতিহাসিক অক্টোবর বিপ্লব। মানবেন্দ্রনাথ মেক্সিকোর প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং মেক্সিকোর সোস্যালিস্ট দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯১৮ সালে। ১৯১৯ সালে লেনিনের উদ্যোগে মস্কোতে কমিনটানের প্রতিষ্ঠা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর সব দেশে কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক স্তরে ত্বরান্বিত করা। ১৯২০ সালের গোড়ায় মানবেন্দ্রনাথ ইউরোপে পাড়ি দেন এবং বার্লিনকে কেন্দ্র করে জার্মান ও হল্যান্ডের কম্যুনিস্ট পার্টির একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯২০ মেক্সিকোর কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিনটার্নের

দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। এখানেই তাঁর সঙ্গে লেনিনের ঐতিহাসিক সাক্ষাত ঘটে এবং লেনিনের ঔপনিবেশিক প্রশ্নের বিষয়ে রচিত মূল দলিলের সঙ্গে সংশোধিত দলিল হিসেবে মানবেন্দ্রনাথের একটি দলিল সংযোজিত হয়। বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ থেকে মার্কসবাদে মানবেন্দ্রনাথের উত্তরণের সূচক ছিল এই ঘটনা। এর পর কমিনটার্নে তাঁর প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে মতবিরোধও শুরু হয় যার ফলশ্রুতি হল ১৯২৯ সালে কমিনটার্নের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ। ১৯২০ সালে যে মানবেন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক প্রশ্নে চমরপন্থার প্রবক্তা ছিলেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনিবার্যতা সম্পর্কে নিঃশংশয় ছিলেন, সেই মানবেন্দ্রনাথ এখন জাতীয়তাবাদের ইতিবাচক দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। ১৯৩০ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন মানবেন্দ্রনাথ এবং দীর্ঘ কারাবাসের পর ১৯৩৬ সালে মুক্তিলাভ করেন।

এই পর্য্যায়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অনুসৃত নীতি অনেকক্ষেত্রে তাঁর মনঃপুত না হলেও তার ভূমিকার গুরুত্বকে মানবেন্দ্রনাথ স্বীকার করে নেন। কিন্তু নেতৃবৃন্দ আপোষকামী মনোভাব তাঁকে হতাশ করে তোলে। ১৯৩৯ সালে তিনি League of Radical Congressmen প্রতিষ্ঠা করেন যা ছিল একধরনের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বিপ্লব, সমাজতন্ত্র, ইত্যাদির সমন্বয়সাধনে উদ্যোগী হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদ সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের পূর্বতর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয় এবং তিনি বিমূর্ত চরমপন্থী মানবতাবাদ বা Radical Humanism এর বিকল্প আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি Independent India Weekly প্রকাশ করেন যা ১৯৪৯ সালে Humanist নামে পরিচিত নয়। ১৯৫৪ সালে মানবেন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই Radical Humanism বা নব মানবতাবাদের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন।

মানবেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের চারটি স্তরকে চিহ্নিত করা যায়, চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ (militant nationalism), মার্কসবাদ, বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ ও নব মানবতাবাদ। যে মতাদর্শ দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল, সে পথে মানবেন্দ্রনাথ কোনদিনই প্রত্যাবর্তন করেন নি। অবশ্য বাঘা যতীন সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা অটুট ছিল। ২৭/২/৪৯ Independent India তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি বলেন 'বালাশোর জঙ্গলের কাহিনী নিঃসন্দেহে নাটকীয়তাপূর্ণ। সেই নাটক সংঘটিত হয়েছিল একজন সুনিপুণ শিল্পীর দ্বারা এবং সেই নাটকে মহাকাব্যের বিশালতাও বর্তমান কিন্তু এমন নাটকটির উপজীব্য হওয়া উচিত নায়কের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব এবং সম্পূর্ণ মানুষটিকে ঘিরে — তাঁর লক্ষ্যভেদের নিপুণতা, সফলতার সঙ্গে আত্মরক্ষাকরা এবং কয়েকটি মাত্র কার্তুজ দিয়ে ঘটনার পর ঘটনা সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিপক্ষের মোকাবিলা দিয়ে নয়'।[১]

## ১.২. মার্কসবাদ প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ

বিশের দশক থেকে ত্রিশের দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত মানবেন্দ্রনাথ কমিনটার্নের মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরূপেই ছিলেন সর্বজনবিদীত। মার্কসবাদী দর্শনকে অবলম্বন করেই তিনি ঔপনিবেশিক প্রশ্নকে বিচার করেন এবং তারই নিরিখে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণাকে বিচার করেন। ১৯২০ সালে লেনিনের ঔপনিবেশিক

থিসিসের পরিপূরক যে থিসিস্ মানবেন্দ্রনাথ পেশ করেছিলেন তার প্রধান বক্তব্য ছিল এই, যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে জাতীয়তাবাদকে আশ্রয় করে লক্ষ্যসাধন সম্ভব নয়। উপনিবেশবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে জাতীয়তাবাদ সহায়ক হলেও যদি এই সংগ্রামের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হয় বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন দেশগুলিতে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্বে, তাহলে জাতীয়তাবাদ এই লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে না। জাতীয়তাবাদের ধারণা বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্যের সঙ্গে যুক্ত, ফলে জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীরা কখনই প্রকৃত সমাজবিপ্লবে আগ্রহী নন। তাঁরা নিজেদের শ্রেণীশাসণ প্রতিষ্ঠার জন্যই জাতীয়তাবাদকে প্রচার করেন যা আপাতদৃষ্টিতে ইতিবাচক হলেও শেষবিচারে নেতিবাচক হয়ে প্রতীয়মান হতে বাধ্য। শ্রেণীদর্শণের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তাবাদের বিকল্প হল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। মানবেন্দ্রনাথের এই বক্তব্যকে লেনিন মেনে নেননি কারণ তাঁর মতে তত্ত্বগতভাবে সঠিক হলেও মানবেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে পশ্চাদপর দেশগুলিতে তখনও কোন সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশ হয়নি এবং সাধারণ মানুষের মনে জাতীয়তাবাদের প্রভাব ছিল বিশাল। সেখানে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে উপেক্ষা করে উপলনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রাম ছিল অকল্পনীয়। এই সময় মানবেন্দ্রনাথ গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেসের আন্দোলনকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে গান্ধিবাদ প্রাচীনপন্থী লোককাঠামো আদর্শরূপে প্রতীয়মান হয়েছিল।

ত্রিশের দশকে মানবেন্দ্রনাথ কমিনটার্নের অতিবাম অবস্থান সম্পর্কে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। তিনি অনুধাবন করেন যে শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদকে সরাসরি প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দেওয়া উচিত নয়। কমিনটার্নের উগ্র নেতিবাচক অবস্থান নেহরু ও সুভাষচন্দ্রের মত নেতাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদে অনুচর আখ্যা দেয় যা মানবেন্দ্রনাথের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। কমিনটার্নের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদে যান্ত্রিক সমালোচনাও তাঁর সঠিক মনে হয়নি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁর পূর্ববর্তী নেতিবাচক মূল্যায়নকে পরিহার করে তাকে সংকীর্ণ সাবেকী জাতীয়তাবাদের পরিমণ্ডল থেকে মুক্ত করে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের মতাদর্শের সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলেন। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর সুভাষচন্দ্র যখন দক্ষিণপন্থীদের সমবেত বিদ্রোহের মুখে পড়ে পদত্যাগ করেন, তখন মানবেন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন গান্ধির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নিজের মনোমত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রের Left Consolidation Committee'র সঙ্গেও মানবেন্দ্রনাথ যুক্ত হয়েছিলেন যদিও সমস্ত বামপন্থী শক্তির ঐক্যসাধনের জন্য সুভাষচন্দ্রের এই প্রয়াস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর মতবিরোধ ও প্রায় চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ ঘটে।

কমিনটার্ন পর্বে মানবেন্দ্রনাথ যখন কট্টর মার্কসবাদী হয়ে উঠেছিলেন তার আবহ যেখানে বিশ্বপুঁজিবাদের পতন ও দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের উত্থানের আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণ। মানবেন্দ্রনাথ অবশ্য মার্কসবাদের ওপর কোন মৌলিক ভাষ্য রচনা করেননি, তিনি মার্কসবাদের ব্যবহারিক দিকটির উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যদিও ভারতবর্ষকে শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে গণ্য করে শ্রমিকশ্রেণীর উপস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়ে এবং কৃষি বিপ্লবের প্রশ্নকে প্রায় অগ্রাহ্য করে সরাসরি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজবিপ্লবের কথা বলে মানবেন্দ্রনাথ অবাস্তব

চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছিলেন তথাপি একথাও অনস্বীকার্য যে তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয় মার্কসবাদী যিনি স্থান কাল পাত্র নিরপেক্ষভাবে মার্কসবাদকে যান্ত্রিকভাবে কোন দেশ বা ঘটনার বিশ্লেষণে প্রয়োগ করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। পরবর্তীকালে 'দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী' অভিধায় ভূষিত হয়ে কমিনটার্ন থেকে তাঁর বিতাড়নের পিছনে এটিই ছিল প্রধান কারণ। এক বিশেষজ্ঞের মতে 'যে অমানবিকতা এবং দলতন্ত্র সোভিয়েত কমিউনিজমকে আবিল করে তুলেছিল এবং মানুষের মঙ্গলের চেয়ে তাকে ব্যবহার করে ক্ষমতার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল, সেই পটপরিবর্তন মানবেন্দ্রনাথকে ব্যথিত, মর্মাহত করেছিল। মানবেন্দ্রনাথের জীবনদর্শন, আত্মজিজ্ঞাসা ও পথসন্ধানের মর্মমূলে এই যান্ত্রিক কম্যুনিজম আঘাত হেনেছিল। তিনি নিজেই বলেছিলেন 'মাত্র ১৪ বছর বয়স থেকে আমি মুক্তির সন্ধানে ব্যাপৃত'। মুক্তির এই আজন্মলালিত স্বপ্ন চরিতার্থের সম্ভাবনা তিনি মার্কসবাদের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের মধ্যে খুঁজে পাননি।

## ১.৩. নব মানবতাবাদে উত্তরণ

মানবতাবাদের চরমপন্থী রূপকে নব মানবতাবাদ আখ্যা দিয়ে মানবেন্দ্রনাথ যে বিকল্পদর্শনে উপনীত হন, তার প্রধান স্তম্ভ ছিল যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও মানবমুক্তি। সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র নির্মাণের যে মডেল অনুসৃত হয়েছিল, তা ছিল বলপ্রয়োগ, মতান্ধতার পরাকাষ্ঠা, মানবতাবাদবিরোধী ও যুক্তিবাদের পরিপন্থী। মার্কসবাদের প্রচলিত ভাষ্যের তীব্র বিরোধিতা করলেও মার্কসবাদের যে মরমী মানবতাবাদ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, তার সম্পর্কে তিনি কোনদিন সংশয়াচ্ছন্ন হননি।

শিবনারায়ণ রায় যথার্থই বলেছেন যে ১৯৪৫ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সহযোগিতায় তিনি যখন The Marxian Way পত্রিকা প্রকাশ করেন তখন তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে মার্কসবাদ যেহেতু একটি পদ্ধতি তাই জ্ঞান ও আবিষ্কারের নূতন দিগন্তের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করতে হবে এবং Radical Humanism হল নূতন মানুষ গড়ার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত মার্কসবাদের সম্প্রসারিত রূপ। সুতরাং মানবেন্দ্রনাথের জেহাদ ও প্রতিবাদ ছিল যান্ত্রিক, অতিসরলীকৃত, একদেশদর্শি মার্কসবাদী ভাষ্যের বিরুদ্ধে। মার্কসবাদের আদি ভাষ্যের যুক্তিসিদ্ধতার লেখমাত্র তিনি সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের মধ্যে খুঁজে পাননি। পার্টিশৃঙ্খলার নামে সেখানে মানুষের স্বাধীন চিন্তা, বিচারবুদ্ধি ও মুক্তি নিষ্পেষিত ও অবদমিত হয়েছিল। সমাজতন্ত্রের নামে মানবতাবাদের এই বিকৃতিকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। প্রত্যয়জাত উপলব্ধি থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সুসম্পর্ক নয়, বিকল্প বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিসিদ্ধ সমাজব্যবস্থার চরিত্র তখনই বৈপ্লবিক হবে যখন তার ভিত্তি হবে মানুষের সচেতন, যুক্তিসিদ্ধ, প্রত্যয়ী মানসিকতা। বৈপ্লবিক সমাজগঠনের অন্যতম শর্ত হল আত্মিক চেতনার স্তরে যুক্তিবাদ। আত্মিক স্তরে নতুন নৈতিকতার প্রয়োজনের কথা তিনি বলেন এবং চেতনা ও মানসিকতার স্তরে নবজাগরণ বা রেনেশাসের ভাবনা নব মানবতাবাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার কেন্দ্রস্থানীয় ধারণাগুলিকে অবলম্বন করেই মানবেন্দ্রনাথের নবমানবতাবাদী দর্শন গড়ে উঠেছিল। যুক্তি ও আবেগ, চেতনা ও বিজ্ঞান মনস্কতার মধ্যে কোন সংঘাত তিনি দেখতে পাননি। তাঁর মতে

আপাতবিরোধী এই ধারণাসমুহ মানবমুক্তির পথকেই প্রশস্ত করে। রোমান্টিকতা ও যুক্তির মধ্যেও কোন বিরোধকে তিনি স্বীকার করেন নি। মননের স্তরে যে বিপ্লবের কথা তিনি বলেছিলেন তা সম্পৃক্ত হয়েছিল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধারণার সঙ্গে যা মার্কসীয় বিচারে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্থনৈতিক কর্মসূচির পরিপূরক। সুতরাং মার্কসবাদের বিশুদ্ধ রূপের সঙ্গে নবমানবতাবাদের কোন বিরোধ ছিল না।

মানবেন্দ্রনাথের নবমানবতাবাদ ইতিহাসকে কেবলমাত্র দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ারূপে দেখেনি। সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উপাদানগুলি অর্থনৈতিক কাঠামো বা substructure এর দ্বারা নির্ধারিত হয়না। ধর্ম সম্পর্কে মার্কসের সমালোচনাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু উদ্বৃত মূল্যের তত্ত্বকে নাকচ করেছিলেন। শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বকেও তিনি খারিজ করেন কারণ প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র অবধারিতভাবেই স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হবে যেখানে মানুষকে জাতি বা শ্রেণীর যুপকাষ্ঠে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে বলি দিতে হবে। একই সঙ্গে মার্কসবাদের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে স্বীকার করে ২৩/১০/৪৯ তিনি Ruth Fischer কে লেখেন 'We cannot entirely turn our back on the ideals which took us so many adventures during a quarter of a century. We cannot disown a spiritual kinship with the Communists not withstanding all their stupidities and misdeeds? Was Marx a fool or a malicious liar when he exposed the hypocrisy of the bourgeois society and the unreality of freedom under parliamentans democracy? Would it be reasonable to cast doubt on the Socialist threories and discard the ideal of social emancipation of the exploited masses because Stalin has betrayed them?' সমরেণ রায় যথার্থই বলেছেন 'নবমানবতাবাদ মার্কসবাদকে তার মানবতাবাদী চরিত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। তিনি মুক্ত চিন্তার দিশারী ছিলেন। মার্কসবাদ তাঁর কাছে ব্রাত্য হয়নি, হয়েছিল স্ট্যালিনের গণতন্ত্র বিরোধিতা। তাঁর নবমানবতাবাদও মার্কসীয় প্রভাবমুক্ত ছিল না কারণ কোন ভাববাদী, নৈর্ব্যক্তিক নীতিজ্ঞানের উপর তাঁর নৈতিকতার ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাঁর মতে নৈতিকতার কোন সর্বজনীন চেহারা নেই, তা নির্ধারিত হয় পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির দ্বারা। তিনি বস্তুবাদী অবস্থানে অনড় ছিলেন। এক সমালোচক বলেছেন সর্বহারার সমষ্টিগত চৈতন্যের নাম করে কম্যুনিস্টরা যেভাবে ব্যক্তিমুক্তিকে হনন করেন, মানবেন্দ্রনাথের সামগ্রিক দর্শন তার বিপ্রতীপ বলেই হয়।' মানবমুক্তির আদর্শ থেকে মার্কসবাদের প্রতিবাদ ছিল অন্ধ মার্কসবাদ বিরোধিতাকে তিনি কোন দিন প্রশ্রয় দেননি।

## ১.৪ বিশ্লেষণ ও সমালোচনা

মানবেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবন নানা পটপরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আবর্তিত, বিবর্তিত হয়েছে। সুদীপ্ত কবিরাজ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'Remarkable Failure in the history of the Indian national movement'. এরজন্য তিনি তাঁর অত্যাধিক ইউরোপ প্রবণতা বা Eurocentrism কে দায়ী করেছেন। অনেকেই মানবেন্দ্রনাথকে অস্থিরচিত্ত দিশাহীন রাজনীতিবিদরূপে চিত্রবায়িত করেন কিন্তু কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ থেকে

তিনি কখনো বিচ্যুত হননি, যেমন বস্তুবাদ, নীতিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, স্বাধীনচিন্তা ও মানবতাবাদ। মানবেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তায় ঘন ঘন পটপরিবর্তন তাঁকে হয়তো কিঞ্চিত অসঙ্গিতপূর্ণ বা inconsistent রূপে প্রতিভাত করে কিন্তু অন্যদিক দিয়ে বিচার করলে এই নমনীয়তা বা flexibility' র মধ্যে বাস্তবধর্মীতা বা pragmatism এর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মানবেন্দ্রনাথের ঘন ঘন অবস্থান পরিবর্তনকে সুবিধাবাদী আখ্যা কখনই দেওয়া যায় না। তাঁর স্মৃতিচারণে (Memoirs) মানবেন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন 'In course of time, experience taught me tolerance and modesty'. তাঁর চিন্তার মৌলিকত্ব নিয়ে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই কিন্তু কেন তাঁর নবমানবতবাদী তত্ত্ব সংগঠিত কোন আন্দোলনের মার্কসবাদকে মানবতাবাদের সঙ্গে সংযুক্ত করতে সচেষ্ট হলেও মানবেন্দ্রনাথের বিকল্প পথ সাধারণ মানুষের মনে তেমন রেখাপাত করতে পারেনি। দীর্ঘকাল ইউরোপে বাস করার কারণে স্বদেশের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়েছিল, দেশে ফেরার পরেও তাকে তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি। জনসাধারণের মধ্যে তাঁর কোন চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা বা Permanent mass base কোনদিনই ছিল না। পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনায় দীক্ষিত ও পরিপুষ্ট মানবেন্দ্রনাথ তাই স্বদেশবাসীর কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পারেন নি, দূরের মানুষই থেকে গেছেন। এই ব্যবধান ঘোচানো সম্ভব হয়নি যেজন্য মানবেন্দ্রনাথের নব মানবতাবাদ প্রকৃত সৃজনশীল সম্ভাবনা সত্ত্বেও চিন্তার স্তরেই সীমাবদ্ধ থেকেছে ব্যবাহারিক জীবনে প্রয়োগের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

বিশিষ্ট গবেষক সমরেণ রায় বলেছেন যে মানবেন্দ্রনাথ ভারতে থাকাকালীন মার্কসবাদ বা সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হননি। এর প্রধান কারণ ছিল এই যে ভারতীয় দর্শনের মধ্যে পৃথিবীকে পরিবর্তন করার কোন তাগিদ ছিল না। মার্কসবাদ বিষয়ে মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমরেণ রায় বলেছেন 'Roy's approach to Merxism war neither political nor economic.

It was philosophical, Roy was in agreement with Antonio gramsci that the philosophical aspect Marxism needed to be revised so that it could offer something to the idezlistically inclined.

ফরাসী বিপ্লবের একটি বৃহৎ বিচ্যুতির উল্লেখ করে মানবেন্দ্রনাথ বলেন যে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সেখানে স্বীকৃত হলেও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যদি তা বাস্তবায়িত হত তাহলে তা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উপরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিরূপে বিবেচিত হত। এ প্রসঙ্গে সমরেন রায়ের বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য 'Till 1946, Red Nzpoleonism meant to Roy & liberalizing development recalling Napoleon carying the gains of the French Revolution to the countries he conquered. But Roy did not want the Russian Revolution to be carried by force to Europe'. ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে মানবেন্দ্রনাথ If I were stzlin শিরোনামে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন যার নির্যাস ছিল এই যে কম্যুনিজমকে মানবিকতাবাদী ও মুক্তিদায়ী শক্তিরূপে (liberal humanist force) ইউরোপে প্রতিভাত হতে হবে।

মানবেন্দ্রনাথ তাঁর মানবতাবাদী দর্শনে কম্যুনিজমের সমালোচনা করে বলেছেন 'যে সমাজদর্শনে বা সমাজ পুনর্গঠন পরিকল্পনায় ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্ব অস্বীকৃত, ব্যক্তিমানুষের স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তির আদর্শকে অর্থহীন ও অন্তঃসারশূন্য বলে উড়িয়ে দেওয়া হয় সেই দর্শন ও পরিকল্পনাকে সত্যিকারের প্রগতিমূলক ও বৈপ্লবিক বলা যায় না। তিনি আরো বলেছেন যে অর্থনীতিতে গণতন্ত্র না থাকলেও রাজনৈতিক গণতন্ত্র সম্ভব। কিন্তু রাজনৈতিক গণতন্ত্র না থাকলে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র সম্ভব নয়। ভাবীকালের অশনিসংকেত মনশ্চক্ষুতো অবলোকন করে মানবেন্দ্রনাথ বলেন 'একনায়কতত্ত্ব একবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে আর হটতে চায় না। ডিকটেটরি শাসনের অধীন যখন সমাজের সকল কৃষি শিল্প; বাণিজ্য পরিকল্পনানুযায়ী পরিচালিত হতে থাকে তখন অনেক বেশি কাজ করার সুবিধার দোহাই দিয়ে দক্ষতা ও দলবদ্ধতা বৃদ্ধির অজুহাতে এবং দ্রুত উন্নতিলাভের প্রলোভন দেখিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে উচ্চস্তরের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার করা হয় তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যে উদ্দেশ্য লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একনায়কতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয় শুধু সেই একনায়কতত্ত্বের জন্যই সেই উদ্দেশ্য আর সফল হয় না। স্ট্যালিনের আসলের একনায়কতন্ত্রের নিরঙ্কুশ প্রয়োগ মানবেন্দ্রনাথকে এখানে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথও 'রাশিয়ার চিঠিতে' রাশিয়ার একনায়কতন্ত্রের বিপদের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

মানবেন্দ্রনাথের নবমানবতাবাদেও শোষক ও প্রবঞ্চক শ্রেণীর হতে থেকে মানুষের সামাজিক মুক্তির কথা বলা হয়েছে। ইতিহাসকে গড়ে তোলার পিছনে মানুষের ইচ্ছাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন যে মানুষ রাজা মহারাজা নয় সাধারণ মানুষ। কম্যুনিস্ট পার্টির ইলতেহারে বলা হয়েছে 'শ্রেণী ও শ্রেণী বিরোধ সম্বলিত পুরানো বুর্জোয়া সমাজের স্থান নেবে এক সমিতি যার মধ্যে প্রত্যেকটি লোকেরই স্বাধীন বিকাশ হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্তে। এই ঘোষনার সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ একমত ছিলেন না। তিনি মনে করেছিলেন যে এই কম্যুনিস্ট সমাজ প্রকৃত অর্থে প্রগতিমূলক বৈপ্লবিক সমাজ নয়। স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে স্বাধীন করে দেওয়া যেমন অর্থহীন কথা, তেমনি ব্যক্তিকে সমাজের বা শ্রেণীর বা দেশের কল্যাণের নামে বলি দিয়ে ব্যক্তির মুক্তির ব্যবস্থাও অনুরূপভাবে অর্থহীন।

মানবেন্দ্রনাথের মতে বাজার লাভের উদ্দ্যেশ্যে নয়, শুধু মানুষের প্রয়োজন যে উৎপাদন পরিকল্পনা তা একমাত্র গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নিরাপত্তার ভিত্তিতেই সম্ভব হতে পারে। এখানে রবীন্দ্রনাথের সমবায় অর্থনীতির ধারণার সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের ধারণার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

## ১.৫. সারাংশ

মানবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন এক বর্ণময় চরিত্র যাঁর রাজনৈতিক চিন্তা বারে বারে পরিবর্তিত হয়েছে পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। প্রথম জীবনে তিনি ছিলনা জাতীয়তবাদী, তারপরে মার্কসবাদী তাত্ত্বিক, তারও পরে কিঞ্চিত পরিশোধিত জাতীয়তাবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ এবং জীবনের শেষ লগ্নে নব মানবতাবাদের প্রবক্তা। মানবেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রখর মেধা ও প্রতিভাসম্পন্ন চিন্তানায়ক কিন্তু তাঁর তত্ত্ব জনমানসে তেমনভাবে রেখাপাত

করতে পারেনি কারণ দেশের আমজনতার সঙ্গে কোন আত্মিক যোগ মানবেন্দ্রনাথের গড়ে ওঠেনি। হয়তো অত্যধিক ইয়োরোপকেন্দ্রিকতা বা Eurocentrism এর পিছনে কাজ করেছিল। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে তাঁর মধ্যে মৌলিক চিন্তানায়কের বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। মানবেন্দ্রনাথ যখন জাতীয়তাবাদ থেকে মার্কসবাদে উপনীত হলেন, পরবর্তীকালে যখন নবমানবতাবাদে তাঁব উত্তরণ ঘটল, তখনও কিন্তু মার্কসবাদকে তিনি পুরোপুরি বিসর্জন দেননি। মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলির সঙ্গে তাঁর মৌলিক স্তরে সংঘাত ঘটেনি, সোভিয়েত রাশিয়ায় যেভাবে মার্কসবাদের প্রয়োগ ঘটেছিল বিশেষত স্ট্যালিনের আমলে, তাকে মানবেন্দ্রনাথ কখনই মানুষের আত্মিক মুক্তির পথের সহায়ক বলে মনে করেনি। তিনি মার্কসবাদকে যথার্থ মানবতাবাদী আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ নবমানবতাবাদকে এক বিকল্প রাষ্ট্রদর্শন হিসাবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন যা ছিল যুক্তিবাদ, বিজ্ঞাননমনস্কতা, বস্তুবাদ, রোমান্টিকতা ইত্যাদির সংমিশ্রণ।

## ১.৬. অনুশীলনী

ক) মানবেন্দ্রনাথ কিভাবে জাতীয়তাবাদ থেকে মার্কসবাদে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, আলোচনা করুন।

খ) মানবেন্দ্রনাথের নবমানবতাবাদ কি মার্কসবাদকে বর্জন করে গড়ে উঠেছিল?

গ) কমিনটার্নের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের মতপার্থক্য কি কারণে ঘটেছিল?

## ১.৭. সহায়ক পাঠ


1) Gauripada Bhattacharya, Evolution of the Political Philosophy of M.N. Roy.

2) Sibnarayan Ray ed, M.N. Roy, Philosopher Revolutionary.

3) Sibnarayan Ray ed, Selected works of M.N. Roy.

4) Nirmal Chandra Bhattacharya, Social and Political Ideas of M.N. Roy.

5) Sibnarayan Ray ed. For a Revolution from Below : An M. N. Roy Commemorative volume.

# একক - ৩ ❑ জহরলাল নেহরুর সমাজতান্ত্রিক চিন্তা

## গঠন


১.০ উদ্দেশ্য

১.১. সংক্ষিপ্ত জীবনী

১.২. গণতন্ত্র ও সমাজবাদ সম্পর্কে নেহরুর চিন্তা ভাবনা

১.৩. পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রবক্তা নেহরু

১.৪. মার্কসবাদ প্রসঙ্গে নেহরু

১.৫. নেহরুর সমাজতান্ত্রিক চিন্তার দিকপরিবর্তন।

১.৬. সারাংশ

১.৭. অনুশীলনী

১.৮. সহায়ক পাঠ


## উদ্দেশ্য

এই এককে জহরলাল নেহরুর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনাকে নিম্নোক্ত কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

- জহরলালের জীবন ও কর্ম
- জহরলালের উপর মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক প্রভাব।
- গণতন্ত্র ও সমাজবাদ সম্পর্কে জহরলালের মতামত।
- মার্কসীয় সমাজতন্ত্র থেকে মিশ্র অর্থনীতিতে জহরলালের উত্তরণ।

## ১.০ সূচনা

স্বাধীনতার উত্তরকালে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রগঠনের মতাদর্শগত ভিত্তির প্রধান উৎস জহরলাল নেহরুর রাজনৈতিক ভাবনা। স্বাধীন ভারতের আধুনিকতামনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক ছিলেন তিনি। এই আধুনিকতার উন্মেষ কিন্তু তাঁর মধ্যে ঘটেছিল অনেক পূর্বে যখন তিনি শাসকবিরোধী মুক্তিসংগ্রামের নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ

করেছিলেন। যে চিন্তার বীজ রোপিত হয়েছিল পরবর্তীকালে তা অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু প্রয়োজনে, পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজের চিন্তা, ভাবনা ও নীতিকে পরিবর্তন করেছেন। এই নমনীয়তা তাঁর মধ্যে সব সময়েই ছিল এবং এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন বাস্তববাদ বা Pragmatism এর অনুসারী। মহাত্মাগান্ধির নেতৃত্বে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বহু বিষয়ে মতানৈক্য থাকলেও গান্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস দেখাননি যা দেখিয়েছিলেন একমাত্র সুভাষচন্দ্র। কিন্তু স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি গান্ধির নীতি ও আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছিলেন। কেবল গান্ধিবাদকে খণ্ডন নয়, জহরলাল আত্মখণ্ডনও করেছিলেন কারণ একসময় যে মার্কসবাদকে কেন্দ্র করে তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তার কাঠামো নির্মিত হয়েছিল পরে সেই মার্কসবাদকে অপ্রযোজ্য বলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। স্বাধীনতার পূর্বের নেহরু ও স্বাধীনতার পরবর্তীকালের নেহেরুর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নেহরুর রাজনৈতিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর আত্মজীবনী An Autobiography এবং The Discovery of India ও Glimpses of World History শীর্ষক অন্য দুটি গ্রন্থের মধ্যে। এছাড়াও আছে তাঁর অজস্র বক্তৃতা রচনা ও চিঠিপত্র যার মধ্যে তাঁর চিন্তা ভাবনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে যিনি কংগ্রেসের বামপন্থী সংগ্রামী রাজনীতির প্রতিভূরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, শেষপর্যন্ত তিনি কতটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছিলেন তা নিয়ে সমালোচক মহলে যথেষ্ট বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তিনি শেষ পর্যন্ত হাত মিলিয়ে কাজ করতে পারছিলেন না কেন, তাও বিদগ্ধ সমাজের কাছে কৌতূহলের বস্তু। আধুনিক ভারতের রূপকার নেহরুর রাজনৈতিক চিন্তার মূল্যায়ণ শুধু নয়, পুনর্মূল্যায়নেরও প্রয়োজন আছে।

## ১. ১ সংক্ষিপ্ত জীবনী

নেহরু ছিলেন কাশ্মিরী হিন্দু ব্রাহ্মণ ও অভিজাত পরিবারের আইনজীবী পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর পুত্র। ১৮৮৯ সালের ১৪ নভেম্বর এলাহাবাদে তাঁর জন্ম। জহরলালের ছাত্রজীবনের বড় অংশ কেটেছিল ইংল্যান্ডে। মাত্র পনের বছর বয়সে তাঁর পিতা তাঁকে হ্যারোতে শিক্ষালাভের জন্য পাঠান। সেখানে পঠন পাঠন শেষ করে জহরলাল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য। ১৯১০ সালে বার এ্যাট ল পাশ করে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। এরপর কিছুদিন এলাহাবাদের হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে কাজ করার পর তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন। ১৯১৮ সালে তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২১-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই জহরলাল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে তিনি কংগ্রেসে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তার আগে ১৯২৭৭ সালের মাদ্রাজ অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তিনি পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯২৬-২৭ সালে নেহরু ইউরোপে যান এবং ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে Brussels এ Congress against Colonial | Oppression and Imperialism এ সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। যেখানে সমাজতান্ত্রিক ও তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হন। এই

সময় থেকেই মার্কসবাদে তিনি দীক্ষিত হন। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ এ লক্ষ্ণৌ ও ফৈজপুর কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে তাঁর সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে National Planning Committee গঠন করে নেহরুকে তার চেয়ারম্যান করেন। তিনি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সোৎসাহী সমর্থক ছিলেন। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা উত্তর ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে কার্যায়িত করতে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই সময় কিন্তু তিনি সমাজতন্ত্রের পথ পরিহার করে মিশ্র অর্থনীতির পথকে বেছে নেন। মার্কস বা গান্ধি কারো অনুসৃত পথকেই তিনি গ্রহণ করেন নি।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা হিসাবে নেহরু ব্যতিক্রমী পথের সন্ধান করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী জোটে ও অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক জোট কোনটিতেই সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতকে সামিল না করে তিনি সমদূরত্বের নীতি গ্রহণ করেন। অবশ্য ১৯৬২ সালের চিন যুদ্ধের সময় আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পরোক্ষভাবে ভারতকে সমর্থন করে। এই যুদ্ধে ভারতের শোচনীয় পরাজয় নেহেরুকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে। তিনি উপলব্ধি করেন যে চিন বিশ্বরাজনীতিতে ভারতের উত্থানকে প্রতিহত করার জন্যই ভারত আক্রমণ করেছিল এবং বিশ্বের দরবারে ভারতের ভাবমূর্তির অবনমন ঘটাতে চেয়েছিল। চিনের এই উদ্দেশ্য কিন্তু সফল হয়নি এবং ভারতের প্রতি বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ থেকেই তা প্রমাণিত হয়। এবং অল্পপরেই ২৭ মে ১৯৬৪ নেহরু লোকান্তরিত হন।

## ১.২ গণতন্ত্র ও সমাজবাদ সম্পর্কে নেহরুর ধারণা

মুক্তিসংগ্রামের সময় নেহরু ছিলেন কংগ্রেসের বামপন্থী চিন্তাধারার কনিষ্ঠ অনুগামী যে তিনবার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রত্যেকবারই তিনি সমাজতান্ত্রিক পথে ভারতের অগ্রগতির কথা সভাপতির শীর্ষাসন থেকে ব্যক্ত করেছেন। একইসঙ্গে একথাও সত্য যে সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন বৈপ্লবিক বা radical পদক্ষেপ গ্রহণ করার সাহস তাঁর ছিল না। ১৯৩৬ এর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশনে নেহরু সমাজতন্ত্রের গুণগান করেন এবং শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলিকে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত করে ব্যাপক ভিত্তির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্ট গঠনের কথা ঘোষণা করেন কিন্তু এই কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে সমাজতন্ত্র ছিল সম্পূর্ণরূপে বর্জিত সভাপতির ভাষণ পাঠ করার আগেই এসব প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল তবুও তিনি পদত্যাগ করেন নি কংগ্রেসের ঐক্যরক্ষার স্বার্থে। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন 'I see no way of ending the poverty the vast unemployment the degradation and subjection of the Indian people except through socialism which is a vital creed which I hold with both my head and heart.' শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু দক্ষিণপন্থারই জয় হল এবং ২০ এপ্রিল ১৯৩৬ শিল্পপতি ঘনশ্যামদাস বিড়লা পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসকে লিখলেন 'একদিক দিয়ে জহরলালজির বক্তৃতা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া হয়েছে কারণ যে সব প্রস্তাব পাশ হয়েছে তা সবই তাঁর বক্তৃতার মূল নীতির বিরুদ্ধে। তিনি পদত্যাগ করে একটি ভাঙন আনতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেন নি। জহরলালজি ঠিক ইংরেজ গণতন্ত্রবাদীর মতন

যিনি পরাজয়কে খেলোয়ারসুলভ মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর মতাদর্শ তুলে ধরতে উদগ্রীব, কিন্তু তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে সেই অনুযায়ী কাজ সম্ভব নয়, এবং সেজন্য চাপও দেন না।' ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে নেহরুর ছিল তীব্র বীতরাগ। তিনি ১৯৩৫ সালে এক বিবৃতিতে বলেন বর্তমান পৃথিবীর সামনে দুটি বিকল্প আছে, কম্যুনিজম ও ফ্যাসিজম এবং আমি সম্পূর্ণ ভাবে প্রথমটির পক্ষে। এ নিয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর তীব্র মতান্তর হয়। ২৮ মার্চ ১৯৩৯ সুভাষচন্দ্র তাঁকে লেখেন 'It is no use championing lost causes all the time and condemning countries like Germany and Italy and giving a certificate of good conduct to, ১৯ মার্চ ১৯৩৫ জহরলাল নিজের দিনলিপিতে লেখেন 'Subhas seens to be writing a great deal of nonsense. He can only think of himself in terms of being a Mussolini'. ফ্যাসিবাদকে নেহরু আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের বিধ্বংসী রূপে হিসাবে দেখেছিলেন, ইয়োরোপে থাকাকালীন মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন নি। তাঁর সুনিশ্চিত নীতি ছিল ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করা অর্থাৎ No truck with Fascism।

## ১.৩ পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রবক্তা নেহরু

ফৈজপুর কংগ্রেসেও সেই সময় তিনি পরিকল্পিত অর্থনীতির কথা প্রচার করেন এবং ১৪ থেকে ১৭ আগস্ট ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সারাভারতের শিল্প উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা রচনার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। জাতীয় পরিকল্পনার রূপকার সুভাষচন্দ্র না জহরলাল এ নিয়ে বিদগ্ধসমাজের মত্যে মতনৈক্য আছে। সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে ১৯৩৮ সালে National Planning Committee গঠিত হয় এবং জহরলাল হন তার সভাপতি। অবশ্যই জাতীয় পরিকল্পনার চিন্তা সুভাষচন্দ্রের আগে জহরলাল করেছিলেন কারণ তিনি রাশিয়ায় গিয়ে পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঙ্গে করেছিলেন যে সুযোগ সুভাষচন্দ্র পাননি, কিন্তু একথাও সত্য যে National Planning Committee সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বেই গঠিত হয়েছিল। তিনিই জাতীয় পরিকল্পনাকে কংগ্রেসের অনুসৃত নীতির মর্যাদা দিয়েছিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে গান্ধির বিরোধিতার কথা আন্দাজ করেও। The Discovery of India গ্রন্থে নেহরু National Planning Committee সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেও এবিষয়ে সুভাষচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে নানা বিষয়ে মতবিরোধ সত্বেও জাতীয় পরিকল্পনার প্রশ্নে দুজনেই ছিলেন এক পথের পথিক। জহরলাল এই communittee' র সভাপতি হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন কারণ তাঁর ভাষায় কংগ্রেসের নেতৃত্বের অধিকাংশই এমন কমিটিকে মনে করতেন 'অবাঞ্ছিত সন্তান।' শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি এর সভাপতি হতে স্বীকার করেন এবং এর ফলে রবীন্দ্রনাথ আনন্দিত হন। ২৮ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথের সচিব অনিলকুমার চন্দ জহরলালকে জানান বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে ডঃ সাহার ভাবনাচিন্তা খুবই মনে ধরেছে রবীন্দ্রনাথের। ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু আশা করেন। কংগ্রেসে দুজন আধুনিক মনোভাবাপন্ন মানুষকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন — জহরলাল ও সুভাষচন্দ্র। গান্ধির

মত প্রাচীনপন্থী, অতীতাশ্রয়ী কুটীর শিল্প প্রধান দৃষ্টিভঙ্গির স্থানে জহরলাল ও সুভাষচন্দ্র আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিস্থাপিত করেছিলেন।

## ১.৪ মার্কসবাদ প্রসঙ্গে নেহেরু

জহরলাল এই সময় মার্কসবাদী তত্ত্বে গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮ জুন ১৯৩৬ তিনি বসন্তকুমার মল্লিককে লেখেন 'I accept generally speaking the Marxist analysis of history though I think that in relation to India, vt does not lay sufficient stress on certain features of our past. That however does not falsify our analysis to any marked degree. I also accept the general communist goal of a classless society.' নিজের আত্মজীবনীতে জহরলাল লেখেন 'I dislike dogmatism and Karl Marx's writings or anyother book as revealed scriptures and the regimentaton and heresy hunts which seem to be a feauture of modern Communism. But still I incline more towards a Communist Philosophy.' এছাড়া ১৭ জানুয়ারি ১৯৩৬ লর্ড লোথিয়ানকে তিনি লেখেন 'Marxs' interpretation of history is the only one which does explain history to some extent and gives it meaning.' এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মার্কসবাদ সম্পর্কে কোন কোন ক্ষেত্রে সংশয় থাকলেও সাধারণভাবে মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষাকে নেহরু গ্রহণ করেছিলেন। ৫ জুন ১৯৩৬ এক প্রেস বিবৃতিতে নেহরু বলেন যে কম্যুনিজমের পরিবর্তে তিনি সমাজতন্ত্র কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। কম্যুনিজম যে ভারতের পক্ষে উপযোগী নয় তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। নিজেকে সমাজতন্ত্রীর সাথে সাথে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী বলেও নেহরু পরিচয় দিয়েছিলেন। ২৮ মার্চ ১৯৩৯, এক চিঠিতে সুভাষচন্দ্র তাঁকে কটাক্ষ করে বলেন 'How a Socialist can be an individualist, beats me.' তিনি আরো বলেন যে রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক কাঠামো ছাড়া সমাজতন্ত্রকে পৃথিবীর কোন দেশেই বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। নেহরু কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে আরো অনেক বেশি সফল হতে পারতেন যদি তাঁর গান্ধির মত নিজস্ব দলীয় সংগঠন থাকতো। ৩ এপ্রিল ১৯৩৯ জহরলাল প্রত্যুত্তর সুভাষচন্দ্রকে লেখেন 'I am intellectually a Socialist and by temperament and training, an individualist। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে কোন বিরোধ তিনি দেখতে পাননি।

মার্কসবাদ সম্পর্কে কোন অন্ধবিশ্বাস তাঁর ছিল না কিন্তু সামগ্রিকভাবে মার্কসীয় তত্ত্বেও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে নেহরুর মনে কোন সংশয় ছিল না। তিনি তাই নিজের আত্মকথায় লিখেছেন 'Marx may be wrong in some of has statements. But he seems tome to have possessed quite and extra ordinary degree of insight into social phenomena. Thus method applied to past history as well as current events, helps us in understanding them far more than any other methods of approach.'

তাঁর Glimpses of World History গ্রন্থে জহরলাল Daskapital গ্রন্থকে বিজ্ঞানসম্মত রচনা বলে অভিহিত করেন এবং লৈখেন 'Marx has dealt with the developement of history and economics dispassionately and scientifically avoiding all vagueness and idealism'. প্রসিদ্ধ লেখক John Gunther যথার্থই লিখেছেন Nehru's general approach was Marxist'. প্রখ্যাত মনীষী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও নেহরুর unmistakable orientation towards Marxism এর উল্লেখ করেছেন।

## ১.৫ নেহেরুর সমাজতান্ত্রিক চিন্তার দিক পরিবর্তন

জহরলাল এই সময় মার্কসবাদের সাধারণ নির্ভরযোগ্যতাকে প্রথমদিকে গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে তাঁর চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। তিনি, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে এমন মতও ব্যক্ত করেন যে 'I think Marxism is out of date'। এ বিষয়ে জহরলালের আর একটি উদ্ধৃতি স্মরণীয় — 'Marx was a great man and everybody could Profit by his name, but am I to be told that what he said about England a 100 or 150 Years ago is to be applied to India on any other country?' এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা বিষয়ে তাঁর পূর্বের অবস্থানে অনড় ছিলেন না।

স্বাধীনতার উত্তরকালে নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় একধরনের রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়। স্বাধীনতার পর প্রথম ১৫ বছর Gross Domestic Product এর ৯/১০ ভাগ এনেছিল বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে। ১৯৬৫ সালে প্রশান্ত মহলানবীশের এক সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে ২০টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণমূলক প্রভাব বিস্তার করে।

১৯৪৮ সালে বিদেশী পুঁজির পরিমাণ ছিল ২,১৭৬ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৪৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬১৮৫ মিলিয়ন টাকা। জয়প্রকাশ নারায়ণ এসময় নেহরুকে কটাক্ষ করে লেখেন 'You want to go to socialism but you want the capitalists to help you'. সর্বপল্লী গোপালও বলেছেন 'Socialism lost its idelogical edge for Nehru'.

১৯৫৭-৮'য় Tata Electrical Company কংগ্রেসের তহবিল ৩,০০,০০০ টাকা জমা দেয়। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে টাকা ও বিড়লা ১ মিলিয়ন টাকা চাঁদা দেয়। Cement Company' র অবদান ছিল ৫ লক্ষ টাকা। এ থেকেই বোঝা যায় কংগ্রেস কোনরকম সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী গ্রহণ করেনি। বিড়লা ১৯৫৬ সালে কটাক্ষ করে বলেন যে কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রের নীতির প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে, অর্থাৎ কংগ্রেস যে কোন অবস্থাতেই কোন বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী গ্রহণ করবে না এ বিশ্বাস বিড়লার ছিল।

## ১.৬ সারাংশ

সারাংশ নেহরুর চিন্তার মধ্যে আন্তর্জাতিকতার ছাপ ও প্রবাব ছিল অত্যন্ত বেশি। তিনি প্রথমদিকে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হল এবং তাঁর আত্মচরিত রচনার সময় তিনি সাধারণভাবে মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে আস্থাশীল ছিলেন যদিও তার সবটুকুকেই নির্বিচারে গ্রহণ করেন নি। একইসঙ্গে তিনি একথাও বলেছিলেন যে 'The Success or failure of the Russian social experiments do not directly affect the validity of the Marxian theory'.Glimpses of World History গ্রন্থ রচনার সময়ও নেহরুর একই রকম চিন্তাধারা ছিল যদিও The Directory of India গ্রন্থে তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদের আতিশয্যকে জহরলাল কিঞ্চিত প্রশমিত করেন। জহরলাল আন্তর্জাতিক ও বিশ্বব্যাপী মানসিকতার দিক দিয়ে অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী ছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শেষে সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়ক করাবে। গ্রহণ করেন সম্ভবত এই কারণেই যে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে পরাধীন জাতির কাছে আন্তর্জাতিকতাবাদ বিলাসিতা মাত্র। শেষদিকে এই বোধোদয় জহরলালেরও ঘটেছিল।

জহরলালের সঙ্গে কম্যুনিস্ট ও ফ্যাসিবাদের প্রশ্নে সুভাষচন্দ্রের মতান্তর ঘটেছিল এবং সুভাষচন্দ্র অভিযোগ করেছিলেন যে জহরলাল ইটালি ও জার্মানির মত দেশকে নিন্দা করলেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সদাচারের সংসাপত্র দেন। এই অভিযোগ সঠিক ছিল না কারণ আত্মচরিতে জহরলাল লিখেছিলেন 'Indeed I have always wondered at and admired the astonishing Knack of the British people of making their moral standards correspond with their material interests and of seeing virtue in everything that advances their imperialist designs Mussolini and Hitler are condemned by them in perfect good faith and with mghteous indignator for their attacks on liberty and democracy and in equal good faith similar attacks and deprivation of liberty in India seem to them as necessary and the highest moral reasons are advanced to show that true disinterested behavior on their part demands them'.

জহরলালের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আমূল পরিবর্তিত হয়। তিনি ভারতে মিশ্র অর্থনীতির প্রবর্তন করেন যা ছিল রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের নামান্তরমাত্র। বিড়লার মত পুঁজিপতিদের প্রভাব কংগ্রেসের ওপর ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং মতাদর্শগতভাবে জহরলাল সমাজতন্ত্রের পথ থেকে অনেকাংশে সরে আসেন। সমাজতন্ত্রের জয়গান করার সময়েও সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য কোন বৈপ্লবিক কর্মসূচী জহরলাল গ্রহণ করতে পারেন নি। কংগ্রেসের বামপন্থী অংশের প্রতিভ হয়েও দক্ষিণপন্থী অংশের চাপের কাছে তাঁকে বার বার নতি স্বীকার করতে হয়েছে। গান্ধির প্রাধান্য তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রতিবাদে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীকালে গান্ধির প্রদর্শিত পথে। তিনি ভারতবর্ষকে পরিচালিত করেন নি। এসময় মার্কসবাদী তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর পূর্বের আস্থাও নির্ভরতা অনেকাংশে অন্তর্হিত হয় এবং এই সময় মার্কসকে

তিনি প্রায় নাকচ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে যে নেহরু ইতিপূর্বে ছিলেন অজেওবাদী এবং আত্মচরিতে লিখেছিলেন যে তিনি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার জগতে আশ্রয় নিতে চান না, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে আবাহন করবে বলে সেই নেহরু পরবর্তী কালে একধরনের অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতার দ্বারা প্রভাবিত হন। মার্কসবাদ সম্পর্কে বীতস্পৃহ হওয়ার এটিও ছিল একটি সম্ভাব্য কারণ। স্বাধীনতার উত্তরকালের ইতিহাস তাই। প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদী নেহরুর রূপান্তরের ইতিহাস।

## ১.৭ অনুশীলনী

ক) জহরলাল নেহরুর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করুন।

খ) জহরলাল নেহরু কি মার্কসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন?

গ) জহরলাল নেহরু কি স্বাধীনতার উত্তরকালে তাঁর সমাজতান্ত্রিক অবস্থান থেকে সরে এসেছিলেন? যুক্তি সহযোগে আলোচনা করুন।

## ১.৮ সহায়ক পাঠ


১) B.R. Nanda, Jawaharlal Nehru, The Rebel Stateman.

২) Hiren Mukherjee, The gentle Collossus.

৩) Michael Breacher, Nehru, A Political Biography.

৪) গিরিশচন্দ্র মাইতি, স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল।

৫) দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, দুই নায়ক।

৬) অবলোপ ত্রিপাঠী স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

৭) Jawaharlal Nehru, An Autobiography।

৮) Jawharlal Nehru, The Discoress of India।

৯) Jawaharlal Nehru, Glimpses of World History।

১০) Jawaharlal Nehru, A Bunch of Old Letters।

# একক-৪ ❑ জয়প্রকাশ নারায়ণ - মার্কসবাদ, গান্ধিবাদ, সমাজবাদ

## গঠন


১.০ সূচনা

১.১ সংক্ষিপ্ত জীবনী

১.২ মার্কসবাদ সম্পর্কে জয়প্রকাশ

১.৩ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রসঙ্গে জয়প্রকাশ

১.৪ জয়প্রকাশের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন - গান্ধিবাদে রূপান্তর

১.৫ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

১.৬ সারাংশ

১.৭ অনুশীলনী

১.৮ সহায়ক পাঠ


## উদ্দেশ্য

এই এককে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে নিম্নলিখিত কাঠামোর মধ্যে বিন্যাস করা হয়েছে।

- জয় প্রকাশের জীবন ও কর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।
- প্রথম স্তরে জয়প্রকাশের মার্কসবাদপ্রবণতা ও গান্ধি বিরোধিতা
- মার্কসবাদ থেকে জয়প্রকাশের গান্ধিবাদে উত্তরণ।
- গণতন্ত্র সম্পর্কে জয়প্রকাশের দৃঢ় প্রত্যয়জাত আত্মনিয়োগ।

## ১.০ সূচনা

আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে জয়প্রকাশ নারায়ণের নাম স্মরণীয়। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ও অন্যদিকে রাজনৈতিক কর্মী। ভারতবর্ষের রাষ্ট্র, ক্ষমতা, সমাজ পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের পথ সম্পর্কে তাঁর যথার্থ মৌলিক চিন্তাভাবনা ছিল যদিও তিনি কোন পেশাদার দার্শনিক বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী

ছিলেন না। বিদেশে উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ করার পরিবর্তে জয়প্রকাশ স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। তারপর থেকে আমৃত্যু রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। শেষের দিকে তিনি গান্ধিবাদী সর্বোদয় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং দলহীন গণতন্ত্র ও সার্বিক বিপ্লবের বাণী প্রচার করেন। জয়প্রকাশের রাজনৈতিক চিন্তার জগতে বহু ঘাত প্রতিঘাত ও বাঁক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সমালোচকদের কাছে জয়প্রকাশ আজও নেতিবাচক ভাবমূর্তিতে প্রতিভাত হন। কেউ তাঁকে দোলায়িত চিত্ত বলে অভিহিত করেছেন, কেউ তাঁকে মনে করেছেন বিভ্রান্তিকর আবার কেউ তার মধ্যে দেখেছেন স্ববিরোধিতা। এমনকি কারো কাছে তিনি ফ্যাসিস্টরূপে প্রতিভাত হয়েছেন। জয়প্রকাশ কিন্তু আজীবন কয়েকটি মূল্যবোধের প্রতি অবিচল আনুগত্য প্রদর্শন করে গিয়েছেন, তা হল স্বাধীনতা, শান্তি, ভ্রাতৃত্ব ও সমতা। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল জনগণের স্বাধীনতা। একজন বিশেষজ্ঞের মতে তাঁর মধ্যে ছিল অনুকরণীয় গণতান্ত্রিকতা। সারা দেশের মানুষকে তিনি নিজের পরিবারের সদস্য বলে মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে তাঁর অনুসৃত আদর্শ, বিশ্বাস ও কাজকর্ম সম্পর্কে দেশের মানুষের তাঁকে সমালোচনা করার অধিকার আছে। আজীবন জনসেবায় ব্রতী থাকলেও কোন সরকারী পদগ্রহণে তিনি আগ্রহী ছিলেন না অথচ সরকারের কর্তাব্যক্তিদের নানা সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেছেন। ডঃ রামমনোহর লোহিয়া তাঁকে আখ্যা দিয়েছেন 'সীমাহীন ব্যক্তিত্ব'। তিনি এক আলোচনায় বলেছিলেন গণতন্ত্র আজও জনগণের জন্যই রয়ে গিয়ছে জনগণের দ্বারা শাসন আজও হয়ে উঠতে পারেনি। গণতন্ত্রের বাস্তবায়নের পথ অনুসন্ধান করেছেন তিনি সারাজীবন ধরে। প্রকৃতপক্ষে জয়প্রকাশের জীবন হল গণতন্ত্রের অন্বেষণ।

## ১.১ সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৯০২ সালের ১১ অক্টোবর জয়প্রকাশের জন্ম। ছাত্র হিসাবে জয়প্রকাশ ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। কৈশোরেই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর হিন্দি অনুবাদ তিনি পড়ে ফেলেছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন যদিও রাজনীতিতে তাঁর এই যোগদান ছিল এক ক্ষণস্থায়ী ঘটনা। অবশ্য বিদেশী শাসনের প্রতি তাঁর বীতরাগ তখন থেকেই দানা বাঁধতে শুরু করে। এরপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য জয়প্রকাশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন। সাত বছর প্রবাসী জীবন অতিবাহিত করার পর ১৯২৯ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আমেরিকায় থাকাকালীন তিনি Abram Landy নামে এক পোলিশ ইহুদীর প্রভাবে সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। Das Capital সহ মার্কসের বেশ কিছু গ্রন্থাবলীর সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কিত আলোচনার দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হন। মার্কসবাদে দীক্ষিত জয়প্রকাশ উপলব্ধি করেন যে দারিদ্র্য ও অসাম্য দূর না হলে স্বাধীনতা অপূর্ণ থেকে যাবে এবং এরজন্য প্রয়োজন সমাজবিপ্লবের। ১৯২৯ সালে দেশে ফেরে জয়প্রকাশ কিন্তু কংগ্রেসে যোগদান করেন, কম্যুনিষ্ট পার্টিতে নয়। জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতিবাচক দৃষ্টিও তাঁর অনুমোদন পায়নি।

কংগ্রেসের মধ্যেও কিন্তু জয়প্রকাশের অভিজ্ঞতা তেমন স্বস্তিদায়ক ছিল না। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র তাঁকে সন্তুষ্ট করতে না পারলেও মার্কসবাদে ছিল তাঁর গভীর আস্থা। গান্ধির শ্রেণী সমঝোতার রাজনীতিও তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। সেই কারণে ১৯৩৪ সালে তিনি আচার্য নরেন্দ্রদেব, মেহের আলি, রামমনোহর

লোহিয়া, অচ্যুত পটবর্ধন ইত্যাদির সঙ্গে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গড়ে তোলেন। তাঁদের মধ্যে প্রচুর আদর্শগত পার্থক্য ছিল। এই দলে কম্যুনিস্ট পার্টির অনেকে সদস্য হিসেবে যোগদান করেছিলেন।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জয়প্রকাশ তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন করেন। তখন মার্কসবাদের জায়গায় তিনি গণতান্ত্রিক সমাজবাদে আশ্রয় নিয়েছেন। সেই সময় ১৯৪৮ সালে সমাজতন্ত্রী দল প্রতিষ্ঠা হয় যার প্রথম সভাপতি নরেন্দ্রদেব এবং সম্পাদক জয়প্রকাশ ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর সোস্যালিসম পার্টি এবং জে বি কৃপালনির নেতৃত্বাধীন KMP র সংযুক্তিকরণের ফলে প্রজা সোসালিস্ট পার্টি (P S P) তৈরি হয়। ১৯৪৮ সালে গান্ধির হত্যার পর জয়প্রকাশের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে স্বাধীনতা ও দারিদ্র্যমোচন অসম্ভব। অহিংস পন্থা অবলম্বন করে হৃদয়পরিবর্তনের দ্বারা সামাজিক উদ্যোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমেই স্থায়ী সমাজ বিপ্লব সাধিত হতে পারে। বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলনেও তিনি যোগদান করেন। তিনি সর্বোদয় সমাজগঠনের সংকলন ঘোষণা করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তবে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিষয়ে তিনি সদা অবহিত ছিলেন। ১৯৭৬ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন এবং জয়প্রকাশের অভিভাবকত্বে জনতা দল গঠিত হয় এবং এই দল ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধিকে পরাজিত করে ক্ষমতায় আসে। এই জনতা সরকারও কিন্তু জয়প্রকাশের সর্বাত্মক বিপ্লবের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারেনি। ৪ অক্টোবর ১৯৭৯ জয়প্রকাশের দেহান্ত হয়। তার পরের বছর জনতা দলের স্থলাভিষিক্ত হয় কংগ্রেস।

## ১.২ মার্কসবাদ প্রসঙ্গে জয়প্রকাশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন ধনতন্ত্রের অর্থনীতির সংকট জয়প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিশ্বব্যাপী মন্দার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে। সেইসময় সমসাময়িক সোভিয়েত অর্থনীতির উন্নতি তাঁকে মার্কসবাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিঃশংশয় করে তোলে। তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার সাফল্যের কারণ হিসাবে বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মার্কসবাদের প্রেরণাকেই উপস্থাপিত করেন। মার্কসবাদ যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে জয়প্রকাশ সহমত পোষণ করতেন। তাঁর কাছে সমাজতন্ত্র, ব্যক্তিগত আচরণ নয়, আর্থসামাজিক পুনর্গঠনের বিষয়। রাষ্ট্রহীন সমাজ চূড়ান্ত লক্ষ্য হলেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও ব্যবহার আবশ্যকীয়, মার্কসবাদের যুক্তিকেও তিনি মেনে নিয়েছেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তাকেও স্বীকার করেছেন। জয়প্রকাশের মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সেই অর্থে কোন মৌলিকত্ব ছিল না। তিনি মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলিকে নির্বিচারেই গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত Why Socialism পুস্তিকায় জয়প্রকাশ তাঁর মার্কসবাদী ধারণাকে পূর্ণাঙ্গরূপ দেন। অবশ্য রক্তক্ষয়ী বিপ্লব ও হিংসার পথকে পরিহার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি শান্তিপূর্ণ ও ন্যায্য পথ অবলম্বনের কথা বলেন।

## ১.৩. গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রসঙ্গে জয়প্রকাশ

মার্কসবাদী জয়প্রকাশ ভারতবর্ষের মত উপনিবেশ সম্পর্কে কমিন্টানের নীতির বিরোধিতা করেন তিরিশের দশক থেকেই, কিন্তু মার্কসবাদের মৌলনীতিগুলি এবং সমাজতন্ত্রের মডেল হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল অটুট। চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধ থেকেই সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে থাকে। গণতান্ত্রিক অধিকারের সঙ্কোচন, বিরোধী দলের অস্তিত্বকে বলপূর্বক দমন করা, রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী ক্ষমতা, ইত্যাদি তাঁকে সোভিয়েত মডেল সম্পর্কে বিরূপ করে তোলে। এই সূত্রেই তিনি মার্কসবাদের মৌল বক্তব্য ও তার প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে থাকেন। এই পর্য্যায়ে অর্থনৈতিক সমতার পাশাপাশি রাজনৈতিক স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক পন্থায় পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রের পরিবর্তে সামাজিক উদ্যোগের উপর জয়প্রকাশ আস্থাশীল হয়ে পড়েন। My Picture of Socialism (1946), The Transtion of Socialism (1947). The ideological problems of Socialism (1948) প্রমুখ গ্রন্থে জয়প্রকাশের রাজনৈতিক ভাবনার দিকপরিবর্তনের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

## ১.৪. জয়প্রকাশের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন-গান্ধিবাদে রূপান্তর

১৯৪৬ সালে জনতা পত্রিকায় প্রকাশিত My Picture of Socialism নিবন্ধে জয়প্রকাশ মার্কসবাদকে বিজ্ঞানরূপে স্বীকার করেন এবং নিজেকে মার্কসবাদী বলে পরিচয় দেন। তবে একইসঙ্গে তিনি একথাও সংযোজন করেন যে বিজ্ঞানে যেমন চূড়ান্ত সত্যের কোন স্থান নেই তেমনি মার্কসবাদও চূড়ান্ত সত্যের প্রতীক নয়। মার্কসবাদের অবিস্মরণীয় অবদান হল এই, যে তিনি ইতিহাস ও সমাজকে যথার্থভাবে অনুধাবন করার একটি বিশ্লেষণ পদ্ধতি আমাদের দিয়ে গেছেন। মার্কসবাদ সত্যের আধার নয় বিভিন্ন সময়ের এবং সমাজের সত্যে পৌঁছনোর পদ্ধতি। মার্কসবাদ যদি বিজ্ঞান হয় তাহলে সেখানে গোঁড়ামির কোন জায়গা থাকতে পারে না। সেখানে বহু আংশিক সত্য রয়েছে যা নতুন তথ্যের আলোয় শোধন ও উন্নত করণ প্রয়োজন। সোভিয়েত রশিয়ার অভিজ্ঞতা জয়প্রকাশকে এতটাই শঙ্কিত করে তোলে যে তিনি সমাজতন্ত্রের কোন বিশ্বজনীন মডেলের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। The Transtion of Socialism নিবন্ধে তিনি বলেন যে সব দেশে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পন্থা এক হতে পারে না। একটি দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতিই বিপ্লবের পদ্ধতিকে ঠিক করে দেবে। কোন দেশের সফল বিপ্লবের কৌশলকে যান্ত্রিকভাবে অন্য দেশে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

একসময় জয়প্রকাশ গান্ধিবাদের কঠোর সমালোচক ছিলেন। গান্ধিবাদ ছিল তাঁর কাছে বিপ্লববাদ নয় সংস্কারবাদ। গান্ধি কল্পিত রামরাজ্যকে জয়প্রকাশ উপহাস করেছিলেন। তাঁর আদিতত্ত্ব জয়প্রকাশের কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হয়েছিল। গান্ধি প্রস্তাবিত যন্ত্র দূরীকরণকেও জয়প্রকাশ সমর্থন করেননি। সামগ্রিক বিচারে গান্ধিবাদ তাঁর কাছে বিপজ্জনক তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। মার্কসবাদ সম্পর্কে জয়প্রকাশের কঠোর অবস্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে তিনি গান্ধিবাদে উপনীত ও রূপান্তরিত হন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে গান্ধির মধ্যে

তিনি আবিষ্কার করেন এক মৌলিক সমাজতন্ত্রীকে। যদিও হিংসা অহিংসার প্রভেদ জয়প্রকাশ কোন অনমনীয় অবস্থায় গ্রহণ করেন নি, কিন্তু শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির দিকেই তিনি বেশি ঝুঁকেছেন। তিনি এমন কথাও বলেছেন যে, 'The method of violent revolution might conceiably lead to a socialist democracy but in the led to a bureaucratic state, in which democracy does not exist. I should like to take a lesson from history. এই সময় বিনোবা ভাবের অনুসৃত পন্থায় কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং শান্তিপূর্ণ জনপ্রতিরোধের পথে ফিরতে বাধ্য হন।

গান্ধিবাদী দর্শন থেকে জয়প্রকাশ ব্যক্তির নৈতিকতা বিষয়টি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেন। সম্মেলনে জয়প্রকাশ বলেন মার্কসবাদে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রশ্নটিকে অত্যন্ত লঘু করে দেখানো হয়েছে। এ থেকে মনে হয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন আর্থসামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের রাজনীতি ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষের পরিবর্তিত মূল্যবোধই যে সমাজতন্ত্রকে সফল করবে এই ভাবনায় কোন প্রতিফলন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে দেখা যায় না। এই কারণেই মহান আদর্শ থাকা সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে এত দুর্নীতি দেখা দিয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ।

সমাজতন্ত্র থেকে জয়প্রকাশ যখন সর্বোদয়ে উপনীত হলেন তখন তিনি সমাজতন্ত্রের সাবেকী আদর্শকে পাথেয় রূপে গ্রহণ করেন নি। দারিদ্র্য নিরসন, শোষণের অবসান, মানুষের সুখ ও প্রগতির বাস্তবায়নের জন্য সমাজতন্ত্রীরা পার্থিব সমৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জয়প্রকাশের মতে ভারতবর্ষের মত পশ্চাদপর দেশে পার্থিব উন্নয়নের প্রয়োজন অনস্বীকার্য কিন্তু পার্থিব শ্রীবৃদ্ধি যখন সর্বাপেক্ষা কাঙ্খিত লক্ষ্য হয় পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দ্বেষ, অশান্তি এবং হিংসা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

প্রতিবাদের একমাত্র পথ হল ভোগলিপ্সার ওপর সংযম এবং তা সম্ভব কেবলমাত্র স্বেচ্ছা সংযমের অনুবর্ত্তী হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা আশ্রয় করে সমাজতন্ত্রের আদর্শগুলি রূপায়ণের মাধ্যমে। সর্বোদয় তথা গান্ধিবাদের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণের ফলে মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে জয়প্রকাশের চিরবিচ্ছেদ ঘটে। মানুষ কেন সদাচরণ করবে তার সদুত্তর জড়বাদের মধ্যে পাওয়া যায়না, এরজন্য ভাবজগৎ বা চৈতন্যের অনুসন্ধান প্রয়োজন। সর্বোদয় ব্যবস্থাকে জয়প্রকাশ দলহীন গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। দলকেন্দ্রিক পশ্চিমী সংসদীয় গণতন্ত্রের বিপরীত প্রান্তে জয়প্রকাশ দলহীন গণতন্ত্রের ধারণাকে প্রতিস্থাপিত করেন কারণ তাঁর মতে রাজনৈতিক দল লোকসমাজ বা Community কে খণ্ডিত করে। সর্বোদয় সমাজের বিকেন্দ্রীকৃত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা লুপ্ত করে তিনি লোকসমাজকেন্দ্রিক বা Communitarian গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই সর্বোদয় সমাজের রাজনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি হল গ্রামসভা এবং কার্যনির্বাহী কমিটি হল গ্রামপঞ্চায়েত। পরবর্তী ধাপে গ্রামপঞ্চায়েতগুলি গঠনকরবে পঞ্চায়েত সমিতি। একটি জেলার পঞ্চায়েত সমিতি সংঘবদ্ধ হবে জেলা পরিষদে, জেলা পরিষদগুলি গঠন করবে রাজ্য আইনসভা আর রাজ্য আইনসভাগুলি ঐক্যবদ্ধ হবে জাতীয় সংসদে।

সর্বোদয় অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জনের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, লোকসমাজের মঙ্গলসাধন।

অর্থনীতির ভিত্তি সহযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘাত ও শোষণ নয়। প্রত্যয়জাত উপলব্ধি থেকে তিনি অনুভব করেছিলেন যে পশ্চিমী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলিকে অপরিবর্তিত রেখে সমাজতন্ত্রের নামে শুধু রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করলে আধুনিক অর্থনীতির কোন মৌল ত্রুটিই দূর করা যাবে না। তিনি বাজার অর্থনীতিকে বাতিল করার কথা বলেছেন এবং বলেছেন যে উৎপাদন ব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে যন্ত্রের দাসত্ব না করে মানুষ নিজেই তার নিয়ন্ত্রক হতে পারে। শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা রক্ষার কথাও তিনি বলেছেন। তাঁর মতে উৎপাদনের অতিরিক্ত বিশেষীকরনের ফলে শ্রমিক বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টির আনন্দ থেকে যে বঞ্চিত হয়, সর্বোদয় সমাজে প্রতিটি গ্রামে কৃষি ও শিল্পের সহাবস্থানের ফলে সে বৈচিত্র্যের স্বাদ পায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে এইসময় মার্কসবাদী জয়প্রকাশের মৃত্যু ও গান্ধিবাদে নবজন্ম ঘটেছিল। দলহীন গণতন্ত্রে যে ঘোষণা তিনি করেছিলেন তা মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ নৈতিকরনের দৃষ্টান্ত ছিল। তাছাড়া সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের যান্ত্রিকতা ও রীতিসর্বস্বতার বিরুদ্ধেও ছিল তাঁর জেহাদি। এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জয়প্রকাশের চিন্তায় কিছু সাদৃশ্য দেখা যায় কারণ তাঁর রাশিয়ার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথও রাশিয়ার জাতীয় জীবনের দমনমূলক শৃঙ্খলা বা regimentation এর সমালোচনা করেছিলেন। জয়প্রকাশ এই সময় হয়ে উঠেছিলেন নিশ্চিতভাবে গান্ধিবাদী।

## ১.৫ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

জয়প্রকাশের রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তার ক্ষেত্রে এত বেশি পট পরিবর্তন ঘটেছে যে অনেকেই তাঁর মধ্যে স্ববিরোধিতা খুঁজে পেয়েছেন। প্রকৃত সত্য হল এই যে তিনি মুক্তমনা ছিলেন এবং কোন মতাদর্শ বা মতবাদকে চূড়ান্ত সত্য বলে স্বীকার করেন নি। একসময় মার্কসবাদের ওপর তাঁর এতখানি বিশ্বাস ছিল যে সকল মার্কসবাদীকেই তিনি নিজের মত নিষ্কলুষ মনে করতেন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামীবৃন্দ ও কম্যুনিষ্টদের নিয়ে বৃত্তের সমাজবাদী আন্দোলনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে তিনি তাদের জন্য CSP' র দরজা খুলে দেন কিন্তু তাঁদের কাছে মতাদর্শ ও নীতির থেকে কৌশল ছিল বড়। এরজন্য অচ্যুত পটবর্ধনের মত নেতারা CSP' র কর্মসমিতি থেকে পদত্যাগ করেন। দক্ষিণ ভারতের CSP সংগঠনের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল ই এম এম নাম্বুদ্রিপাদ ও রামমূর্তির মত কম্যুনিস্ট নেতাদের হাতে, ফলে ১৯৪০ সালে যখন CSP থেকে কম্যুনিস্টদের বহিষ্কার করা হল তখন দক্ষিণ ভারতের পুরো সংগঠনটি তাঁদের সঙ্গে চলে গেলো। এর জন্য জয়প্রকাশ ক্ষমাপ্রার্থনা ও আত্মসমালোচনা করেন। যখন গান্ধির যাঁরা কাছের মানুষ ছিলেন যেমন নেহরু ও সর্দার প্যাটেল, তাঁদের সঙ্গে গান্ধির দূরত্ব সৃষ্টি হল তখন জয়প্রকাশ নিজেকে গান্ধির চিন্তাধারায় অভিষিক্ত করলেন। ১৯৫০ সালে তামিলনাড়ুতে অনুষ্ঠিত CSP' র সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনে জয়প্রকাশ বলেন মার্কসীয় পুঁথি থেকে সমাজতন্ত্রের ধারণা উঠে আসেনি। ভারতের মাটিতেই সমাজতন্ত্রের ধারণা প্রোথিত এবং অজ্ঞাতসারে আমাদের ধমনীতে তা প্রবাহিত। ইউরোপীয় মনোকাঠামো দিয়ে নয়। ভারতের ইতিহাস ও সংগ্রামী

বিবর্তনের আলোকে ভারতীয় গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে বুঝতে হবে। সমাজবাদ মানে পুঁজিবাদবিরোধিতা বা রাষ্ট্রসর্বস্বতা নয়। শিল্পের জাতীয়করণ এবং যৌথ খামার বব্যস্থা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলেও সেগুলিই স্বয়ং সমাজতন্ত্র নয়। সমাজতন্ত্রে মানুষের উপর মানুষের শোষণ থাকবে না। নিরাপত্তাহীনতা থাকবে না, সম্পদ, পরিষেবা ও সুযোগ ন্যায়সঙ্গতভাবে বন্টিত হবে। কম্যুনিজমেও একই কথা বলা হয় কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা দলীয় একনায়কতন্ত্রে পর্যবসিত হয় যা সমাজবাদের ঠিক বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি করে। সমাজতন্ত্র সুনির্দিষ্ট কয়েকটি মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে মানবিক সমাজজীবন গঠনে অভিলাষী। কোন তত্ত্ব, দলীয় কর্মধারা বা ক্ষুদ্র সুবিধা লাভের জন্য এইসব মূল্যবোধকে এড়িয়ে যাওয়া আদর্শ সমাজতন্ত্রে সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্র তাই নিছক মতবাদী চিন্তাসূত্র নয়, এ এক নূতন সংস্কৃতি ও সভ্যতা। জয়প্রকাশের এই বক্তব্য প্রজা সোস্যালিজম পার্টির নয়া থিসিসেও স্থান পায়। এ থেকে একথাই সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে নিজের মৌলিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে জয়প্রকাশের কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সাহসিকতা ও absolutist মনোভাব দেখালেও কর্মপন্থা ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতা বা relativism এর আশ্রয় নিয়েছিলেন। একে কখনই সুবিধাবাদ বা opportunism বলা যাবে না। মূল্যবোধের কাঠামো সম্পর্কে জয়প্রকাশ যতটা অনমনীয় ছিলেন, মতাদর্শ বা কর্মপন্থা বিষয়ে ততটাই নমনীয়। এই অর্থে তাঁকে Pragmatic বা বাস্তবধর্মীও বলা চলে।

সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগের পূর্বে ১৯৪০ সালে ২য় প্রকাশ তাঁকে একটি চিঠি পাঠান যেখানে তিনি কংগ্রেসের বাইরে থেকে স্বতন্ত্র ও বিকল্প আন্দোলনের ব্যক্ত করেন। তিনি লেখেন যেন কংগ্রেস যদিও গণসংগঠন রাখে। প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কিন্তু তার নেতৃত্বের গণভিত্তির অভাব আছে। তাঁর ভাষায় 'The peasant labour and left national movements have been isolated. In these circumstances, it will be a great folly to look at the congress for mass revolutionary actoon. তিনি আরো লেখেন 'The task of destroying what would remain of impervalism and of carrying forward the democratic revolution, devolves on the workers peasants and lower moddle classes'. অনুগত দিনের কৃষি বিপ্লবের স্বপ্নকে ব্যক্ত করে তিনি বলেন যে চীনের মত ভারতবর্ষে কৃষকদের দ্বারা জমিদারতন্ত্র উচ্ছেদের ক্ষেত্রভূমি প্রস্তুত হয়নি কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজন এসেছে। কিষাণ সভাগুলির উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন এর অর্থ এই নয় যে প্রলেতারিয় বিপ্লবের কাজ স্থগিত থাকবে। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনও সমান্তরালভাবে চলবে। ২য় প্রকাশ কংগ্রেসের উপর এই সময় আস্থা রাখতে পারেননি। তাঁর ভাষায় 'The Congress no longer remains on instrument for revolutionary action and therefore we must prepare an independent basis for such action.' সুভাষচন্দ্র জয় প্রকাশের এই আহ্বানে সাড়া দেননি সম্ভবত এই কারণ যে দেশত্যাগের মানসিক প্রস্তুতি তিনি ততদিনে নিয়ে ফেলেছিলেন। দেশত্যাগ না করে জয়প্রকাশের আবেদনে সাড়া দিয়ে সুভাষচন্দ্র দেশের মধ্যে থেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিকল্প আন্দোলনের উদ্যোগ নিলে কি হতে পারতো তা জল্পনার বিষয়, তবে উপরোক্ত চিঠি থেকে একথায় স্পষ্ট যে এসময় জয়প্রকাশ মার্কসবাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসকে বৈপ্লবিক গণসংগঠন আখ্যা দিতে তাঁর প্রবল অনীহা ছিল।

স্বাধীনতার উত্তরকালে যখন তিনি সামগ্রিক বিপ্লব বা Total Revolution এর কথা বলেন, তখন মার্কসবাদকে ২য় প্রকাশ আর চূড়ান্ত সত্য বলে মনে করতেন না, কিন্তু তখনো অত্যাচারিত, উৎপীড়িত মানুষের মুক্তির কথা তিনি বারে বারে ঘোষণা করেছেন। ২৩ আগস্ট ১৯৭৫ তাঁর কারাগৃহের দিনলিপিতে ২য় প্রকাশ লিখেছেন 'The question is even larger. It is how to bring about systems change in society that is how to bring about what I have called a total revolution revolution in every sphere and aspect of society'. তিনি আরো লেখেন যে স্বাধীনতার ২০ বছর পরেও আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় কোন প্রকৃত পরিবর্তন হয়নি। তাঁর ভাষায় 'zamindari is abolished, land reform laws have been passed, untouchability has been legally prohibited and so on. But the village in most parts of India is still in the grip of the higher casies 2nd even the bigger and the medium land owners. The small and the marginal landowners and the landless the backward classes and the Harijans, these form the majority in must villages in most states. Yet their position continues to be miserable.'

২য় প্রকাশ আরো লেখেন যে কিছু শিল্প সহ জীবনবীমা, ব্যাঙ্ক ইত্যাদির জাতীয়করণ হয়েছে, সরকারী বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু তাতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে দেখা দিয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি।

৫ সেপ্টেম্বর তাঁর দিনলিপিতে ২য় প্রকাশ লেখেন 'All politics all education, all privileges are confined to thos tiny layer of society at the top, nor necessarily all capitalists, but all privileged, the public sector, leaving out agriculture is perhaps the larger part of the industrial economy'.

৭ অক্টোবর অর্থনৈতিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাকে ব্যক্ত করে ২য় প্রকাশ লেখেন 'It means revolution in the economic structure of society and its economic institions, as also their new, revolutionary forms Economic revolution implies bot change and her creation.' এ থেকে প্রমাণ হয় যে মার্কসবাদের পথ থেকে সরে এলেও ২য় প্রকাশের মনে অর্থনৈতিক বিপ্লবের অপরিহার্যতার কথা সদা জাগরুক ছিল। o

## ১.৬ সারাংশ

জয়প্রকাশ নারায়নের বর্ণময় রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে বারে বারে চিন্তার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমে তিনি ছিলেন কট্টর মার্কসবাদী, পরবর্তীকালে কম্যুনিজম সম্পর্কে মোহমুক্তির সাথে সাথে তিনি গান্ধিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং গান্ধিবাদকে আশ্রয় করে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। জয়প্রকাশ ছিলেন

আজন্ম ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ পূজারী। তিনি মতাদর্শের দাসত্ব করেন নি এবং কোন মতাদর্শকে চূড়ান্ত সত্য মনে করেন নি। তিনি কয়েকটি মৌলিক মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন যে কম্যুনিজম তার বাস্তবায়নের পক্ষে সহায়ক নয়, বরং প্রতিবন্ধকস্বরূপ। এই কারণেই জয়প্রকাশ মার্কসবাদের পথ থেকে সরে এসে গান্ধিবাদের পথে মানবমুক্তির পথ অনুসন্ধান করেন। একসময় গান্ধিবাদকে তিনি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করলেও এখন তিনি তাকেই আশ্রয় করে, মূল্যবোধাশ্রিত সমাজতন্ত্রের পথে পদক্ষেপ রাখেন। যা কোন পশ্চিমী মডেলের প্রতিরূপ ছিল না। ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তা গড়ে উঠেছিল।

## ১. ৭. অনুশীলনী

ক) জয়প্রকাশ মার্কসবাদকে প্রথমে কি দৃষ্টিতে দেখতেন তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন।

খ) জয়প্রকাশ কিভাবে মার্কসবাদ থেকে গান্ধিবাদে উত্তীর্ণ হলেন তা আলোচনা করুন।

গ) জয়প্রকাশ কি গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রবক্তা ছিলেন? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

## ১. ৮. গ্রন্থপঞ্জী


1. Ajit Bhattacharya Joyprakash Narayan—A Political Biography.

2. Nitis Dasgupta, The Social and Political theory of Jayprakash Narayan.

3. Bimal Prasad ed, A Revolutionary's Quest — Selected Writings of Jayprakash Narayan.

4. Bimal Prasad, Gandhi, Nehru and JP - studies in leadership.

5. Sandip Das ed, Who was this man? Jayprakash Narayan – A centenary Volume.

# পর্যায় : চার (Module - IV)

## আন্দোলন সমূহ

# একক - ১ স্বদেশী আন্দোলন

## গঠন

১.১ ভূমিকা

১.২ স্বদেশী আন্দোলন

১.৩ আন্দোলনের সূত্রপাত ও বিকাশ

১.৪ আন্দোলনের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা

১.৫ উপসংহার

১.৬ প্রশ্নাবলী

১.৭ সহায়ক পাঠ

## ১.১ ভূমিকা :

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বদেশী পর্যায়টিকে বুঝতে হলে সমসাময়িক সময়ের উদারপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যেকার মতভেদ ও পন্থা বিভাজনের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব সবসময়ই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটি মতাদর্শগত সমালোচনার ধারার মধ্যদিয়ে নিজেদের কিছু দাবী-দাওয়া পূরণে প্রত্যাশী ছিলেন। বিরপীতে চরমপন্থীদের আন্দোলনের মধ্যে ব্যাপক জন অংশগ্রহণের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। এছাড়াও চরমপন্থী আন্দোলনের মধ্যে ভারতীয় উদীয়মান বণিক শ্রেণী ও বুর্জোয়া শক্তির আর্থিক স্বতন্ত্রতার দাবীও গুরুত্ব পেয়েছিল, এবং তার সঙ্গে ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক স্বাতন্ত্রের ডাক, লর্ড কার্জন কৃত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। যা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল।

## ১.২ স্বদেশী আন্দোলন :

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৯০৫ খৃস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ এবং তার প্রতিবাদ স্বরূপ স্বদেশী আন্দোলন একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সংগ্রামের দুই বিশেষ পদ্ধতি ছিল স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গে র পরিকল্পনা ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ এর সমালোচনা শুরু করেন। নরমপন্থীদের প্রতিবাদ অবশ্যই সীমিত ছিল তাঁদের চিরাচরিত আবেদন-নিবেদন, স্মারকলিপি প্রদান, বক্তৃতাদান, প্রচারসভা ইত্যাদির মধ্যে। তাঁদের ধারণা ছিল 'বঙ্গভঙ্গ' নামক স্পর্যকাতর বিষয়টি কার্যে

পরিণত হওয়ার পূর্বেই ব্রিটিশ সরকার তাঁদের যুক্তি অনুধাবন করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বিরত থাকবেন। কিন্তু ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর তাঁদের আবেদন নিবেদন নীতির অকার্যকারিতা স্পষ্ট হয়ে যায়, ফলে তাঁরা তাঁদের প্রথাসিদ্ধ রাজনৈতিক পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসেন। জাতীয়তাবাদীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নরমপন্থী কৌশল ব্রিটিশ সরকারকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে ব্যর্থ।

বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে বাঙালীর ঐক্যের মূলে আঘাত করতে চেয়েছিলেন লর্ড কার্জন। কিন্তু যে ঐক্যকে তিনি ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিলেন ক্রমশ তাই-ই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে পল্লবিত হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সকল শ্রেণীর বাঙালী তথা জাতীয় নেতৃবৃন্দ যোগ দেন। কেম্বিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠী অবশ্য বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে আদর্শবাদ বা দেশপ্রেমের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। তাঁদের মতে, বঙ্গ ভঙ্গ কার্যকরী হলে এক বিশেষ 'এলিট' শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায় প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রধানতঃ উচ্চ মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত হিন্দু জনগোষ্ঠী যাঁরা সরকারী চাকুরী, আইনব্যবসা, সাংবাদিকতা, রাজনীতি, জমিদারী ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের ফলে এঁদের চাকুরী হারানো বা ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু এ ধরণের মত আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। উপরিউক্ত গোষ্ঠীর সঙ্কীর্ণ স্বার্থের উর্দ্ধে বাঙালীর জাতীয় ঐক্যবোধ ও চেতনাকে এ তত্ত্বে অস্বীকার করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ বাংলা ভাষা, সাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, ধর্ম এবং ঐতিহ্যবোধ বাঙালী জাতিকে এক ধরণের ঐক্য দান করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইংরেজ জাতির অহংকৃত আচরণ, দেশীয় মানুষের প্রতি অবজ্ঞা, সাধারণ বাঙালীর অর্থনৈতিক অসন্তোষ, জীবনযাত্রার মান হ্রাস ইত্যাদি যা ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে বাঙালীর মোহভঙ্গ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস, স্বামী বিবেকানন্দের জাতি গঠনের উদাত্ত আহ্বান বাঙালী হৃদয়ে তীব্র আবেগ সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত বাঙালীর মর্মমূলে আঘাত করে তাকে প্রতিবাদী করে তোলে। বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় একে একটি 'গভীর জাতীয় বিপদ' বলে অভিহিত করেন। প্রাথমিক পর্বে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ মধ্যপন্থীদের হাতে থাকলেও অল্প সময়ের মধ্যেই জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ যথা বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। শহরাঞ্চলে এর সূত্রপাত হলেও ক্রমশ গ্রামবাংলায় ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভের আগুন।

## ১.৩ আন্দোলনের সূত্রপাত ও বিকাশ :

১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রথম বাঙালীর কর্ণগোচর হয়। তারপর অর্থাৎ ১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আবেদন নিবেদনের নরমপন্থী কৌশলই প্রাধান্য লাভ করেছিল। শেষ পর্যন্ত সকল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ব্রিটিশ সরকার ১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই বঙ্গ ভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এরপর থেকেই জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ তাঁদের রণনীতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ

'বেঙ্গলী', 'হিতবাদী', 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতি পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালান। ১৯০৪ সালের মার্চ ও ১৯০৫ সালের জানুয়ারীতে কলকাতার টাউনহলে অনুষ্ঠীত হয় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা। ১৯০৫ এর ৭ই আগষ্ট কলকাতার টাউনহলের সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতো নেতা যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন হিসাবে বিদেশী দ্রব্য বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৯০৫-এর ১৬ই অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হলে সারা বাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে। ঐ দিনটি উদ্‌যাপিত হয় জাতীয় শোক দিবস হিসেবে। সারা ভারতবর্ষে পালিত হয় সাধারণ ধর্মঘট। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় 'রাখীবন্ধন' উৎসব এবং প্রতিটি গৃহে পালিত হয় 'অরন্ধন'। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান আলোড়িত করে সমগ্র বাঙালী সমাজকে। বঙ্গ ভঙ্গ বাঙালীকে বিভক্ত করার পরিবর্তে ঐক্যবদ্ধ করে। কলকাতা থেকে বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি দূরবর্তী অঞ্চলেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

বিদেশী দ্রব্য বয়কটের পাশাপাশি স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার ছিল এই আন্দোলনের মূল অনুপ্রেরণা। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী অবশ্য স্বদেশী ও বয়কটের আদর্শের মধ্যে অভিনবত্ব খুঁজে পাননি। তিনি দেখিয়েছেন ১৯০৫ সালের পূর্বে আমেরিকা, আয়ারল্যান্ড ও চীনের বিপ্লবীরা এই পদ্ধতিকে কাজে লাগান। ভারতবর্ষেও বাংলাদেশের রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, ঠাকুর পরিবার, মহারাষ্ট্রের গোপাল রাও দেশমুখ, জি.ভি. যোশী, এম.জি. রাণাডে প্রমুখ ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতির জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বদেশী ভাবাদর্শ প্রচার করেন। ১৮৭০-এর দশকে ব্রিটিশ জনমতকে জাগ্রত করার উপায় হিসেবে ভোলানাথ চন্দ্র বয়কটের উপযোগীতা ব্যাখ্যা করেছিলেন। ১৮৯৬ সালে বাল গঙ্গাধর তিলক একটি সার্বিক বয়কট আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। ধীরে ধীরে এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্বদেশী ও বয়কট একে অপরের পরিপূরক।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রাবল্য স্বদেশী ও বয়কটের আদর্শকে এক নতুন তাৎপর্য দান করেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের 'বারানসী অধিবেশনে' বাংলায় স্বদেশী বয়কটের প্রতি কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থন দেখা গেল। ধীরে ধীরে আন্দোলনের রাশ নরমপন্থী নেতৃত্বের কাছ থেকে চলে যেতে থাকে চরমপন্থী নেতাদের হাতে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আরো ব্যাপক এবং তাঁদের কাছে বয়কট ছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের হাতিয়ার। অপরদিকে, বয়কটের অর্থ এবং স্বদেশীর লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ সম্পর্কে নরমপন্থী-চরমপন্থী বিরোধ বাংলার রাজনৈতিক জীবনকে আলোড়িত করে তুলেছিল।

স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলায় তিনটি পৃথক ধারার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। এগুলি ছিল যথাক্রমে 'গঠনমূলক স্বদেশী', 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' এবং 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ'। ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের ভাষায় ''গঠনমূলক স্বদেশী',— নিষ্ফল ও আত্মঅবমাননাকর 'ভিক্ষাবৃত্তি'র রাজনীতি বর্জন করে, স্বদেশী শিল্প, জাতীয় শিক্ষা আর গ্রামোন্নয়ন ও সংগঠনের মাধ্যমে আত্মসহায়তা।'' গঠনমূলক কর্মসূচীর মধ্যে ছিল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরীর অপেশাদারী উদ্যোগ, জাতীয় শিক্ষা, সালিশি আদালত এবং গ্রামীণ সংগঠন। এই উদ্যোগেরই ফলশ্রুতি ছিল প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' স্থাপন, নীলরতন সরকারের ব্যবসায়িক উদ্যোগ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জাতীয় শিক্ষানীতির ঘোষণা। ''স্বদেশী সমাজ'' প্রবন্ধে (১৯০৪ খৃঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে বাংলার গ্রাম সমাজের পুনরুত্থান, পুনর্গঠন ও আত্মশক্তি অর্জনের ওপর

জোর দেন। যে আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯০৭ সালের মধ্যে বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রায় এক হাজারটি সমিতি স্থাপিত হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ''স্বদেশ বান্ধব সমিতি''। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপি স্বদেশীয় জোয়ার আসে। সূতীকল, সাবান, দেশলাই, চামড়া প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পের বিকাশ ঘটে, উন্নতি হয় তাঁতশিল্প ও নদী পরিবহনের ক্ষেত্রে। জাতীয় শিক্ষানীতির ফলস্বরূপ স্থাপিত হয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার দেখিয়েছেন কুটীর শিল্পের ক্ষেত্রে তো বটেই বৃহৎ শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রেও নতুন প্রেরণা নিয়ে এসেছিল স্বদেশী আন্দোলন। সম্প্রতি ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, স্বদেশী আন্দোলনে আদর্শবাদের ঘাটতি না থাকলেও বিলিতি বাণিজ্যকে তা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারেনি।

গঠনমূলক স্বদেশীর অপর উল্লেখযোগ্য দিক ছিল 'জাতীয় শিক্ষা'। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ডন' পত্রিকা ইংরেজ প্রভাবমুক্ত জাতীয় শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এ সময়ে লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪), কুখ্যাত কার্লাইল সার্কুলার (১৯০৫) জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে সক্রিয় করে তোলে। ১৯০৬ সালের ১৫ই আগষ্ট গঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। গড়ে ওঠে 'বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ', 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট' ও জাতীয় বিদ্যালয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিজাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করে জাতীয় বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ছাত্রদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করা।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বা গোপালকৃষ্ণ গোখলের মতো নরমপন্থী নেতারা বয়কটকে একটি সাময়িক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল বিদেশী পণ্য বয়কট করলে ইংরেজ সরকারকে অর্থনৈতিক দিক থেকে চাপে ফেলা যাবে যা বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করবে। অপরদিকে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ এই যুক্তিতে স্থিত ছিলেন যে স্বরাজ বা স্বাধীনতা ছাড়া জাতীয় জীবনে প্রকৃত পুনর্জাগরণ অসম্ভব। তাঁদের কাছে বয়কটের অর্থ শুধুমাত্র বিলাতি পণ্য বর্জনই ছিল না তাঁরা চেয়েছিলেন শিক্ষা, বিচার, আইন পরিষদ, পৌরসভা প্রভৃতি শাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বয়কটকে প্রয়োগ করতে। অরবিন্দ ঘোষ যাকে বলেছিলেন ''নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ''। কিন্তু স্বরাজের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল গণ আন্দোলন ও সাধারণ মানুষকে আন্দোলনে সামিল করা। এক্ষেত্রে চরমপন্থীরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ না করলেও এজন্য তাঁরা দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন যথা সমিতি স্থাপন এবং শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগীতা। গ্রামাঞ্চলে এইসব সমিতি স্বদেশী আদর্শ প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি', ফরিদপুরের 'ব্রতী', ময়মনসিংহের 'সুহৃদ' ও 'সাধনা', বরিশালের 'স্বদেশবান্ধব সমিতি' এইসব সমিতিগুলির অধীনে ছিল বহু শাখা সমিতি। নৈতিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণ, জনহিতকর কাজ, স্বদেশী বাণী প্রচার, স্বদেশী শিল্প সংগঠন, স্বদেশী শিক্ষা, সালিশি আদালত ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণকে আন্দোলনমুখী করে তোলার চেষ্টা করা হয়। ১৯০৮ সাল পর্যন্ত এইসব সমিতিগুলির একটি বড় অংশের মুখ্য কাজ ছিল গণসংযোগ। পত্রপত্রিকা, পুস্তিকা, ভাষণ, দেশাত্মবোধক গান, নটিক, যাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা শুরু হয়।

স্বদেশী অআন্দোলনের প্রভাবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল নতুন সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন, মুকুন্দ দাস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখের লেখা গান জাতীয়তাবাদীদের প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল।

পল্লীগীতি, জুরিগান ইত্যাদি হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসু দেশজ ঐতিহ্যকেই প্রকাশ করেন।

স্বদেশী আদর্শ উদ্বুদ্ধ করেছিল শ্রমিক সম্প্রদায়কেও। বিভিন্ন কলে কারখানায় পালিত হয় ধর্মঘট। এগুলির মূল কারণ ছিল অবশ্যই শ্রমিকদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগের প্রতিকার ও নানা দাবি দাওয়া কিন্তু এগুলিকে মূলধন করে চরমপন্থী নেতারা তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার জন্য শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রচেষ্টা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯০৮ সালের মধ্যপর্ব থেকে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে শুরু করে। ঐতিহাসিক সুরাট কংগ্রেসে চরমপন্থীদের পরাজয়ের ফলে নরমপন্থীরা পুনরায় প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। ফলে বয়কট ও স্বদেশীর মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রচেষ্টা বহুলাংশে ব্যহত হয়। সরকারী দমননীতি এর অন্যতম কারণ ছিল। এই অবস্থায় বাংলার জাতীয় আন্দোলন দিক পরিবর্তন করে। জন্ম নেয় 'বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ'। ব্রিটিশ আধিকারিক এবং তাদের ভারতীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়। ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের মতে, এই সময় থেকেই অহিংসার পরিবর্তে হিংসার আশ্রয় নেওয়া শুরু হয়। গণআন্দোলন পরিবর্তিত হয় শিক্ষিত উচ্চবর্গের রাজনীতিতে।

স্বদেশী আন্দোলনে প্রধাণতঃ বাংলার শিক্ষিত যুব ও ছাত্র সম্প্রদায়ই সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। বিদেশী পণ্যের বহ্নুৎসব, পিকেটিং, স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়, স্কুল কলেজের ক্লাস বয়কট করে আন্দোলনের শরিক হওয়ার ক্ষেত্রে তারাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ব্রিটিশ সরকার কুখ্যাত কার্লাইল সার্কুলারের মাধ্যমে ছাত্র সমাজকে দমন করতে উদ্যত হলেও ছাত্রসমাজকে দমন করা যায়নি। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যথা শিক্ষক, আইনজীবি, চিকিৎসব, সাংবাদিক, বিভিন্ন বৃত্তিজীবি মানুষ যুক্ত ছিলেন এই আন্দোলনের সঙ্গে। বাংলার ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এই আন্দোলনে যুক্ত ছিল না, বরং অনেক ক্ষেত্র তাঁরা এর বিরোধীতা করেন। অপরদিকে নিম্নবিত্ত কারিগর ও শ্রমিকশ্রেনী স্বদেশী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। নারী সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটতে শুরু করে এই আন্দোলনের মাধ্যমে। শহুরে মধ্যবিত্ত বা সাধারণ নিম্নবিত্ত ঘরের নারীরাও এই আন্দোলনকে ফলপ্রসু করে তোলার জন্য নিজেদের গহনা, টাকা স্বদেশী তহবিলে দান করেন। অংশ নেন সভা সামিতি ও পিকেটিংয়ে। বহু জমিদার যেমন কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, নদীয়ার বিপ্রদাস পাল চৌধুরী প্রমুখ স্বদেশী অর্থ ভান্ডারে বিপুল অর্থ দান করেন। এছাড়া নাটোরের মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পাবনার আশুতোষ চৌধুরী, উত্তরপাড়ার রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় এই আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তবে বহু জমিদারই সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য ও রাজভক্তি প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হননি। বড় জমিদারদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকজনই শেষ পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

এই আন্দোলনে মুসলমান সমাজের অংশগ্রহণ নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা মুসলমানদের স্বার্থের অনুকুল হলেও বহু মুসলমানই স্বদেশী আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন চলাকালীন সময়ে হিন্দু-মুসলমানদের বহু যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিও লক্ষ করা যায়। রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানেও বহু মুসলমান যোগদান করেন। তবে এসব সত্ত্বেও মুসলিম সমাজের অধিকাংশই এই আন্দোলনের প্রতি নির্লিপ্ত ছিলেন। ঐতিহাসিক ত্রিপাঠীর মতে হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য নিয়ে কিছু কিছু চরমপন্থীর

এতো যুক্তিহীন গোঁড়ামি ছিল যে তাঁরা মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখেন। তবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিণীকুমার দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে বারবারই ধ্বনিত হয়েছে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা।

## ১.৪ আন্দোলনের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা :

স্বদেশী আন্দোলন ভারতে প্রথম গণ আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। এই আন্দোলন বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও শুধুমাত্র বঙ্গভঙ্গ রদ করার লক্ষ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল না। ক্রমশ এই আন্দোলনের মধ্যে স্বরাজ ও স্বাধীনতার দাবি অঙ্কুরিত হতে থাকে। বিদেশী পণ্য বর্জন ও আত্মশক্তির মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠায় এ আন্দোলন অনেকাংশে সফল হয়েছিল। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পরিধিকে আরো প্রসারিত করে তাকে সার্বিকভাবে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে পরোক্ষ প্রতিরোধের রূপ দেওয়া হয়েছিল এই আন্দোলনে। শুধুমাত্র ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বা স্কুল কলেজ বয়কট করার সাথে আইন-আদালত, পৌরসভা, আইনসভা ইত্যাদি সরকারের সঙ্গে সকল সংস্রব বর্জন করার নেশায় উগ্র হয়ে ওঠে আন্দোলনের গতি। অমলেশ ত্রিপাঠী আরো বলেছেন যে, স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা বুঝেছিলেন যে ব্রিটিশের ভুয়ো মর্যাদার মূলে আঘাত হানাই তাদের সম্পর্কে মোহভঙ্গের পথ।

"ব্রিটিশ বাণিজ্যের শোষনলোলুপ মুখ যদি সংগঠিত অসহযোগীতা দিয়ে বন্ধ করা যায়, ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের অত্যাচারী হাত যদি পঙ্গু করে দেওয়া যায়, তবেই তাদের শাসনতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে বিকল করে দেওয়া সম্ভব।"

স্বদেশী পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার এবং বিদেশী পণ্যদ্রব্য বর্জন ছিল স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। এর মাধ্যমেই গড়ে ওঠে স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, বীমা এবং জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সীমিত অর্থে এই আন্দোলনের সাফল্য অস্বীকার করা যায় না। এ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই ১৯১১ সালে মূল বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। কিন্তু বঙ্গ বিভাগ রদ হলেও বাংলার গুরুত্ব হ্রাসের জন্য ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। তবে বঙ্গবিভাগ রদের সুদূরপ্রসারী ফল ছিল ১৯৪৭ খৃঃ ভারত বিভাগের সময় আসাম প্রদেশের ভারতভুক্তি। ১৯১১ খৃঃ বঙ্গবিভাগ রদ না হলে সম্ভবত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশটি ভারত বিভাগের সময় পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত।

আন্দোলনের অস্ত্র হিসেবে বয়কটও প্রথমদিকে কিছুটা সফল হয়েছিল। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার দেখিয়েছেন যে ১৯০৫ সালের অগাষ্ট মাসের তুলনায় ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুতীবস্ত্র, লবণ, সিগারেট, জুতো ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমদানির পরিমান উল্লেখযোগ্য না হলেও যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল। তবে আমদানি হ্রাসের জন্য বয়কট ছাড়া অন্যান্য কারণও ছিল। ১৯০৭-০৮ এ আমদানির পরিমান আবার বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে বিদেশী দ্রব্য বয়কট যে সম্পূর্ণরূপে সম্ভব নয়, একথা স্বদেশী নেতৃবর্গের অজানা ছিল না। কারণ, বয়কটের সমর্থক ছিল শিক্ষিত সম্প্রদায়। সাধারণ দরিদ্র মানুষ এ ব্যাপারে উদাসীন ছিল। সাধারণ মানুষের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে বয়কট সফল হয়নি। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে, বাংলার ঐতিহ্যমন্ডিত কুটির

শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটলেও স্বল্প প্রচেষ্টা ব্যতীত আধুনিক ভারী শিল্পের বিকাশ সেভাবে হয়নি। সরকারী আনুকুল্যে ও সংরক্ষণ নীতি ছাড়া এ ধরণের প্রচেষ্টার ব্যর্থতা স্বাভাবিক ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বয়কটকে একটি নেতিবাচক কৌশল হিসেবে দেখেছিলেন। তাঁর মতে, বিদেশী পণ্যদ্রব্যের তুলনায় সস্তায় বা অন্তত সমমূল্যে দেশীয় বস্ত্র বা পণ্যের যোগান ব্যতীত বয়কট হবে দরিদ্র মানুষের ওপর অত্যাচার বিশেষ।

স্বদেশী আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা ছিল এর হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী চরিত্র। একথা সত্য যে ব্রিটিশ সরকারের সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি সত্ত্বেও অনেক মুসলমান এ আন্দোলনে যোগ দেন। কিন্তু নেতৃত্বের দায়িত্ব উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাতে থাকায় ও আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে হিন্দু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যথা গঙ্গ স্নান, রাখীবন্ধন ইত্যাদিক সূচনা এবং বহু স্বদেশী নেতার প্রকাশ্য বক্তৃতায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার 'বন্দে মাতরম', 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকায় ব্রিটিশ বিরোধী উগ্র রাজনীতির সঙ্গে উগ্র হিন্দুত্বের প্রচার প্রভৃতি মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। তাঁরা আন্দোলনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।

১৯০৬ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ প্রথম থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধীতা করে। তখন থেকেই বাংলার বিভিন্ন স্থানে যেমন ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, জামালপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা যায়। বলপূর্বক বয়কট চাপানো দরিদ্র মুসলমানদের স্বার্থ কিভাবে ক্ষুণ্ণ করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে।

আন্দোলনের অপর একটি সীমাবদ্ধতা ছিল আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে গ্রামীণ অর্থনীতি বা কৃষকদের উন্নতির সুস্পষ্ট কর্মসূচীর অভাব। অশ্বিণীকুমার দত্তের 'স্বদেশবান্ধব সমিতি' সীমিত অঞ্চলে কিছু কর্মসূচী নিলেও সর্বত্র তা ছিল না। তাই বলা যায় স্বদেশী আন্দোলন সমাজের তৃণমূল স্তরকে সেভাবে আকৃষ্ট করতে পারে নি। জনগণকে আন্দোলনমুখী করে তোলার উদ্দেশ্যে গঠীত সমিতিগুলির সদস্য ছিলেন প্রধানত শিক্ষিত উচ্চবর্গের মানুষরাই। ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে উচ্চজাতীয় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রায়ই পীড়নমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করায় নিম্নজাতীর কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষ দূরে সরে যায়। শুধুমাত্র শারীরীক পীড়ন করা হত তা নয়, স্বদেশী নেতারা সামাজিক বলপ্রয়োগ বা সামাজিক বয়কটও প্রয়োগ করতেন। '...... নিম্নজাতীর কৃষকদের অনীহার কারণ ছিল নেতাদের সঙ্গে তাদের স্বার্থের বিভিন্নতা। স্বদেশী আন্দোলনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমাজের নিম্নবর্গের আশা-আকাঙ্খা পূরণের কোন স্থান ছিল না বা স্বীকৃতি দেওয়ারও জায়গা ছিল না। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী যথার্থই বলেছেন, জনতার সংগ্রামকে সংঘটিত করার কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করতে চরমপন্থীরা ব্যর্থ হন। "তাঁরাও সংগ্রামের আন্তরিক আহ্বান সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন নি। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং অসহযোগের আদর্শ তাঁদের কাছেও শুধু ভাববিলাস হয়েই রইল। তাঁদের নেতৃত্বেও এমন কোনো সম্ভাবনাময় জাতীয় সংগঠন গড়ে উঠল না যার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দেওয়া যায়।"

আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নরমপন্থী-চরমপন্থী বিরোধও এর ভিত্তিকে দূর্বল করেছিল। ১৯০৬-এর কলকাতা কংগ্রেসে উভয় পক্ষের তীব্র বিতর্ক সুরাট কংগ্রেসে (১৯০৭) যে ভাঙন নিয়ে আসে তা ছিল স্বদেশী আন্দোলনের ওপর বড় আঘাত। এছাড়া এ আন্দোলন বাংলার বাইরে কিছু কিছু অঞ্চলে প্রসারিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল একটি আঞ্চলিক আন্দোলন, একটি সর্বভারতীয় প্রয়াসের অভাব এ আন্দোলনকে দূর্বল করেছিল।

সর্বোপরি, স্বদেশী আন্দোলন ক্রমশঃ চরমপন্থী ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদে পরিণত হতে থাকলে তা দ্রুত জনসংযোগ হারাতে থাকে। ১৯০৭-০৮ খৃষ্টাব্দ নাগাদ এই আন্দোলন তার গতিবেগ হারিয়ে ফেলে।

স্বদেশী আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়ে পড়ার একটি অনিবার্য কারন ছিল সরকারী দমন নীতি ও পুলিশী অত্যাচার। ব্রিটিশ সরকার কঠোর হাতে এই আন্দোলন দমন করতে তৎপর ছিল। সমকালীন সংবদপত্রগুলিতে পুলিশী অত্যাচারের কাহিনী পাওয়া যায়। জনসভা মিছিল নিষিদ্ধকরণ, ছাত্রদের বিরুদ্ধে কার্লাইল সার্কুলার জারি, লাঠিচার্জ, দৈহিক নির্যাতন, কারাদন্ড আন্দোলনকে গতিহীন করে তুলেছিল।

## ১.৫ উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায় যে, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্বদেশী আন্দোলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ আন্দোলনই জাতীয় আন্দোলনকে নরমপন্থীদের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি থেকে গণ আন্দোলনে রূপান্তরে সহায়তা করে। দৃঢ় হয় বাঙালীর ঐক্যচেতনা। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যে আবেগ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ উৎসারিত হয়, উদ্ভব হয় যে আদর্শবাদের তা ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র ভারতবাসীর জীবনধারাকে প্রভাবিত করে। এ থেকেই উঠে আসে স্বরাজের দাবী। ব্রিটিশ শাসন ও সভ্যতা সম্পর্কে মোহমুক্তির সূত্রপাত হয়। পরবর্তীকালে গান্ধীজির আরো কঠিন সংগ্রামের বীজ রোপিত হয়। সে সংগ্রাম ছিল আরো কঠিন কেননা তা ছিল অহিংসা নীতির কঠোর নিয়মে আবদ্ধ। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে তাই বলা যায় যে এসময় "দেখা গেল ভারতবর্ষ মনে প্রাণে প্রস্তুত। গ্রামে-গঞ্জে ছোটবড়ো শহরের ধুলোমাটি থেকে উঠে দাঁড়াল লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী। মৃত্যুভয় আর তাদের কাউকে কাতর করতে পারে নি, কেন না ইতিমধ্যে, ১৯০৫-১০ এই বছরগুলিতে অমৃত-পথ-যাত্রীদের কাছ থেকে জীবনমৃত্যুর গোপন রহস্যটা তারা শিখে নিয়েছিল।"

## ১.৬ প্রশ্নাবলী :

১। স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিবর্তন বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। (১৮)

২। স্বদেশী আন্দোলনের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করুন। (১৮)

৩। স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে পৃথক পৃথক আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল সে বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করুন। (১৮)

৪। স্বদেশী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করুন। (১২)

৫। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে একটি পর্যালোচনামূলক টীকা লিখুন। (১২)

৬। স্বদেশী আন্দোলনে বিলাতী দ্রব্য বয়কট আন্দোলন বিষয়ে রচনা লিখুন। (১২)

৭। টীকা লিখুন — প্রত্যেকটি ৭ নম্বর করে

(ক) বিলাতী দ্রব্য বয়কট

(খ) গঠনমূলক স্বদেশী

(গ) বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ

(ঘ) সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব

(ঙ) স্বদেশী আন্দোলনের অর্থনৈতিক কর্মসূচী।

## ১.৭ সহায়ক পাঠ


১। সুমিত সরকার, স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, ১৯৯৩-৯৮, পি.পি. এইচ্, ১৯৭৩।

২। আপ্পাদুরাই, পোলিটিক্যাল থটস্ ইন ইন্ডিয়া, পাবলিশার্স, নিউদিল্লী, ১৯৯২।

৩। সৌরীন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, সুবর্ণরেখা, ১৯৬৮।

৪। কেশব চৌধুরী, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ, প.বঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪।

৫। অমলেশ ত্রিপাঠি— ভারতের মুক্তি সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস।

# একক - ২ (ক) কৃষক আন্দোলন

## গঠন

২.১ ভূমিকা

২.২ কৃষক আন্দোলন

২.৩ উপসংহার

২.৪ প্রশ্নাবলী

২.৫ সহায়ক পাঠ

## পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠ্যাংশটি অধ্যায়নের উদ্দেশ্য হল :

- কৃষি-নির্ভর ভারতীয় অর্থনীতি তার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও সামাজিক রীতিনীতির ওপর কি ধরনের প্রভাব ফেলে থাকে তার সন্ধান।
- কৃষক শ্রেণীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভারত ইতিহাসের আধুনিক পর্বেই প্রথম সংগঠিত আন্দোলন শুরু হয়—সেই আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি জেনে নেওয়া।
- আন্দোলনকালে উদ্ভূত সমস্যাবলীর পর্যালোচনা ও তার থেকে শিক্ষণীয় বস্তুর সঙ্গে পরিচিতি।

## ২.১ ভূমিকা :

ভারতীয় সমাজ মূলত কৃষি অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে আছে। কৃষি সম্পর্কের মধ্যে যখনই শোষন-পীড়নমূলক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তখনই ভারতীয় সমাজে কৃষক আন্দোলন দেখা দিয়েছে। অনেকটাই ভূমি রাজস্ব ভিত্তিক, স্থানীয় স্তরের অসন্তোষ থেকেই কৃষক আন্দোলনগুলির উদ্ভব। তবে স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিপথ বিস্তৃত হবার সাথে সাথে এবং ভারতে বামপন্থী মতাদর্শ কার্যকরী ভাবে বিস্তার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক আন্দোলনগুলি এক জাতীয়তাবাদী চরিত্র লাভ করেছিল। বিশেষ করে সর্বভারতীয় কিষানসভা প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভারতের প্রচলিত কৃষক আন্দোলনের চরিত্রও আচমকা পরিবর্তিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে বিদেশী শাসক, বেনিয়া, পাতওয়ারী শ্রেনী প্রভৃতিরা কৃষকদের উপর যে দমন-পীড়ন এবং অত্যাচার, বঞ্চনার ধারা চালিয়ে যাচ্ছিল, প্রথমে যার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ও পরবর্তীতে সংগঠিত নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে কৃষকরা তাদের আন্দোলন সংগঠিত করেছিল।

## ২.২ কৃষক আন্দোলন

প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কৃষক অসন্তোষ পরাধীন ভারতে উনবিংশ শতাব্দীতে বারংবার সংগঠিত হতে দেখা গেছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এই অসন্তোষের হাত ধরে যে সব আন্দোলনের উদ্ভব হয় সেখানে যে নতুন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা হল — জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এই কৃষক আন্দোলনগুলিকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল আবার পরোক্ষে এই আন্দোলনগুলিও জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সমকালীন কৃষক আন্দোলনগুলি সম্পর্কে আলোচনা করলে আমরা উপরোক্ত বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে জানতে পারব।

প্রধানত কৃষকদের রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে উঠতে শুরু করে ১৯১৮ সালের পর। এই সময় থেকে কৃষকদের সংগঠিত জাতীয় সংগ্রামে অংশ নিতে দেখা যায়। এর পরবর্তী সময়ে কৃষকরা স্বকর্মসূচী অনুসারে স্বনেতৃত্বাধীন সংগঠন গড়ে তুলতে শুরু করে।

১৯১৮-এর পূর্বে সংগঠিত কিছু কৃষক আন্দোলনের কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। এগুলি হল ১৮৭০, ১৮৯৬, ১৮৯৭ সালের ভয়াণক দুর্ভিক্ষের ফলে দুর্দশাগ্রস্থ কৃষকদের আন্দোলন। অর্থনৈতিক মন্দা ও সেইসঙ্গে জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

এর পরবর্তী সময়ে ১৮৭০ সালে খাজনা দিতে কৃষকরা অস্বীকৃত হওয়ায় বাংলাদেশের বিশাল অঞ্চলে যে অরাজকতা দেখা দেয় তা দমন করা হয় এবং অণুসন্ধান বাহিনী নিযুক্ত করে ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রনয়ন করা হয়। এর মধ্যবর্তী পর্যায়ে আমেরিকার তুলোর দামে মন্দা কৃষকদের প্রভাবিত করে। দাক্ষিণাত্যে মারাঠা কৃষকরা অত্যাধিক ঋণভারের তাড়নায় ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে মহাজনদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে পাঞ্জাবের কৃষক বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০২ সালে সরকার কর্তৃক Punjab Alienation Act প্রবর্তিত হয়।

লর্ড কার্জনের সময়ে ভূমিরাজস্ব নীতির ব্যাপারে ভারত সরকার কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করে যার প্রধান লক্ষ্য ছিল জমিদারদের চাহিদার অত্যাধিক চাপ থেকে কৃষকদের রক্ষা করা। লর্ড কার্জনের দাবী ছিল 'সরকারই কৃষকদের জন্য বেশি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।'

এরপর ১৯১৭-১৮ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে বিহারের চম্পারণে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। এই ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধীজী চম্পারণেই প্রথম তার সত্যাগ্রহ পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। আন্দোলনের চাপে সরকার গান্ধীজী কে সভ্য হিসাবে নিযুক্ত করে যে অনুসন্ধান বাহিনী গঠন করেন তার প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আইন প্রনীত হয়। সে আইনে কৃষকদের ভার আংশিক লাঘব করা হয়।

এন.জি. রঙ্গা এই সংগ্রামে গান্ধীর নেতৃত্বের সমালোচনা করে বলেন — 'অস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে রমেশচন্দ্র দত্তর নেতৃত্ব কংগ্রেসের পূর্বেকার বিক্ষোভ যেমন জমিদারদের হাতে আমাদের কৃষকদের শোষণ ধর্তব্যেই নেয়নি তেমনি চম্পারনে মহাত্মার নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ চম্পারন কৃষকদের ভয়াবহ দারিদ্র ও দুর্দশার

মূল কারণগুলি যেমন অত্যাধিক খাজনা ও ঋণভার এর বিরুদ্ধে কোনো সংগ্রামের পথে নিয়ে যেতে পারেনি...'

এরপর ভূমিরাজস্ব আদায়ের বিরোধিতা করে কায়রা জেলায় কৃষকদের আন্দোলন হয়। গান্ধীজী যাকে সত্যাগ্রহের রূপ দেন। শস্যহানি হওয়ার দরুন এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯১৯ সালের অসহযোগ আন্দোলনের আগে যে সমস্ত কৃষক আন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছিল উপরোক্ত আন্দোলনগুলি হল তার মধ্যে প্রধান। তবে অনেকক্ষেত্রে এই সংগ্রামগুলোর রাজনৈতিক সারবত্তার অভাব ছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের দ্বারা সংগঠিত নয় এমন কৃষক আন্দোলন হয়েছিল যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কর্ণাটকের গুন্টুর জেলার কৃষক আন্দোলন। অযোধ্যায় রায়তদের আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আন্দোলনের কেন্দ্রে ছিল রায়বেরিলি, যোনাবাদ প্রভৃতি জেলা। ১৯২১ সালে অযোধ্যা খাজনা আইন' আংশিক ভাবে রায়তদের দাবী মিটিয়েছিল।

ওই বছরের শেষে অযোধ্যায় পুনরায় যে আন্দোলন শুরু হয় তা ছিল 'একতা আন্দোলন'। প্রথমে কংগ্রেস ও খিলাফৎ নেতারা এই আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। এই আন্দোলন হয়েছিল 'একতা বা ঐক্য' আন্দোলন নামে। কৃষকদের অসন্তোষের প্রধান কারন ছিল — নির্ধারিত খাজনার চেয়ে সাধারনত ৫০ শতাংশ বেশি খাজনা আদায়, খাজনা আদায়ের ইজারা প্রাপ্ত ঠিকাদারদের নিপীড়নের ও উৎপাদিত ফসলের একাংশ খাজনা দেওয়ার প্রথা প্রভৃতি।

১৯২২-এর মোপালা বিদ্রোহের ভিত্তি ছিল একসঙ্গে সাম্প্রদায়িকা এবং অর্থনৈতিক কারন। মোপালা এই মুসলমান সম্প্রদায়কে প্রবলভাবে শোষন করত। এই বিদ্রোহের প্রকৃতি আর্থিক হলেও তা রূপ ধারন করে ধর্মীয়। মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এই আন্দোলনের অর্থনৈতিক অসন্তোষকে সাম্প্রদায়িক রূপ দান করেন।

তবে ভারতে এটা বহুল প্রচলিত ছিল, যে সমস্ত অঞ্চলে হিন্দুরা জমিদার এবং মুসলমানরা ছিল কৃষক সেখানে প্রায়ই শ্রেনীবিরোধ সাম্প্রদায়িকতার রূপ নিত। এখানে সীতারাম রাজুর নেতৃত্বে তালুকে কায়াদের আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়।

অসহযোগ আন্দোলনের পর ভারতীয় কৃষকরা শ্রেনী সংগঠন তৈরির পথে অগ্রসর হয়। ১৯২৩ সালে অন্ধ্রে চাষী ও মজদুর ইউনিয়ন। ১৯২৬-১৯২৭ সালে পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তরপ্রদেশে কিষাণসভা গড়ে ওঠে। ১৯২৮ সালে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ কিষাণসভার প্রতিনিধিরা মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে সার্বজনীন ভোটাধিকার, মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার এবং জাতীয় স্বাধীনতার দাবী সহ এক দাবীপত্র পেশ করেন।

১৯২৮ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে রায়ত সমিতি গঠিত হয়। এরপর গুজরাট বরদৌলি তালুকে দুটি আন্দোলন সংঘটিত হয়। যার মধ্যে প্রথমটার নেতা ছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল। এই আন্দোলনের আংশিক সাফল্য কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

১৯৩০ সালে গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের নিকট একাদশ দফা দাবী পেশ করেন যদিও বামপন্থী জাতীয়তাবাদী ও সমাজতন্ত্রীরা গান্ধীর সমালোচনা করেন কারন তাদের বক্তব্য ছিল গান্ধীজী শ্রমিক ও কৃষকশ্রেনীর মূল চাহিদা যেমন জমিদারদের খাজনার উল্লেখযোগ্য হ্রাস, কৃষকদের কৃষি ঋণভার মুকুব করা ইত্যাদিকে তার এই দাবীর অন্তর্ভুক্ত করেননি।

১৯২৯ সালের বিশ্বকৃষি ও সাধারণ অর্থনৈতিক মন্দা ভারতীয় কৃষকদের দারুণ করেছিল। এই সময় কংগ্রেসের অনুমোদন ও অননুমোদনেও উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র, গুজরাট ও কর্ণাটক প্রভৃতি অংশে আন্দোলন হয়েছিল।

ভারতীয় সংস্কারপন্থী জাতীয়তাবাদী ও কৃষক আন্দোলনের অগ্রসর ব্যক্তিদের মধ্যে একটি ধারণার সৃষ্টি হয় যে কংগ্রেস পুঁজিপতি ও জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করতে উৎসুক। তারা অনুভব করতে পারে যে কৃষকদের নিজস্ব শ্রেনীগত দাবী নিয়ে স্বাধীন শ্রেনী সংগঠনের মাধ্যমে কৃষক আন্দোলনের পথ সুগম করতে হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অবাধ গতির সঞ্চার হয়।

১৯৩৩ সাল গুন্টুর জেলার নিদব্রলুতে Indian Peasants Institute প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ ও ১৯৩৭-এ যথাক্রমে Madras Presidency Ryots Association ও Madras Presidency Agriculturalists Association সংগঠিত হয়।

বাংলাদেশেও মুসলমান কৃষকদের একত্রিত করে প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় যা পরে হয় কিষাণ প্রজা পার্টি। ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বিহার কিষাণ সভা স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর প্রচেষ্টায় একটি বিরাট সংগঠনে পরিণত হয়। উত্তরপ্রদেশে ১৯৩৫ সালে প্রাদেশিক কিষাণসভা গড়ে ওঠে যার অন্যতম কর্মসূচী ছিল জমিদারী প্রথা বিলোপ সাধন।

এরপর কৃষকদের উন্নতির প্রচেষ্টায় কতগুলি সরকারী ব্যবস্থা গৃহীত হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পাঞ্জাবে Regulation of Accounts Act, বাংলাদেশে Moneylenders Act. Relief of Indebtedness Act প্রভৃতি। তবে এই সমস্ত আইন কৃষকদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়নি। ফলে কৃষক আন্দোলনের বিস্তার হয়। ১৯৩৫ সালে লক্ষ্ণৌতে সারা ভারত কিষাণ কংগ্রেস মিলিত হয়। পরে যার নাম হয় সারা ভারত কিষাণ সভা (AIKS)। যদিও এই সভা সারা ভারতের সমস্ত কৃষককে নিয়ে গঠিত ছিল না তথাপি এই কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠার ফলে প্রথম একটি সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠন গড়ে ওঠে যার মাধ্যমে কৃষকদের অভাব অভিযোগ, আশা আকাঙ্খা তুলে ধরা হবে। তবে এই সংগঠন কংগ্রেসের নিকট অনুমোদন চাইলেও অনুমোদন পায়নি।

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের কংগ্রেসের প্রকাশিত উস্তাহারে কৃষকদের অবস্থার উন্নতির সাধারণ দাবীগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে কৃষক জণসাধারণের ভোট নির্বাচনে কংগ্রেসকে সাফল্য এনে দেয়। কিন্তু কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি পূরণে অক্ষম।

এর পরবর্তী সময়ে চল্লিশের দশকের কতগুলি কৃষক আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের ভিতকে দুর্বল করে

ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমি সৃষ্টি করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — বোম্বাইয়ের দহনু ও উমবরগাঁ তালুকে ডারলিস আদিবাসীদের বিদ্রোহ, ১৯৪৬-এ বাংলার কৃষকদের তেভাগা আন্দোলন। উত্তর দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরে ডায়লার-এর কৃষকবিদ্রোহ এবং হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানার কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম।

১৯৪৫ সালে বোম্বাইয়ের দহনু ও উনবরগাঁ তালুকে ঠিকাদার ও ব্রিটিশ সুদখোর মহাজনদের উৎপীড়ন। সেইসঙ্গে জমিদার ও কৃষকদের নির্মম শোষনের বিরুদ্ধে ডারনিস আদিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তীব্র শোষন ও ক্রীতদাসের মত জীবন সাধারনের প্রতিবাদ দুমাসের বেশি ধর্মঘট চালায়। ধর্মঘট সফল না হলেও শোষনের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের দৃঢ়তা ও ঐক্য সম্যকরূপ প্রকাশিত হয়।

১৯৪৪-১৯৪৫ সালে কৃষিক্ষেত্রে খাদ্যশস্য ও শিল্পের জন্য কৃষি পণ্যের উৎপাদনের ঘাটতি দেখা দেয়। তার ফলে খাদ্য ও কৃষিজাত ভোগ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি পায়। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের দুর্গতি, আর্থিক অনটন ও বিক্ষোভ বহুমাত্রায় বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ভারতের কৃষি অর্থনীতির সংকটের বোঝা কৃষকদের কাঁধে পড়ে। ফলে কৃষক বিদ্রোহ ও সংগ্রাম সংগঠিত হয়। ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভা কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকর করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। ফ্লাউড কমিশন ভাগচাষীকে উৎপন্ন শস্যের দুই তৃতীয়াংশ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করে। কৃষকরা জোতাদারের সঙ্গে কার্যরত বর্গাদার ও ভাগচাষী বা আরিয়ার এই শস্য দেবার জন্য আন্দোলন শুরু করে। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে বাংলার ১৯ টি জেলায় এই আন্দোলন প্রসারিত হয়, যা ভাগচাষীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনের রূপ নেয়। বহু কৃষক নিহত, আহত ও গ্রেফতার হন।

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর-পশ্চিম ত্রিবাঙ্কুরের পুন্নাপ্রা ডায়লার অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আলেপ্পি অঞ্চলের কৃষক ও সাধারণ মানুষের উপর উৎপীড়ণ ও দমননীতি চালানো হলে আত্মরক্ষার জন্য কৃষকরা শিবির গড়ে তোলে। স্বেচ্ছাসেবকরা পুন্নাপ্রা থানা আক্রমণ করে, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সামরিক আইন জারী করা হলেও শিবিরে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে পুলিশ ও সামরিক বাহিনী বহুশত কৃষককে হত্যা করে। এই সশস্ত্র বিদ্রোহ দেওয়ান রামস্বামী আয়ার এর ত্রিবাঙ্কুরকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য করে। শেষ পর্যন্ত ত্রিবাঙ্কুর দেশীয় রাজ্য ভারত যোগ দেয়।

ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র ও নিজামের নির্মম সামন্ত শাসনের বিরুদ্ধে এবং দেশমুখ জায়গীরদারদের বিরুদ্ধে হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কৃষকরা সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়েছিল। এই অঞ্চলে মধ্যযুগীয় শাসন অব্যাহত ছিল। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার লেশমাত্র ছিল না। হিন্দু দেশমুখ ও মুসলমান জায়গীরদারেরা দরিদ্র কৃষকদের বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদানে বাধ্য করত। দরিদ্র কৃষকদের মত অবস্থা ছিল।

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানা অঞ্চলে প্রায় ৩০ লক্ষ কৃষক সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। নিজাম ও তার সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালানো হয়। অস্ত্র আইনের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় খোলা বাজারের প্রচুর অস্ত্র সংগ্রহ করে কৃষকরা বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম পরিচালনা করে। সেচ্ছাসেবকের রক্ষাবাহিনী রাজাকার বিরোধী ধ্বনি দিয়ে ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংক্রান্ত রেকর্ড ধ্বংস করার আহ্বান জানায়। কৃষক বিদ্রোহের

প্রবাবাধীন গ্রামগুলিতে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান প্রথার অবসান, কৃষি শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি, পতিত ও কৃষকদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তেলেঙ্গানা কৃষক বিদ্রোহ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে না পারলেও সামন্ত স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ভারতের বৃহত্তম দেশীয় রাজ্যের শাসনকে দুর্বল করেছিল। তেলেঙ্গানা আন্দোলনের ফলে হায়দ্রাবাদ রাজ্যকে ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠন করে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের সৃষ্টি হয়। সামন্ততন্ত্র বিরোধী ও উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে তেলেঙ্গানার কৃষকরা ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমি সৃষ্টি করেছিল।

## ২.৩ উপসংহার :

ভারতে কৃষক আন্দোলন গুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রতেকটি আন্দোলনের এক-একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা ইস্যুকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয়েছে, তবে স্বীকার করতেই হবে প্রত্যেকটি কৃষক আন্দোলনের কাঠামো এবং কার্যপদ্ধতি বিশেষ বিশেষ অঞ্চল এবং সেই আঞ্চলিক কৃষি কাঠামোর বিশিষ্টতায় বিকশিত হয়েছে। এই কারনেই মোপলা বিদ্রোহের সঙ্গে পুনাপ্রা ভায়লার আন্দোলন বা তেলেঙ্গানা আন্দোলনের কাঠামো ও কার্যপদ্ধতির ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রায় সব জায়গাতেই কৃষক বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল,

(ক) মূল্যবৃদ্ধির কারনে কৃষকদের আর্থিক সংকট;

(খ) দুভিক্ষ ও মহামারী এবং

(গ) কৃষির কাঠামোগত পরিবর্তন

এইসব কারনের ভিত্তিতেই ভারতীয় কৃষকেরা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।

## ২.৪ প্রশ্নাবলী :

১। ভারতে কৃষক আন্দোলনের উদ্ভব ও গতি প্রকৃতি বর্ণনা করুন। (১৮)

২। ভারতে বিভিন্ন কৃষক আন্দোলনের চরিত্রগত ভিন্নতা বিশ্লেষণ করুন। (১৮)

৩। অসহযোগ আন্দোলনের সাথে সাথে কিভাবে কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছে বর্ণনা করুন। (১২)

৪। টীকা লিখ — (৭)

(ক) মোপলা বিদ্রোহ;

(খ) তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ;

(গ) পুনাপ্রা ভায়লার আন্দোলন;

(ঘ) তেভাগা আন্দোলন।

## ২.৫ সহায়ক পাঠ

১। সুমিত সরকার, মডার্ন ইন্ডিয়া।

২। এ.আর. দেশাই, পেজান্ট স্ট্রাগল্ ইন ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লী, অ'ফোর্ড, ১৯৭৯।

৩। সুপ্রকাশ রায়, বিদ্রোহী ভারত, বুক ওয়ার্ল্ড, কলকাতা, ১৯৮৩।

# একক - ২ (খ) উপজাতি আন্দোলন

গঠন

২.১ ভূমিকা

২.২ উপজাতি আন্দোলন (Tribal movement)

২.৩ উপসংহার

২.৪ প্রশ্নাবলী

২.৫ সহায়ক পাঠ

## ২.১ ভূমিকা :

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের সাথে সাথে তার জন সমাজের বহুত্ববাদী চরিত্র সবসময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কৌতূহল উদ্রেক করেছে। প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়া ও চীন ছাড়া এত বেশী সংখ্যক পৃথক পৃথক জনসমাজের অস্তিত্ব কোথাও দেখা যায় না। পাহাড়, সমুদ্র, অরণ্য, পাবর্ত্য উপত্যকা, বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানাবিধ জাতি ও উপজাতির অস্তিত্ব সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে গবেষণায় সবসময়ই উৎসাহী করে তুলেছে। সহজ, সরল, অনতিশিক্ষিত এইসব মানুষজন গোষ্ঠী জীবনে, গোষ্ঠীর নিজস্ব নিয়ম-কানুনে নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতেই আগ্রহী। বৃহত্তর সমাজের অন্য উপজাতি গোষ্ঠীর তথা কথিত সংস্কৃত গোষ্ঠীর মানুষদের সাথে জীবনচর্চার ক্ষেত্রে এদের অমিলের চিহ্নই সবসময় লক্ষিত হয়েছে। কৌটিল্যের সময় থেকে ইসলামী শাসন ও ব্রিটিশ শাসন পেরিয়ে স্বাধীন ভারতেও এই একই ছবি পরিলক্ষিত হয়। দলিতদের অবশ্য উপজাতিদের মধ্যে গণ্য করলে চলবে না। ভারতীয়দের বর্ণব্যবস্থা প্রসূত জাত ব্যবস্থার মধ্য থেকেই "দলিত" শ্রেনীর উদ্ভব। দলিতদের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, এদের জীবনযাপনের সঙ্গে অস্পৃশ্যতার সামাজিক সংস্কার জড়িত। অস্পৃশ্যতা বিরোধী চেতনার মধ্য দিয়েই দলিত গোষ্ঠীর মানুষজনদের বুঝতে চেয়েছেন ভারতের অনেক সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং শিক্ষাবিদরা। লক্ষনীয়, অন্য উপজাতি বা বর্ণ ব্যবস্থার উচ্চস্তরে যারা বিরাজ করেন, তারা যখনই এই উপজাতি ও দলিতদের জনজীবনের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র বিনাশ করতে চেয়েছে বা তাদেরকে সংস্কৃত করতে চেয়েছে, তখনই উপজাতি ও দলিতদের আন্দোলন দেখা দিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় অনউপজাতি ও বর্ণ ব্যবস্থার উচ্চস্তরের মানুষদের সামাজিক রাজনৈতিক অবিমৃষ্যকারীতার কারনেই ভারতীয় রাজনীতির প্রাঙ্গনে উপজাতি ও দলিত আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে।

## ২.২ উপজাতি আন্দোলন (Tribal Movement)

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিবেশ - তার বিশালতা ও বহুমুখীনতা নিয়ে বিশ্বে এক অনন্য নজীর তৈরী করেছে, এর একদিকে দীর্ঘ পার্বত্য অঞ্চলের পাশাপাশি অন্যদিকে গভীর অরন্য এবং এরই মাঝে রয়েছে অসংখ্য জনগোষ্ঠী যাদের তথাকথিত ভাষায় বলা হয় উপজাতি। এই উপজাতিগুলি এক একটি নৃকুলজাত গোষ্ঠী বা এথনিক গ্রুপ হিসাবে নিজের নিজের সংস্কৃতিজাত পরিচিতিতে বদ্ধ। এই পরিচিতি আবার প্রথাগত আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, সামাজিক কাঠামো, ভাষা ও কথনভঙ্গি, জীবনযাত্রা, উৎসব, লোকাচার প্রভৃতির ভিন্নতা ভেদে এক-একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষজনের সাথে অনউপজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের সাংস্কৃতিক ভিন্নতা সত্ত্বেও এদের আন্দোলনের প্রকৃতিজাত কারণে এক ধরনের অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তা হল, সনাতনী জীবনযাত্রার পথে কোনো শোযন বা অবদমন মূলক ঘটনা ঘটলেই তার প্রতিবাদে সংগঠিত আন্দোলন। এখানে অবশ্য লক্ষনীয় অন্য যে কোন ধরনের সামাজিক অর্থনৈতিক আন্দোলনের (যেমন কৃষক আন্দোলন) সঙ্গে উপজাতি আন্দোলনের একটি পার্থক্য রয়েছে। সুরেশ কুমার সিং এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করে বলেছেন যে — কৃষক বিদ্রোহ যেমন একান্তই কৃষি জমি ভিত্তিক আন্দোলন, তেমনি উপজাতি আন্দোলন একই সঙ্গে কৃষিজমি ও বনভূমি ভিত্তিক আন্দোলন। উপজাতিদের জীবনচর্চা শুধু মাত্র কৃষিভিত্তিক নয়। সেখানে বনভূমিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এদের নিজস্ব সংস্কৃতিও কুলগত আচার আচরনই এদের অন্যদের সাথে ভিন্নতার মূল কারণ। উপজাতিদের বিক্ষোভ, আন্দোলন সবসময়ই জমিদার, সুদখোর মহাজন, এবং ছোটি সরকারী কর্মচারী বিরুদ্ধে ধাবিত হত; এই কারণে নয় যে তারা এদের শোষণ করতো, বরং এই কারণে যে এরা উপজাতিদের ছিল ভিনদেশী।

ভারতবর্ষের উপজাতি আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে এই আন্দোলনগুলি ছিল বহুমাত্রিক এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে স্বাধীনতার সময় অবধি উপজাতি আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সরকারী বা বেসরকারী তরফে যখনই উপজাতিদের উপর কোনো অনুপ্রবেশ বা স্বতন্ত্র অধিকার বিচারকারী প্রচেষ্টা হয়েছে, তখনই তার বিরুদ্ধে উপজাতিরা বিক্ষোভে সরব হয়েছে। বহুমাত্রিক এই সমস্ত উপজাতি আন্দোলনের পরিধি ও বিষয়বস্তু অনুধাবনের জন্য গবেষকরা বেশীর ভাগ সময়ই এই আন্দোলনগুলি কোন কোন বিষয় কেন্দ্রীক সংগঠিত হয়েছে, তার উপর জোর দিতে চেয়েছেন। ঘনশ্যাম শাহ্ ১৯৯০ সালে ভারতের সামাজিক আন্দোলন নিয়ে লিখতে গিয়ে এই ধরনের আন্দোলনগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলি হলো যথাক্রমে — এথনিক আন্দোলন, কৃষিজমি ভিত্তিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক আন্দোলন। উপজাতিদের এথনিক আন্দোলনগুলি হলো এক ধরনের প্রতিরোধ আন্দোলন; যেখানে অনউপজাতির মানুষেরা, সে ব্রিটিশ শাসকরাই হোক বা ভারতীয়রাই হোক তাদের উপজাতির সংস্কৃতিজাত জীবনচর্চার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে চাইতো, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন। দেখা গেছে যখনই উপজাতি মানুষেরা জেনেছে তাদের কথ্যভাষা, সংস্কৃতিগত পরিচিতি, তাদের লোকাচার, জীবনচর্চা পদ্ধতি প্রভৃতি বিপন্ন হয়ে পড়ছে, তখনই তারা প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেছে। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্বে প্রায়শই এই ধরনের আন্দোলন দেখা যেত।

কৃষিজমিভিত্তিক আর এক ধরনের উপজাতি আন্দোলন প্রায়ই দেখা যেত যখন ব্রিটিশরা ভারতীয় সামন্ত প্রভুরা উপজাতিদের জমির উপর অনুপ্রবেশ ঘটাতো। অবশ্য বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থার প্রকৃতির উপর এই আন্দোলনের চরিত্র নির্ভর করতো। তবে ব্রিটিশ শাসনে ব্রিটিশ মদতপুষ্ট জমিদার মহাজন প্রভৃতির অসাধু উপায়ে উপজাতিদের জমি কেড়ে নেওয়া ও চাষের জমির উপর অন্যায় বিরুদ্ধেই উপজাতি আন্দোলন গড়ে উঠতো। এই ধরনের জমিদারেরা বা সুদখোর মহাজনরা শুধু যে চাষীদের জমি কেড়ে নিত, তা নয়, অনেকসময়ই এরা চাষীদের উপর ঋণের বোঝাও চাপিয়ে দিত। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধেই আন্দোলনে শামিল হত উপজাতি চাষী গোষ্ঠী। বীরসা মুন্ডা, ভগৎ এরকম অনেকের নেতৃত্বেই এইভাবে উপজাতি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

এই ধরনের উপজাতি আন্দোলন অনেক সময়ই আবার ঔপনিবেশিকতা বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তো। নিজেদের কৃষি জনিত বা নৃকুলগত অনন্য সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এই উপজাতি আন্দোলনগুলি বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তো। এই ধরনের আন্দোলনগুলির নেতৃত্ব যারা দিত তারা ভাবত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের কৌশলের মধ্যে দিয়ে হয়তবা এই আন্দোলনগুলির মধ্যে একটা জাতীয় চরিত্র আরোপ করা যেতে পারে। যাই হোক, এই পদ্ধতির মধ্যদিয়েই স্বাধীনতা উত্তর উপজাতি আন্দোলনের মধ্যে রাজনৈতিক স্বতন্ত্রতার দাবী সোচ্চার হয়েছে, এমনকী কৃষক রাজনৈতিক অস্তিত্বের দাবীও মুখরিত হয়েছে, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে উপজাতি আন্দোলনের কার্যকরী প্রয়োগগত দিকে কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রভাব দেখা যায় নি, বরং সব সময়ই এই আন্দোলনগুলি বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে রাখতে পেরেছে।

ভারতে উপজাতি আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এমনটি বলাই যায় যে কোন একটি বিশেষ কারণে নয়, বরং তাদের জীবন যাত্রার সঙ্গে জড়িত নানাবিধ সমস্যার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফসল হ'লো উপজাতি আন্দোলন। তবে এটা মানতেই হবে যে উপজাতি মানুষজনদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া, চাহিদা মেটানোর শান্তি পূর্ণ পদ্ধতি কার্যকরী না হওয়ার ফলেই উপজাতিরা স্থিতাবস্থা বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছে — সাওতাল বিদ্রোহ, হুল বিদ্রোহ প্রভৃতি আন্দোলনগুলি এই একই পদ্ধতির পরিণতি। সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদনের পন্থা অসফল হওয়ার ফলেই এই আন্দোলনের জন্ম।

যাই হোক এই সমস্ত উপজাতি আন্দোলনগুলির আন্দোলনকারী, আন্দোলনের বিষয়বস্তু, সংগঠন এবং নেতৃত্বের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আন্দোলনের বাস্তব, প্রকৃত রূপটি অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি, যদিও সার্বিকস্তরে না হলেও অনেক মানুষের সমস্যাকে আন্দোলনের মধ্যে তুলে ধরতে চেয়েছে, সুতরাং উপজাতি আন্দোলনগুলিকে কৃষিভিত্তিক, না রাজনৈতিক, না নৃকুলগত এভাবে চিহ্নিত করার চাইতে স্বাভাবিক উপজাতি আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করাই শ্রেয়। তবে স্বীকার করতেই হবে এই সব আন্দোলনই উপজাতি মানুষজনদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যা গুলিকেই নির্দিষ্ট করে তার সমাধানকল্পেই প্রয়াসী হয়েছে।

# একক - ৩ শ্রমিক আন্দোলন

গঠন

৩.১ ভূমিকা

৩.২ শ্রমিক আন্দোলন

৩.৩ শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিস্তার

৩.৪ উপসংহার

৩.৫ সহায়ক পাঠ

৩.৬ প্রশ্নাবলী

## পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠ্যাংশটি অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হল :

- ভারতবর্ষের বিলম্বিত শিল্পায়নের প্রেক্ষিতে অগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের ধীরগতি প্রসারণের গতিপথ চিহ্নিত করা।
- কোন্ পর্যায়ে কিভাবে শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে তার সম্যক ধারণা লাভ। এবং
- শ্রমিক আন্দোলনে উদ্ভূত সমস্যার পর্যালোচনা।

## ৩.১ ভূমিকা :

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে, যখন দেশের বন্দর শহর গুলিতে বেশ কিছু শিল্প কল-কারখানা গড়ে উঠলো। প্রাথমিক ভাবে, এইসব শিল্প কলকারখানাগুলিতে যে শ্রমিকেরা কাজ করত, তারা এতটাই অসংগঠিত ছিল যে নিজেদের কাজের জায়গায় অসহনীয় পরিবেশ ও মজুরীগত বঞ্চনার বিষয়ে যারা কোনো প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর তুলতে পারেনি। কতিপয় ব্যক্তি নিজস্ব ভাবনা ও উদারচেতা মানসিকতার জন্য হয়ত বা শিল্প শ্রমিকদের অসহনীয় কর্মব্যবস্থা প্রতিকারে উদ্যোগী হয়েছেন বা ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীর কাছে এই বিষয়ে প্রতিকারের উদ্যোগ নিতে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে এই ধরনের প্রচেষ্টা সব সময়ই ছিল অনুযোগ-উপরোধ এবং অনুরোধ কর্ম প্রক্রিয়ার অংশমাত্র। এই পর্বে ১৮৮২ সালের বোম্বাই টেক্স্টাইল শ্রমিকদের ধর্মঘট ও ১৮৯০ সালে বোম্বাই কাপড় কারখানার ধর্মঘট ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য আন্দোলন কিছু ঘটেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক সময়ে ও তৎপরবর্তী সময়ে ভারতে শ্রমিক

আন্দোলনের বিস্তার ঘটে। তবে, ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ধারাকে বুঝতে হলে শ্রমিক আন্দোলনের বিবর্তনকে গুরুত্ব দিয়েই তাকে অনুধাবন করতে হবে।

## ৩.২ শ্রমিক আন্দোলন :

ভারতবর্ষে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিল্প, যানবাহন ও বাগিচা শিল্প থেকে উদ্ভূত। ভারতে বাগিচা, আধুনিক কারখানা, খনি শিল্প এবং যানবাহন যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেই অনুপাতে এই শ্রেণী ও বেড়ে যাচ্ছিল।

মূলত দরিদ্র কৃষক ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হস্তশিল্পী যারা মজুর হয়েছিল, তাদের মধ্যে থেকেই ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী প্রধানত গঠিত হয়েছিল।

সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরনের লেখকরাই ভারতীয় শ্রমিকদের জীবনযাপন ও কাজের শর্ত নীচু মানের কথা স্বীকার করেছেন।

কম মজুরির ভিত্তিতে তাদের নিজেদেরকে এবং তাদের পরিবারবর্গকে চালাতে না পারার জন্য শ্রমিকদের একটা বড় অংশ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ত।

মজুরি এবং বাসস্থানের অবস্থা বিচার করলে খনি শ্রমিকদের অবস্থা বিশেষ করে খারাপ ছিল।

বাগিচা শিল্পগুলো অধিকাংশই ছিল ইউরোপীয় অধিকৃত। তাতে নিযুক্ত শ্রমিকরা সম্ভবত সব থেকে কম মজুরি পেত।

কিছু সংখ্যক লেখক সরকারের শ্রম ও সামাজিক আইনগুলোকে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করতেন না।

জীবন ও শ্রমের এই কঠিন পরিস্থিতির জন্য ভারতে ১৯১৮ সালের পর থেকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল।

ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং বুর্জোয়াদের থেকে বেশ কিছুটা পরে জাতীয় ও শ্রেণী সচেতনতা লাভ করে। কারণ এই শ্রেণী সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনগ্রসর ও প্রায় নিরক্ষর ছিল। শ্রমিকদের প্রথম কয়েকটি প্রজন্ম নিঃস্ব হয়ে যাওয়া কৃষকদের এবং প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হস্ত শিল্পীদের মধ্য থেকে এসেছিল।

## ৩.৩ শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিস্তার

সংগঠিত আন্দোলন হিসাবে ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলন ১৯১৪-১৮ সাল পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শুরু হলেও তার আগেই ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর বলার মত কাজকর্ম কিছু ছিল। এই কাজকর্ম অবশ্য খাপছাড়া ও স্বতঃস্ফূর্ত ছিল এবং সুনির্দিষ্ট শ্রেণীচেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল না।

১৮৯৭ সালে রেলওয়ে কর্মচারীদের Amalgamaled Society প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র উচ্চ বেতনভোগীর রেলওয়ে কর্মচারীরা এবং প্রধানত অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরাই এর সভ্য ছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কলকাতায় Printers Union এবং বোম্বাইয়ের Postat Union এর মত কতগুলো ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল। এই ইউনিয়নগুলোর সভ্য সংখ্যা কম ছিল এবং এগুলোর উপযুক্ত তত্ত্বগত ও কর্মসূচীগত ভিত্তির অভাব ছিল।

১৯১৮ সালের আগের সময়টাতে কতগুলো শিল্প ধর্মঘটও দেখা গিয়েছিল। এই ধর্মঘট ছিল অধিকাংশ স্বতঃস্ফূর্ত, অসংগঠিত এবং এরা সুস্পষ্ট কোন ট্রেড ইউনিয়ন সচেতনতায় অনুপ্রাণিত ছিল না।

রাজনৈতিক দিক থেকেও ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী ১৯১৮ সালের আগে পর্যন্ত অসচেতন ও নিষ্ক্রিয় রয়ে গিয়েছিল। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হল ১৯০৮ সালে জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলককে কারারুদ্ধ করার কারণে বোম্বাই সুতাকল কর্মীদের রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট। ভারতীয় শ্রমিকদের এটাই হল 'একমাত্র রাজনৈতিক কার্যক্রম'। ভারতীয় শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সচেতনতার লক্ষণ হিসাবে লেনিনও এই আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

১৯১৮ সালের পরই হল সেই সময় যখন ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী শ্রেণীভিত্তিক সংগঠনের পথ ধরেছিল এবং উত্তোরোত্তর ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তুলেছিল। এই রূপান্তরকে Whitley Commission এর প্রতিবেদনে এভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে।

১৯১৮-১৯ সাল পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পে ধর্মঘট একটা বিরল ঘটনা ছিল। নেতৃত্ব ও সংগঠনের অভাব থাকার দরুণ এবং জীবন সম্পর্কে একটা নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গীতে গভীর ভাবে নিমজ্জিত থেকে শিল্প শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শিল্পে কঠিন পরিস্থিতি সহ্য করার বিকল্প হিসাবে গ্রামে প্রত্যাবর্তনই একমাত্র পথ বলে মনে করত। যুদ্ধের পর এক তাৎক্ষনিক পরিবর্তন দেখা গেল। ১৯১৮-১৯ সালে কতগুলো ধর্মঘট হয়েছিল। পরের বছরে শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা আরও বেড়ে এবং ১৯২০-২১ সালে সংগঠিত শিল্পে ধর্মঘট প্রায় সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ধর্মঘটের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে উপলব্ধিই ছিল এর প্রধান কারন। পরিস্থিতি আরও সহায়তা পেয়েছিল ট্রেড ইউনিয়ন উদ্যোক্তাদের আবির্ভাবে, যুদ্ধের থেকে জনগণের শিক্ষা গ্রহণে এবং শিল্প বিস্তারের ফলে শ্রমিকদের ঘাটতি হওয়ায়, যা আরও বেড়ে গিয়েছিল ইনফ্লুয়েঞ্জার মহামারীতে।

যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকট, শ্রমিকদের নিরবচ্ছিন্ন দুর্দশা, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক এবং অন্যান্য দেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ইত্যাদি ঘটনার ফলে শ্রমিকশ্রেণীসহ ভারতীয় জনসাধারণের ওপর প্রতিক্রিয়া এবং দেশে সাধারণ আলোড়ন — এই সবই ছিল ১৯১৮ সালের পর ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত আন্দোলন শুরু হওয়ার কতগুলো কারণ।

১৯১৮-১৯২০ সালে দেশজুড়ে কতগুলো ধর্মঘট হয়। বোম্বাই, কানপুর, কোলকাতা, শোলাপুর, জামসেদপুর, মাদ্রাজ এবং আমেদাবাদের অসংখ্য শিল্পকেন্দ্রগুলিতে এই প্রথম এরকম অসংখ্য ও ব্যাপক ধর্মঘট হয়েছিল। এই অর্থনৈতিক ধর্মঘট ছাড়াও বোম্বাই ও অন্যান্য কিছু সংখ্যক শিল্পনগরীর শ্রমিকরা রাওলাট

আইনের প্রতিবাদে রাজনৈতিক ধর্মঘট করেছিল। এভাবে তাদের উত্তোরত্তর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিও প্রকাশিত হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর আগমনও এর মধ্য দিয়েই চিহ্নিত হয়েছিল।

এই সময়ই বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং অন্যান্য কয়েকটা কেন্দ্রে বিভিন্ন শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার প্রথম প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। খুব শীঘ্রই দেশে কিছু সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠল। ১৯২০ সালে এন.এস. যোশী, লালা লাজপত রায় এবং জোসেপ ব্যাপতিস্তার প্রয়াসের ফলে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর ঘোষিত লক্ষ্য ছিল — ভারতের সব প্রদেশের সব সংগঠনের কার্যাবলীকে সংহত করা এবং সাধারণভাবে অর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ভারতীয় শ্রমিকদের স্বার্থ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন ভারতীয় শ্রমিকদের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই প্রথম ক্রমবর্ধমান ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন একটি সর্বভারতীয় রূপ পেল।

প্রায় এক দশক জুড়ে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রধানত এন.এস. যোশীর মত উদারপন্থী রাজনীতিবিদদের হাতে ছিল। ক্রমে গিরি এবং চিত্তরঞ্জন দাসের মত জাতীয়তাবাদীরাও এর সাথে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। নেতাদের জাতীয়তাবাদী ও সংস্কারবাদী ভাবধারা শ্রমিকদের মধ্যে তাঁরা প্রচার করতেন। যদিও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়নের কংগ্রেসের সংখ্যাগত ভিত্তি অবশ্য খুব নগন্য ছিল।

১৯২৭ সালের পর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে এক বামপন্থী নেতৃত্ব গড়ে উঠে ছিল। এরা ছিল প্রধানতঃ বামপন্থী জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের নিয়ে গঠিত। এরা পূর্বতন নেতৃত্বকে দৃঢ়ভাবে সরিয়ে দিতে লাগল। ১৯২২ সাল থেকে ভারতবাসীদের মধ্যে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী ধারণা বিস্তার লাভ করেছিল। ফলে দেশে সমাজতন্ত্রী বা সাম্যবাদী গোষ্ঠী দানা বাঁধতে শুরু করে। জাতায়তাবাদী আন্দোলনের সাফল্যের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর গুরুত্ব অনুভব করতে পেরে এই গোষ্ঠীগুলি শ্রমিক এবং কৃষকদের নিয়ে দল গঠন করেছিল। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে এই দলগুলির সভ্যরা উত্তরোত্তর প্রভাব বাড়াতে লাগল। শ্রেণীসংগ্রামের নীতিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে গড়ে তোলা এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করার কর্মসূচী নিয়ে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে শ্রমিকদের আকৃষ্ট করাও তাদের উদ্দেশ্য বলে তারা ঘোষণা করেছিল।

বামপন্থী দল নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্ব লাভে সফল হন। এই কংগ্রেসের মধ্যে যোশী দলের পুরানো নেতৃত্ব সংখ্যালঘু শ্রেণীতে পরিণত হল। Royal Commission on Labour বয়কটের প্রশ্নে এবং জেনেভায় International Congress এর প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে দুই দলের মধ্যে গভীর মতভেদ দেখা দিল। এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙণ দেখা দিল এবং কিছু সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন বেরিয়ে গিয়ে যোশী গোষ্ঠীর নেতৃত্বে Indian Trades Union Federation গড়ে তুলল।

১৯৩১ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে আরও একটা ভাঙন দেখা গেল। তবে ১৯৩৫ সালে এই দুই অংশ একত্রিত হল। ১৯৩৮ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং Indian Trades Union Federation একত্রিত হল এবং এর ফলস্বরূপ দেশে এক শক্তিশালী নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পুনরাবির্ভাব হল।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে প্রাগ্রসর কর্মসূচী ছিল ভারতে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার। উৎপাদন পদ্ধতি, বন্টন এবং বিনিময়ের সম্ভবপর সামাজিকীকরণ এবং জাতীয়করণ, শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি সাধন, শ্রমিকদের জন্য বাক্-স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্র, সভা-সমিতি ও সমাবেশ; ধর্মঘটের মত নাগরিক স্বাধীনতা, শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং জাতি, সম্প্রদায়, বর্ণ, ধর্মভিত্তিক সুযোগ সুবিধা গুলি লোপ করার লক্ষ্যও ছিল। এটা ছিল একটা উন্নত গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে মোট সদস্য সংখ্যা ১৯৪২ সালে ছিল ৩,৩৭,৬৯৫। এর মধ্যে বিভিন্ন শিল্পের ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটা মোট শ্রমিক সংখ্যার একটা সামান্য শতাংশ। ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলোতে সদস্য সংখ্যা কম হত প্রধানতঃ শ্রমিকদের দারিদ্র্য ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা, নিয়োগকর্তার হাতের বলি হওয়ার ভীতি ইত্যাদি কারণে। ধর্মঘটের সময় অবশ্য শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব সব থেকে বেশি থাকত এবং সভ্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেত।

১৯২৭ সালের পর ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের পর্যায়ে পৌছেছিল। ১৯২৮-৩০ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক দাবীর ভিত্তিতে কয়েকটা বৃহত্তম ধর্মঘট হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল বোম্বাই সুতাকল কর্মীদের ধর্মঘট। ১৯২৭ সালের পর ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী একটা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে গঠিত হতে শুরু করে এবং নিজস্ব পতাকা ও স্বাধীন কর্মসূচী গড়ে তোলে। সম্মিলিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শ্রমিকশ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশই তাদের নিজেদের নেতৃত্বকেই অনুসরণ করত। শ্রমিকরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আয়োজিত সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছিল প্রধানতঃ তাদের নিজ পতাকা, নিজ শ্লোগান এবং নিজেদের নেতৃত্বের অধীনে। সরকার এই ঘটনাকে বিপজ্জনক এবং কমিউনিস্ট বিক্ষোভের পরিণতি বলে মনে করেছিল। সরকার তাই Trade Disputes Act প্রনয়ণ করে এবং ১৯২৯ সালে Public Safety Bill-নামে একটা অর্ডিন্যান্স জারি করে। আগের ধর্মঘটটা করার সময় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং পরেরটার মাধ্যমে সরকার অবাঞ্ছনীয় বিদেশীদের বহিস্কার করার ক্ষমতা পেয়েছিল। সরকার বেশ কিছু বামপন্থী শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করে ও তাদের বিচার শুরু করে, এ হল সেই বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। শ্রমিকশ্রেণীর কিছু অংশ ১৯৩০-৩১ সালের অইন অমান্য আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেছিল।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের দারুণ সাফল্যের পেছনে শ্রমিকদের উৎসাহোদ্দীপক সমর্থন কাজ করেছে। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার এদের নাড়া দিয়েছিল। কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে তাদের অবশ্য মোহমুক্তি ঘটল। তারা কংগ্রেস সরকারকে শুধুমাত্র শ্রমিকদের জীবনযাত্রা ও কাজের পরিস্থিতি উন্নতি করার অঙ্গীকার রক্ষা করেনি বলে নয়; অগণতান্ত্রিক, পুঁজিবাদমুখী আইন যেমন, Bombay Trade Disputes Act প্রনয়ণ করার জন্য দোষারোপ করত। বোম্বাইতে ধর্মঘটীদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ, শ্রমিক, মিটিং নিষিদ্ধকরণ এবং শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তারের জন্যও দোষারোপ করেছিল।

১৯৩৮ সালের পর দেশে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। AITUC-তে অনুমোদিত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে এটি প্রতিফলিত হয়। স্বাধীনতার প্রাক্কালে এই নতুন সামাজিক শ্রেণী

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উত্তরোত্তর গুরুত্ব অর্জন করেছিল। কংগ্রেস নেতৃত্বের মাধ্যমে এই সময়ে ১৯৪৭ সালে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বা I.N.T.U.C গঠিত হলো।

## ৩.৪ উপসংহার :

আলোচনার পরিণতিতে এসে বলা যায়, স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে শ্রমিক আন্দোলন কখনই কোনো বৃহৎ সামাজিক আন্দোলন হিসাবে গড়ে ওঠে নি, তার মূল কারণ ভারতে শিল্পের এমন কোনো দৃঢ় ভিত্তিভূমি গড়ে ওঠেনি যা সমগ্র ভারতে একটি সর্বজনীন ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণী গঠন করতে পারে। বৃহৎ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন শিল্পগুলির শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠেনি, এবং সর্ব ভারতীয় স্তরে দেশব্যাপী কোনো ধর্মঘটও সংগঠিত করতে পারে নি। এমনকী জাতীয় আন্দোলনের গান্ধী পর্বেও শ্রমিক সংগঠনগুলি যাদের কাছে প্রত্যাশিত আন্দোলনে সামিল হতে পারেনি। ফলে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে শ্রমিক আন্দোলন, জাতীয় স্তরে সব সময়ই একটি প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন সামাজিক আন্দোলনের চরিত্রের বেশী কিছু অর্জন করতে পারেনি।

## ৩.৫ সহায়ক পাঠ


১। ভি.বি. কার্নিক, ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন, এ সার্ভে বোম্বাই, মানাকতলা, ১৯৬৬।

২। আর.কে. মুখার্জী, দি ইন্ডিয়ান ওয়ার্কিং ক্লাস, বোম্বে, পপুলার প্রকাশন, ১৯৫৫।

৩। রাখহরি চট্টোপাধ্যায়, ওয়ার্কিং ক্লাস এন্ড দি ন্যাশালিস্ট মুভমেন্টস্ ইন ইন্ডিয়া, দি ক্রিটিকাল ইয়ার্স, সাউথ এশিয়ান পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লী, ১৯৮৪।


## ৩.৬ প্রশ্নাবলী

১। প্রাক্ স্বাধানতা পর্বে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর বিবর্তন বর্ণনা করুন। (১৮)

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব থেকে ১৯৩৫ সাল অবধি ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ে একটি রচনা লিখুন। (১৮)

৩। A.I.T.U.C গঠন থেকে I.N.T.U.C গঠন পর্ব অবধি শ্রমিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতি বর্ণনা করুন। (১২)

৪। টীকা লিখুন — (৭)

(ক) ১৯১৮-১৯২০ পর্বে শ্রমিক আন্দোলন।

(খ) Indian Trade Union Federation.

(গ) A.I.T.U.C.

(ঘ) I.N.T.U.C

(ঙ) Public Safety Bill 1929.

# একক - ৪ ❑ দলিত আন্দোলন

৪.১ ভূমিকা
৪.২ দলিত আন্দোলন
৪.৩ উপসংহার
৪.৪ প্রশ্নাবলী
৪.৫ সহায়ক পাঠ

## পাঠের উদ্দেশ্য

আলোচ্য পাঠ্যাংশের উদ্দেশ্য হল

- প্রাচীন হিন্দুসমাজে নিম্নবর্গের ও নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীগুলির বর্তমান অবস্থান পর্যালোচনা।
- এই বিশেষ জনগোষ্ঠীগুলির ওপর বৈষম্যমূলক আচরণ এবং অর্থনৈতিক অবিচার তথা শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের উদ্ভব ও গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।
- দেশের অঞ্চলভেদে এই জাতপাতের সমস্যার গভীরতা ও বিপদ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিকারের বিশ্লেষণ।

## ৪.১ ভূমিকা :

দলিত অথবা তথাকথিত "অস্পৃশ্য" প্রাচীন হিন্দু সমাজের চারি বর্ণব্যবস্থার একেবারে নিম্ন স্থানে অধিষ্ঠান করে, যার ভঙ্গুর রূপই জাতপ্রথার জন্ম দিয়েছে। যাই হোক, সময়ের সারণিতে এই দলিতদের সামাজিক মর্যাদা এমন পর্যায়ে পৌছোয় যে তারা চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বাইরে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। "বর্ণ" ব্যবস্থার বাইরে "অবর্ণ" হিসাবে তাদের পরিচিতি গড়ে ওঠে। দলিত মানুষদের সমাজ বহির্ভূত এই যে পরিচয় গড়ে উঠেছে তাতে তাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন উচ্চবর্ণের লোকেদের কাছে অপবিত্র বলে গণ্য হয়। উচ্চ হিন্দু জাতবর্ণের লোকেদের কাছে দলিতদের স্পর্শ, ছায়া মাড়ানো বা তাদের কণ্ঠস্বর শ্রুত হওয়াও অপবিত্র বলে বোধ হতে শুরু হয়। সমাজের একটি বিশাল অংশের শরিক হওয়া সত্ত্বেও দলিতরা সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষদের কাছে এতটাই অনাদর, অমানবিক আচরণ পেতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে যে সেই সামাজিক অভ্যাস থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা ভারতীয় সমাজে এক ধরণের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে।

দলিত আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য: একেবারে সূচনা লগ্ন থেকে দলিত আন্দোলন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রবিশিষ্ট হয়ে পড়ে। দলিত আন্দোলনের মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় অস্পৃশ্যতা। অস্পৃশ্য এই ছাপ দলিতদের মনে এমন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যে প্রাথমিক সংগ্রামের সময় থেকেই অস্পৃশ্যতা অবমোচন এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা এবং মন্দির ও পূজা স্থান সমান মর্যাদায় সামাজিক অংশগ্রহনই

দলিত আন্দোলনের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে দলিতদের সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পাবার বিষয়টি সমগ্র দেশজুড়ে মন্দিরে প্রবেশ আন্দোলনের মাধ্যমেই প্রস্ফুটিত হয়। এর পরবর্ত্তী সময়ে ব্রিটিশ শাসনের "ভাগ করো এবং শাসন করো" এই নীতিটির প্রয়োগ হেতু একটি সম্প্রদায়কে সুযোগ দেওয়া ও অন্যসম্প্রদায়কে বঞ্চিত করার ক্ষেত্র থেকে সরকারী চাকুরী ও রাজনৈতিক অফিস এ যোগদান করার সুযোগের সুবিধাপ্রাপ্তিকে ঘিরে দলিত আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। সূচনা লগ্ন থেকেই তাই দলিত আন্দোলন নিজ সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অসফল থেকে গেছে, সামাজিক সমতার বৃহত্তর প্রশ্নটিও দূরেই রয়ে গেছে, শুধুমাত্র কতিপয় সরকারী পদ ও রাজনৈতিক পদ প্রাপ্তিতেই এই দলিত আন্দোলন সীমাবদ্ধ থেকেছে। স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা উত্তর ভারতীয় সমাজে দলিত আন্দোলনের এই রূপটিই সর্বাগ্রে নজরে আসে।

সর্বজনস্বীকৃত ও সংগঠিত কিছু আন্দোলনের আগে অবধি দলিত আন্দোলন কতিপয় সমাজসংস্কারক ও সাধু-সন্ন্যাসীদের নেত;ত্বেই পরিচালিত হয়েছে। এক্ষেত্রে রামচন্দ্র, চৈতন্য, কবীর, তুকারাম প্রভৃতির নাম করা যায়। আরও স্পষ্ট করে বললে বলা যায় ভক্তি আন্দোলনের হাত ধরেই দলিতদের সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্তির আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। সমস্ত মানুষের সমতার দাবীতে বিশ্বাস রেখে এবং সকলের জন্য সুন্দর জীবনের কামনা করে এই আন্দোলনের শরিকেরা সেই সামাজিক কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করতে শুরু করে, যে কর্তৃত্ব সমাজে অসমতা, অস্পৃষ্যতা বজায় রেখেছে এবং এই আন্দোলন আরও দাবী করে যে সমাজে প্রত্যেক মানুষেরই নিজেকে অন্যের সমান ও সম্মানীয় হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিৎ।

আধুনিক সমাজে দলিত আন্দোলন দেশব্যাপী নানাবিধ সামাজিক ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই উদ্ভুত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রাজা রাম মোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন সমাজে অবস্থিত সর্বপ্রকার জাতিভিত্তিক অসমতার অবসানেই শুধু লিপ্ত ছিল না, সমাজের একটি বিশেষ অংশকে যারা এই জাত ভিত্তিক সামাজিক অসমতায় বিশ্বাসী ছিল, তাদের সমালোচনা ও আক্রমণ করতেও পিছপা ছিল না। এ বিষয়ে অবশ্য, ১৮৭৫ সালে দয়ানন্দ স্বরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ আন্দোলনের ভূমিকাও গৌরবজনক ছিল। বর্ণব্যবস্থায় অস্পৃশ্যতাকে আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা না করে দয়ানন্দ কর্মভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাসের কথা উল্লেখ করেন, যেখানে কর্ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণ শূদ্রের স্তরে নেমে যেতে পারে, আবার সুকর্ম পালনের জন্য শূদ্র ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত হতে পারে, অবশ্যই এই সামাজিক সচলতা রাষ্ট্রের অনুমতি সাপেক্ষেই ঘটতে পারে। এইভাবেই দেশের বিভিন্ন অংশে নব-বেদান্তিক আন্দোলন এবং অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলন দলিত আন্দোলনের এক ধরণের অনুঘটক রূপে কাজ করেছিল।

১৮৭০ সালে অ-ব্রাহ্মণ এবং অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন হিসাবে জ্যোতিবাফুলে নেতৃত্বে সত্যশোধক সমাজের আন্দোলনের কথা বলা যায়। 'মালি' জাতির জাতক বলে জ্যোতিবা ফুলে তাঁর বাল্যজীবনে নানা ধরণের অপমানের শিকার হয়েছেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের ঔদ্ধত্য তার অন্তরে একধরণের বিদ্রোহ ও সংস্কারের বাসনার জন্ম দিয়েছিল। হিন্দু সমাজের সামাজিক কাঠামোর অভ্যন্তরে নিম্নজাতের মানুষদের জন্য উপযুক্ত স্থান ও সম্মান আদায় করাই ছিল তাঁর আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। জ্যোতিবাফুলে রাজনৈতিক কাঠমোর মধ্যে নিম্নবর্ণের মানুষদের স্থান না দেওয়ার বিষয়টির কড়া সমালোচনা করে ভারতীয় সমাজে নিম্নবর্ণ দলিত ও অস্পৃশ্যদের জন্য সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়টিকে তাঁর আন্দোলনের মূল লক্ষ্য বলে উপস্থাপিত করেছিলেন। মহারাষ্ট্রে নিম্নবর্ণের লোকেদের সামাজিক উন্নয়নের জন্য তিনি খুবই সচেষ্ট ছিলেন, এবং এই উদ্দেশ্যেই নারী ও শিশুদের জন্য বিদ্যালয়, অনাথ আশ্রম প্রভৃতি স্থাপন করেছিলেন। কালক্রমে, দলিত আন্দোলনের অনুঘটক রূপে সত্যশোধক সমাজের কাজের পরিধি আরও বিস্তৃত হয় এবং অন্যান্য দলিত অস্পৃশ্য মানুষেরাও এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়।

একইভাবে ১৯৯৩ সালে জাতির অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন ও শ্রী নারায়ণ গুহর নেতৃত্বে "শ্রী নারায়ণ ধর্ম পরিপালন কর্মপন্থা দলিত আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল অস্পৃশ্য জাতির মানুষদের জন্য দু ধরণের আন্দোলনের ভূমিকা নিয়েছিল এই পন্থা। প্রথমতঃ সংস্কৃতায়ণ-এর মাধ্যমে এজাহবা জাতির তুলনায় নিম্ন অবস্থাটি স্থিত জাতিদের মধ্যে অস্প-শ্যতা তুলে দিয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ হিন্দুদের সঙ্গে সমমর্যাদায় স্থান পাবার ইচ্ছায় কেরালার প্রভৃত হিন্দু মন্দির স্থাপন করে, সেখানে সকল জাতির মানুষের প্রবেশকে নিশ্চিত করেছিল। নারায়ন গুরুর এই প্রচেষ্টা অবশ্য তেমন সফল হয়নি। বর্ণ হিন্দুরা 'এজাহবা' সম্প্রদায়কে নিজেদের জাতিভুক্ত করতে চায়নি। পরবর্তীকালে এই কারণেই নারায়নগুরু 'সত্যাগ্রহ' শুরু করেন এবং ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেন।

বিংশ শতাব্দীর ২০-এর দশকে অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন গোটা দেশ জুড়ে ব্যাপক আকার ধারণ করে। তামিলনাড়ুতে এই সময়ই দেননাদেয় "নাদার মহাজন সঙ্গম" আন্দোলন। "নাদার" সম্প্রদায়ের লোকেদের দীর্ঘদিন ধরে তাদের সনাতন উপার্জন ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য ধরনের উপার্জন পদ্ধতিতে নিযুক্ত হতে হচ্ছিলো। ইতিমধ্যে আর্থিক সঙ্গতির সুবাদে এই গোষ্ঠী সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে নিজেদের জাতিগত পূর্ব অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলো; এবং নিজেদের রাজনৈতিক দাবি দাওয়া আদায়ের সূত্র ধরে রাজনীতির আঙ্গিনায়ও নিজেদের স্থান করে নিয়েছিলো। রবার্ট হার্ডগ্রেভ তাঁর গবেষণা গ্রন্থ "দি নাদারস্ অফ্ তামিলনাড়ু"-তে মন্তব্য করেছেন, যে নাদার সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সচলতার প্রশ্নে এই জাতিগোষ্ঠীর আন্দোলন এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে "নাদার"দের এই আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতির মূল ধারায় তাদের অবস্থানকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল।

এই বিশের দশকেই তামিলনাড়ুতে দলিত আন্দোলনের আরও এক রূপকার ছিলেন রামস্বামী নাইকারা বা পেরিয়ার। রামস্বামীর নেতৃত্বে পেরিয়ার আন্দোলন ছিল দলিতদের আত্মমর্যাদার আন্দোলন। এই আন্দোলন সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে নিছক আচার-ব্যবহারের ইতিবাচক পরিবর্তনেই সীমায়িত ছিল না, ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের অধীনস্থ হওয়ার মধ্যেই দলিতদের উন্নয়ন এই ধারণার বিপরীতে গিয়ে পেরিয়ার আন্দোলন হিন্দু সমাজের কতিপয় প্রচলিত প্রথা ও সামাজিক ব্যবস্থাদির পরিসমাপ্তি চেয়েছিলো। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদের জীবন যাপন সম্পর্কে পেরিয়ার খুবই তির্যক ভঙ্গীতে তার অপছন্দের কথা জানিয়েছে। "জাস্টিস্ পার্টী"র ব্যানারে দলিত আন্দোলনের মাধ্যমে দলিতদের জন্য শুধুমাত্র আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিক স্বীকৃতি না চেয়ে তথাকথিত উচ্চবর্ণ হিন্দুরা দলিতদের উপর যে অনুশাসন চাপিয়ে দেন তারও অবসান চেয়েছেন। পেরিয়ারের নেতৃত্বে দলিত আন্দোলন হিন্দুধর্মকে তো অস্বীকার করেছে, এমনকী ব্রাহ্মণদের উপবীত ছিঁড়ে ফেলা, হিন্দু দেবতাদের মূর্তি নষ্ট করা প্রভৃতি কাজেও পিছিয়ে ছিলনা। পেরিয়ার আন্দোলন নিছক প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে দাঁড়ায়, দলিতদের স্বাধিকার ও মর্যাদা ফিরে পাবার বাসনা থেকে ক্রমশই লক্ষভ্রষ্ট হয়ে পড়ছিলো।

দক্ষিণ ভারতের বাইরে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এই সময় পাঞ্জাবে অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। মঙ্গুরামের নেতৃত্বে "আদিধর্ম" আন্দোলন দলিতদের প্রথা-আচার ব্যবহারের তথা কথিত সংস্কৃতায়ণের মাধ্যমে পাঞ্জাবে এক জোরদার আন্দোলন তৈরী করেছিল। আদিধর্ম আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিল পাঞ্জাবের দলিত অস্পৃশ্যরা সবসময়ই হিন্দু, শিখ অথবা মুসলিমদের মত এক অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাঞ্জাবে বিরাজমান। সুতরাং নিজস্ব সংস্কৃতিক কুলগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাদের বিকশিত হবার ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সমানভাবে রাষ্ট্রীয় আচরণ পাবার উপযুক্ততা রয়েছে। 'আদিধর্ম' আন্দোলন প্রমান করেছিল দলিত, অস্পৃশ্যরাও নিজেদের আন্দোলন নিজেরাই সঞ্চালতি করতে পারে এবং প্রতিকূল রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেও নিজেদের স্বরূপ বোঝাতে সক্ষম হয়। পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলনের শিক্ষিত অংশগ্রহণকারীদের

সঙ্গে অশিক্ষিত অংশগ্রহণকারীদের মতপার্থক্য ও বিভেদ তৈরী হয় এবং আন্দোলনটিও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। পরিশেষে এই আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীরা আম্বেদকারের "সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের" অংশ হয়ে পড়ে।

এই সময় থেকেই ক্রমে ক্রমে মহারাষ্ট্র ডঃ ভীম রাও আম্বেদকারের নেতৃত্বে দলিত অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের পীঠস্থান হয়ে উঠলো। ডঃ ভীম রাও আম্বেদকার ছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের দলিত আন্দোলনের প্রধান নেতা। মাহার জাতির সন্তান আম্বেদকার মাহার আন্দোলনের মধ্য দিয়েই মহারাষ্ট্রে অস্পৃশ্য বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেন। মাহার আন্দোলনের সফলতা দেখেই আম্বেদকার বুঝেছিলেন সমগ্র দেশব্যাপী দলিত আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে হলে এই আন্দোলনের একটা রাজনৈতিক রূপ দেওয়া দরকার। এই কারণেই তিনি স্বাধীন শ্রমিক পার্টী প্রতিষ্ঠা করলেন। যার মূল উদ্দেশ্য হলো অস্পৃশ্য দলিত মানুষদের জন্য সংগ্রাম করা। তবে এই দল রাজনৈতিক আঙ্গিনায় তেমন সফল হলো না। পর্যালোচকদের মতে স্বাধীন শ্রমিক পার্টী অনেকটা রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে জাতি গোষ্ঠীর সক্রিয়তার একটি উদাহরণ হয়ে রইলো।

১৯৩০ এর দশকে দলিত আন্দোলনের সকল শরিকরা ডঃ ভীমরাও আম্বেদকারকে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নিলেন। আম্বেদকারও তাঁর ভাষনে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন যে দলিতদের ধর্ম ছাড়া হারাবার কিছু নেই; একই সঙ্গে তিনি দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচক ক্ষেত্র-এর দাবীও তুললেন। এই দাবীর প্রশ্নেই আম্বেদকারের সঙ্গে মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধীর মতপার্থক্য শুরু হ'ল, যিনি আম্বেদকারের এই দুটো দাবীর একটিকেও যুক্তিগ্রাহ্য মনে করলেন না। এমনকী ১৯৩২ এর সাম্প্রদায়িক ভাগ বাটোয়ার সময় যখন আম্বেদকার দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচক ক্ষেত্রের দাবীকে অনেকটাই কার্যকর করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন, তখন এর বিরোধীতা করে গাঁধী অনশন শুরু করেন। যাই হোক, গাঁধী এবং আম্বেদকারের মধ্যে আপোষ হয় এবং সাধারণ নির্বাচক ক্ষেত্রের মধ্যেই দলিতদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়। পুনা চুক্তি স্বাক্ষরের পর আম্বেদকার কিছুটা হলেও হতাশ হয়ে পড়েন। এই হতাশা থেকেই তিনি দেশের স্বাধীনতার দাবীরও বিরোধিতা করেন, কারণ তিনি মনে করতেন ঔপনিবেশিক শাসন ভারতে দলিতদের স্বার্থ রক্ষা করবে। পরবর্তী সময়ে ১৯৪২ সালে তিনি সমগ্র ভারতব্যাপী দলিতদের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্তে "সিডিউলড্ কাস্ট ফেডারেশন" প্রতিষ্ঠা করেন, যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথাও স্বীকার করেছিলো, যদিও পরবর্ত্তীকালে এই আন্দোলনটিও নিছক সরকারী চাকুরীর সংরক্ষণ এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের ক্ষেত্রগুলিকেই গুরুত্ব দিয়েছিল। যাই হোক, স্বাধীনতার প্রাক্কালে এই দলিত আন্দোলন আম্বেদকার যেভাবে চেয়েছিলেন, তেমন রূপ ধারণ করেনি, যদিও এই সময়ও তামিলনাড়ুতে দলিত আন্দোলন ক্রমশঃই প্রবল আকার ধারণ করেছিল।

দলিত আন্দোলনের মূল ধারার বাইরে বেশ কিছু ব্যক্তি এবং অন্যকিছু মানুষ দলিতদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের কাজে সহায়তা করেছিলেন। এক্ষেত্রে সবার আগে উল্লেখ করতে হয় মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধীর নাম। দলিতদের "হরিজন" বা "ঈশ্বরের সন্তান" এই আখ্যা দিয়ে ১৯৩২ সালে গাঁধী সারা ভারত হরিজন সেবক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন, এর মাধ্যমে সংস্ত দেশব্যাপী দলিতদের শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার পথ তৈরীতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। "হরিজন" নামে একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করতে থাকেন। গাঁধীর নেতৃত্বকে স্বীকার করে ১৯৩২ এ পুনা চুক্তিতে আম্বেদকারও ক্রমে এই কার্যক্রমে অংশ নিতে শুরু করেন।

বহু শতাব্দী ব্যাপী দলিত অবদমন ও অত্যাচার এর সামাজিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এই ভাবে একটি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দলিতদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্ম প্রত্যয় লাভের একটি পথ নির্দেশ করেছিল।

## ৪.৩ উপসংহার :

ভারতে উপজাতি আন্দোলন ও দলিত আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ও চরিত্র অনুধাবন করলে বোঝা যাবে এই আন্দোলনগুলিকে নির্দিষ্ট কোনো একটি ধরনে, অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক না রাজনৈতিক কোনো বিশেষ বিষয় ভিত্তিক এইভাবে ভাগ করা যাবে না; বরং সমস্ত বিষয়ীসূচক মাত্রা ভেদে ও এই আন্দোলনগুলির একটি সামগ্রিক রূপ রয়েছে। উপজাতি আন্দোলনের মধ্যে যেমন বর্হি গোষ্ঠীর সামাজিক-অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের মাত্রা আছে, তেমনই দলিত আন্দোলনের মধ্যে সনাতনী ভারতীয় ধর্মের একটা প্রভাব আছে। এছাড়া এই দুটি আন্দোলনের ক্ষেত্রেই আন্দোলনকারী গোষ্ঠীবর্গের আপন স্বতন্ত্রতা কে রক্ষা ও অন্যের হাত থেকে তার বিপন্নতা রক্ষা করার মানসিকতা একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। এখানেই এই আন্দোলনদুটির অনন্যতা।

## ৪.৪ প্রশ্নাবলী

১। ভারতে উপজাতি আন্দোলনের উপর একটি রচনা লিখ।
২। ভারতে দলিত আন্দোলনের বিষয়ে একটি নিবন্ধ লিখ।
৩। ভারতে দলিত আন্দোলনের চরিত্র বিষয়ে একটি নিবন্ধ লিখ।
৪। ভারতীয় উপজাতি আন্দোলনের প্রকৃতি বর্ণনা কর।
৫। দলিত আন্দোলনে ডঃ ভীম রাও আম্বেদকারের ভূমিকা পর্যালোচনা কর।
৬। দলিত আন্দোলনে আম্বেদকার ও গান্ধীর ভূমিকার একটি তুলনামূলক আলোচনা কর।
৭। টীকা লিখ —
(ক) কৃষিজমি ভিত্তিক উপজাতি আন্দোলন।
(খ) ঔপনিবেশিকতা বিরোধী উপজাতি আন্দোলন।
(গ) জ্যোতিবা ফুলে।
(ঘ) রামস্বামী পেরিয়ার।
(ঙ) আদিধর্ম আন্দোলন।
(চ) সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন।

## ৪.৫ সহায়ক পাঠ

১। ঘনশ্যাম সাহ, সোশ্যাল মুভমেন্টস্ ইন ইন্ডিয়া, এ রিভিউ লিটারেচর, নিউ দিল্লী, ১৯৯০।
২। মানসী মিন, ট্রাইবাল উইমেন এন্ড ট্রাইবাল মুভমেন্টস্, শ্যামাশক্তি, এ জার্নাল অফ্ উইমেন স্টাডিজ, ভল্যুম - ১, সংখ্যা - ২, ১৯৮৯।
৩। সুরেশ কুমার সিং, ট্রাইবাল সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া, এ্যান এ্যানথ্রোপোহিস্টোরিকাল পারসপেকটিভ্, মনোহর, নিউ দিল্লী, ১৯৮৫।
৪। ললিত প্রসাদ মাথুর, রেজিস্টান্স মুভমেন্টস্ অফ্ ট্রাইবাল ইন্ডিয়া, হিমাংশু পাবলিকেশন, ১৯৮৯।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

*— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

*— সুভাষচন্দ্র বসু*

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

*— Subhas Chandra Bose*

Price : ₹ 150.00

*(NSOU-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)*

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700 064 & Printed at : The Saraswati Printing Works, 2, Guru Prosad Chowdhury Lane, Kolkata 700 006